তুষারকুমারী

তুষারকুমারী

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রভা প্রকাশনী
স্টল নং—৪৩
ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক
শ্রীঅসীমকুমার মণ্ডল
প্রভা প্রকাশনী
মাঠপাড়া * নোনাচন্দনপুকুর

প্রথম প্রকাশ : ১৯৭০

মুদ্রাকর
অনিলকুমার ঘোষ
নিউ ঘোষ প্রেস
৪/১ই, বিডন রো
কলকাতা-৭০০০৬

তুষারকুমারী

॥ এক ॥

দিন যায়। সে জাহাজ পায় না। অথচ প্রায় রোজই নোটিশ পড়ছে বোর্ডে। ক্ল্যান লাইনের জাহাজ, জাহাজের নাম অথবা ব্যাংক লাইনের জাহাজ, জাহাজের নাম এবং সিটি লাইন থেকে ক্রুক-লাইন—কোনো লাইনই বাদ যায় না। রোজ রোজ শিপিং অফিসে গিয়ে সে বোর্ড দেখে। জাহাজের নামও দেখে। মাস্তারেও দাঁড়ায় অথচ সে জাহাজ পায় না। ব্যাজার মুখে ক্যান্টিনে গিয়ে বসে থাকে জাহাজ পাবার আশায়। ক্যান্টিনে হৈ হুল্লোড়। যারা জাহাজ পেল তারা পয়সা ওড়াচ্ছে। সে জাহাজ পায়নি—তার পকেটে চা খাবারও পয়সা নেই। সে শুধু দেখে। আর তার ছোটাছুটি, নোটিশ যদি পড়ে—জাহাজ যদি আবার আসে। তাকে কেন নিচ্ছে না সে বুঝেও উঠতে পারে না। বয়েস কম বলে কি কাজ জানে না—ভাল করে দাড়ি-গোঁফ ওঠেনি বলে সে কি জাহাজের উপযুক্ত নয়—এ সবই ভাবে গোপাল। তার তো জাহাজে যাবার ছাড়পত্র আছে। রমেন নিরঞ্জনরা তার সতীর্থ। ভদ্রজাহাজের এক ব্যাচমেট—তারা জাহাজ পেয়ে গেল। তার কপালে কিছুই জুটছে না।

দিন যায়, সে জাহাজ পায় না। অফিসে ঘোরাঘুরি করে। বড় রাস্তায় কখনও সে এসে দাঁড়ায়। আর হাঁটতে ইচ্ছে করে না। শরীরও দেয় না। সে তখন গাছতলায় শুয়ে থাকে। সেই কোন সকালে সে বের হয়—কোথায় জোড়ামন্দির, সেখান থেকে হাঁটতে থাকে। রোজই মনে হয় ঠিক জাহাজ পেয়ে যাবে। জাহাজ পেলেই সাইন করতে পারে। সাইন করলেই টাকা। সে তখন সুখের নাগাল পাবে। কিন্তু জাহাজ কপালে জোটে না। 'নলি' হাতে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকাই সাড় হয়। কাপ্তান, চিফ অফিসার জাহাজিদের মুখ দেখেন, 'নলি' দেখেন, সফর দেখেন তারপর মর্জি হলে তুলে নেন। তার কোনো সফরের অভিজ্ঞতা নেই। এটাই তার পয়লা সফর হবে জাহাজ পেলে।

বুড়ো মতো একজন লোককে সে মাঝে মাঝে দেখতে পায়—প্রায়ই এসে

ক্যান্টিনে গুলতানি মারে। সবাইকে ভাই ভাতিজা বলে ডাক খোঁজ করে। এর ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে। প্রাচীন নাবিকেরা যেমন হয়ে থাকে—খাপছাড়া মানুষ। পায়ে ঢলঢলে বুট জুতা, গলায় মাফলার—চোখে মুখে সফরের নোনা দাগ—সে তাকে দেখলে দাঁত বের করে হাসে। মুখ ভর্তি পানের পিক—জর্দা পানের গন্ধ মুখে—গোপালকে দেখলেই হাসে—'কি ভাতিজা, জাহাজ মিলতাছে না ? হাঁটাহাঁটি করতাছ ?' বলেই ফুত করে মুখ থেকে পানের পিক ফেলে। তারপর হা হা করে হাসে বোকার মতো। বলে, 'পাইয়া যাইবা। সব আল্লার মেহেরবানি।' তাঁর মর্জি না হইলে কিছু মেলে না। মনে লয় তোমার জাহাজখানা দরিয়ায় ঘুরতাছে। জাহাজখানা ঘাটে ভিড়লে হয় !'

গোপাল ভেবে পায় না, জাহাজ ঘাটে ভিড়বে না কেন। সে প্রায় দৌড়ে গিয়ে লোকটাকে ধরে ফেলে। তারপর এক প্রশ্ন তার—'জাহাজ ঘাটে ভিড়বে না কেন ?'

"আরে ওডাতো জাহাজ না ভাতিজা। ইবলিশ। ইবলিশ কারে কয় বোঝ !'

গোপাল ইবলিশ কারে কয় সত্যি বোঝে না। সে বলল, 'আজ্ঞে না। বুঝি না।'

লোকটা তাকে তাতাচ্ছে, না তার মধ্যে জাহাজ সম্পর্কে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে চায় গোপাল বুঝতে পারছে না। টুক করে লোকটি তখন বলল কি না, 'বুঝে তবে কাম নাই।' গোপালও ছাড়বে না। জাহাজ তার দরিয়াতে ঘুরছে, জাহাজ ঘাটে ভিড়লেই তার ঘোরাঘুরি শেষ—প্রাচীন নাবিক বলেই হয়তো নানা কিসিমের খোঁজ খবর রাখে, সে কিছুতেই লগ ছাড়ছে না। নাছোড়বান্দা। নাছোড়বান্দা দেখেই লোকটা না বলে পারল না, 'ইবলিশ হল গে শয়তান—দরিয়ায় ঘুরাইয়া মারে। ঘাটে সহজে ভিড়তে চায় না।' তারপরই ক্যান্টিনে অর্ডার দিয়ে ফেলল, 'আরে মিঞা এদিকে দুইডা চা লাগাও। সিঙ্গারা খাইবা ? নাম কি ! মুখখান ত শুকাইয়া গ্যাছে।'

সে বলল, 'আমার নাম গোপাল।' লোকটি চা-এর কাপ এগিয়ে দিয়ে বলল, 'তা গোপাল, তোমার তো বয়সটা ভাল না। নাও চা খাও। শেষে বলল, 'জাহাজে যাইবা ঠিক করছ, নোনা পানিতে গোসল করবা ঠিক করছ, তা লও যাই। জাহাজ আইলেই উইঠা যামু।'

আরে লোকটা বলে কি—জাহাজ এলেই উঠে পড়বে। একে তো তবে ছাড়া যায় না। যখন বলছে, তা লও যাই, যেন সে জাহাজে লোকটার সঙ্গে

উঠতে চাইলে খুশিই হবে।

গ্রীষ্মের দুপুর। রোদ প্রখর। ঘাম হচ্ছিল গোপালের। ক্যান্টিনের এদিকটায় বড় একটা শিউলি গাছ। সামনে রাস্তা, কিছুটা বা-দিকে গেলে নদী এবং জাহাজ, নানা রঙের চিমনি, নদীর ওপারে কলকারখানা। নদীতে নৌকা গাদাবোটের ছড়াছড়ি, মাঝিমাল্লার হাঁক। বুড়ো লোকটা মুখের ঘাম মুছে এক গ্লাস জল নিল ক্যান্টিন থেকে। পানের ছিবড়া বা-হাতের তালুতে রেখে, মুখ কুলকুচা করে চা-এ চুমুক দিল। গোপালকে দেখতে দেখতে বলল, 'আমি বাপজান, ব্যাংক লাইনের মাল্লা। লম্বা সফর। মেলা টাকা। জাহাজ এলেই উঠে পড়ব।'

বলে কি লোকটা! ব্যাংক লাইনের জাহাজ এলেই উঠে পড়বে। সব ঠিকঠাক। জাহাজ ঘাটে ভিড়লেই উঠে পড়বে।

গোপাল বলল, 'জাহাজের সারেঙসাব আপনি?' কারণ গোপাল জানে, জাহাজে অনেক সময় বাঁধা সারেঙ থাকে। বাঁধা মানে, এক এক কাপ্তান এক এক সারেঙকে পছন্দ করেন। কলকাতায় এলেই তাঁরা পছন্দ মতো সারেঙকে জাহাজে তুলে নেন। না পেলে খোঁজাখুঁজি করেন। শেষে ব্যর্থ হলে, অন্য সারেঙের ডাক পড়ে। গোপাল ভাবল, লোকটা যদি সারেঙ হয়, তবে তার হিল্লে হয়ে যেতে পারে। আবার নাও পারে। সারেঙ পছন্দ মতো দু একজন জাহাজিকে তার সঙ্গে নিতেই পারেন। জাহাজের কাপ্তান কিংবা চিফ অফিসার এমন কি চিফ-ইনজিনিয়াররাও মেনে নেন। এ-সব গোপাল জেনেছে ভদ্রা জাহাজে। সে ভাবল, যদি সারেঙ হন তবে হিল্লে করে দিতে পারেন—এই আশায় সে এমন প্রশ্ন করেছে, 'আপনি কি জাহাজের সারেঙসাব।' কিন্তু লোকটা তো বলল, ব্যাংক লাইনের জাহাজি। সারেঙ হতে যাবে কেন। সারেঙ হলে এমন গায়ে পড়া ভাব হতে পারে না। তা-ছাড়া কথাবার্তা শুনেও মনে হয় না, জাহাজের গুরুত্বপূর্ণ কাজের উপযোগী মানুষটা।

লোকটি বলল, 'সারেঙসাব না। জাহাজের ছোট টিণ্ডাল আমি। আমার নাম বাদশা মিঞা। টিবিড ব্যাংকের ছোট টিণ্ডাল। ইনজিন-রুমে কাজ। আপনার নলি ইনজিনের না ডেকের?'

গোপাল কেমন অথৈ জলে কিছুটা শ্বাস নেবার চেষ্টা করছে। এখন আবা আপনি আজ্ঞে করছে। বলল, 'আমার নলি ইনজিনের।'

'ব্যস অপেক্ষা করেন, জাহাজ পাইবেন। ভয় নাই। আলতাফ সারেঙে নাম শুনেছেন?'

গোপাল কোনো সারেঙের নামই জানে না।

'জনাব আলতাফ মিঞা। সাকিন, বানেশ্বরদী থানা, আড়াই হাজার। জিলা ঢাকা। কি চিনেন ?'

গোপাল চালাকি করে বলল, 'কি যে বলেন, চিনি না !'

'হা, তারে সব জাহাজি এক ডাকে চেনে। সবুর করেন, কাল আসবেন তো লাইন মারতে ?

সে সুবোধ বালকের মতো ঘাড় কাত করে দিল। না এসে পারে ! না এসে যাবেই বা কোথায় ! সে বলল, আসবে।

খুব খুশি বাদশা মিঞা। সে যেমন তেমন লোক না, শয়তান জাহাজের ছোট টিণ্ডাল। জাহাজটা কোন দরিয়ায় আছে, কোথায় ঘুরছে কেউ জানে না। জাহাজের মর্জি না হলে জানাও যাবে না। তবে ঘাটে এসে ঠিকই ভিড়বে। গোপাল কিছুটা আতঙ্কে পড়ে গেল। উপায়ও নেই। তবু সে বলল, 'দরিয়ায় জাহাজটা ঘুরছে কেন চাচা ?'

'মেলা কথা। জাহাজে উঠলে টের পাবেন। ত কথা থাকল। ক্যান্টিনে বইসা থাকবেন। আমারে খোঁজাখুঁজি করতে হইব না। আমি নিজেই আপনের ধান্দায় থাকমু। কি, কিছু বোঝলেন ?'

'বেঞ্চিতে এসে বসে থাকব।'

গোপাল কিছুটা আশ্বস্ত। তবে কবে জাহাজ ঘাটে ভিড়বে কিছু বলতে পারছে না। কোন দরিয়ায় জাহাজ আছে তাও বলতে পারবে না। বলবে নাকি, কতদিন লাগবে ?

বাদশা মিঞা চায়ের কাপ শেষ করে তালুতে রাখা পানের ছিবড়া মুখে আলতো করে ফেলে দিল। গামছায় হাত মুছল। বড় নোংরা স্বভাব। গোপালের ভাল লাগল না। সেই হাতেই তার হাত চেপে ধরল। তারপর টেনে নিয়ে গেল আড়ালে। যেন জনসমক্ষে আর কথা বলা ঠিক না। যেন বড় কুমতলব আছে লোকটার। অনেকেই বাদশা মিঞাকে চেনে। কেন যে মনে হল, দালাল নয়তো। জাহাজ পাইয়ে দেবে বলে টাকা ফাকা যদি চায়। কি বলতে যে এতটা নিরালায় টেনে নিয়ে এল গোপাল বুঝতে পারছে না।

বলল, 'আপনে কইলেন নাম আপনের গোপাল। পুরা নামখান কন দেখি।'

'গোপাল চক্রবর্তী।'

'বামুনের ছাওয়াল ! তা হউক। বাঙ্গালীবাবুরা ঝাঁকে ঝাঁকে উইড়া

আইতাছে। ভালই। রুজি রোজগার বলে কথা। কিন্তুক একখানা কথা। জাহাজে যাইবেন, বাপ-মার মনে কষ্ট হইব না?'

গোপাল বলল, 'না।'

'তা কষ্ট না হলেই ভাল। লিখাপড়া জানেন? খতটত লিখতে পারেন!'

গোপাল বলল, 'পারি।'

'আল্লার মরজিতে কামখান হইয়া যাইব। কাল আসেন।'

গোপাল দেখল, বাদশার ঘড়িতে দুটো বেজে গেছে। সে বলল, 'যাই।' সে রেসকোর্সের পাশ দিয়ে হাঁটতে থাকল। আর তখনই মনে হল বাদশা দৌড়ে আসছে। ডাকছে 'অ বাঙ্গালীবাবু, শোনেন।'

আবার কি কথা!

বাদশা হাঁপাতে হাঁপাতে তার কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর পকেট থেকে কি যেন বের করছে। কিংবা পকেটে হাত, মনে হয়, সে কিছু ভাবছে, কি ভেবে যে বলল, 'চোখ বোজেন।'

গোপাল বুঝল না, চোখ বুজতে বলছে কেন তাকে। জাহাজ কবে ঘাটে লাগবে বলতে পারে না, আর কত সহজে চোখ বোজেন বলতে পারে। সে কিছুটা হতবাক গলায় বলল, 'চোখ বন্ধ করতে বলছেন কেন?'

'আরে চোখ বোজেন না?'

গোপাল এবার কিছুটা সাহস পেয়ে বলল, 'জাহাজ ঘাটে ভিড়বে কবে জানেন?'

'জানব না ক্যান। জাহাজ মোরিন পয়েন্টে এসে গেছে। কাল না হয় পরশু ভিড়বে। কি চোখ বোঁজেন বললাম না।'

সে অগত্যা কি করে! চোখ বন্ধ করে বলল, 'কি হয়েছে?'

'হাত পাতেন।'

সে হাত পাতল।

বাদশা তার হাতে একখানা কাচা টাকা রেখে বলল, 'মুঠ করেন।'

সে বলল, 'আপনি কি যাদুকর?'

বাদশা বলল, 'বাসে না উঠে হাঁটা দিলেন—দূরে যাইবেন মনে লয়। টাকাটা রাখেন। বাসে চলে যান। সাইন করে তলব পেলে, টাকাটা ফেরত দিবেন। কি এই কথা থাকল।'

গোপাল কেন যে কিছুটা বিমূঢ় হয়ে গেল। মানুষটার দয়ামায়া আছে। দয়ামায়া যার থাকে সে কোনো খারাপ কাজ করতে পারে না। তার অন্নকষ্ট,

অর্থকষ্ট বুঝেই বাদশা মিঞা যেন ঈশ্বরের মতো সামনে উদয় হয়েছে। তার চোখে কেন যে জল এসে গেল।

পরদিন সকাল সকাল শিপিং অফিসে এসে হাজির গোপাল। বাদশা মিঞা তাকে ক্যান্টিনের বেঞ্চিতে বসে থাকতে বলেছে। ক্যান্টিনে ঢোকার আগে একবার ঘুরেফিরে দেখা দরকার। বোর্ডে কোনো জাহাজের নাম যদি লেখা থাকে, সে অফিসের এক তলার করিডোর ধরে হেঁটে গেল। বোর্ডে দেখল, কোনো জাহাজের নাম লেখা নেই। এ-ধার ও-ধার মাঝি মাল্লাদের জটলা। ওরাও ঘোরাঘুরি করছে জাহাজ পাবার আশায়। বোর্ডে জাহাজের নাম লেখা হলেই ছুটবে। রাস্তার ও-পাশে লম্বা টিনের চালা। প্রায় প্ল্যাটফরমের মতো লম্বা। সামনে মাঠ। মাঠেও জাহাজিরা এধার ওধার জটলা করছে। কিন্তু অবাক এদের মধ্যে বাদশা মিঞাকে দেখা গেল না।

অগত্যা গোপালকে বেঞ্চিতে ফিরে এসে বসে থাকতে হয়। লোকটা তাকে আশা দিয়েছে। জাহাজ এলেই তার কাজ হয়ে যাবে। আলতাফ সারেঙ কেমন দেখতে জানে না। জাহাজে মাথার উপর বলতে গেলে সারেঙসাবই মাঝিমাল্লাদের সব। তার মেজাজ-মর্জি বুঝে চলতে না পারলে পস্তাতে হয়। সে কিছুটা শঙ্কিত, আলতাফ মিঞা তাকে জাহাজে তুলে নিতে শেষ পর্যন্ত রাজি হবে কি না, যদি না হয়, তবে লাইন মারা ফের, রোজ হেঁটে আসা, আত্মীয়ের গলগ্রহ হয়ে বেঁচে থাকা—নয় দেশে চলে যাওয়া। চলে গেলে বাবা-মা ভাই-বোনেরা খুব খুশি হবে ঠিক তবে তাদের অন্নকষ্ট ঘুচবে না। বাবার সে লায়েক পুত্র। সবে পাশটাশ করে কলেজে ঢুকবে ভাবছে, টাকাই যোগাড় করতে পারল না, ভর্তি হতে পারল না। আর এ-সময়ই খবর, মার্চেন্ট নেভিতে লোক নিচ্ছে। সে দেরি করেনি। হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই সই।

হন্তদন্ত হয়ে ভিড় ঠেলে কে এগিয়ে আসছে। চেনাই যায় না। মাথায় ফেজ টুপি, ঢোলা পাজামা পাঞ্জাবি এবং গলায় মাফলার। এই গরমে কেন গলায় মাফলার বোঝা গেল না। বাদশা মিঞা তো! চোখে শুর্মা টানা, তেলে চুল চুকচুক করছে। মুখ চকচক করছে। সাফসুতরো মিঞা সাহেব। লম্বা বুট জুতো জোড়া। অবিকল মাঝি-মাল্লাদের মতো। সেখানে বুরুশের বালাই নেই—যথেষ্ট তালিমারা।

গোপাল উঠে দাঁড়াল—বাদশা কি বলে, শোনার আগ্রহ। সে প্রায় ছুটেই গেল।

বাদশা হন্তদন্ত হয়ে বলল, 'আলতাফ সাব দেশ থেকে আইসা গেছেন। সাথিতে আছেন। দুপুরের নাস্তা সেরে আসবেন।'

'আমার কথা কিছু বললেন ?'

'আরে কমু। তিনি আইলে আপনারে লইয়া যামু। যা তিনি জানতে চাইবেন, উত্তর দিবেন। কথা কম না বেশি না। কি বোঝালেন !'

বাদশার এই এক স্বভাব। কথার শেষে 'কি বোঝালেন' তার বলা চাই।

গোপাল বলল, 'কথা কম না বেশি না।'

'ঐ তবে ঠিক থাকল। বইসা থাকেন। সময়ে ডাইকা নিমু।'

সারাদিন গোপাল বসে থাকল। বাদশার পাত্তা নেই। আজ কোনো জাহাজ নেই। তবু সারেঙসাব ঘুরে যেতে পারেন শিপিং অফিসে। দেশ থেকে 'সাথি'তে এসে উঠেছেন। শিপিং অফিস একবার ঘুরে যাবেন না হয় না। সারেঙসাবই বলতে পারবেন সব। সে দেখা করে না গেলে সারেঙসাবের গোঁসা হতে পারে। সে উঠতেও পারছে না। দেখতে দেখতে ক্যান্টিন ফাঁকা হয়ে গেল। বাদশার পাত্তা নেই।

অগত্যা আবার হাঁটা। তখনই বাদশা উদয়। সোজা হাত ধরে বলল, 'আসেন।'

'কোথায় যাব।'

'সারেঙসাবের কাছে।'

সে দেখল, রাস্তার ওপারে গাছের নিচে একটা জটলা। একজন লম্বা মতো মানুষকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে জাহাজিরা। দেখে কেন যে মনে হল, তিনিই আলতাফ সাহেব। টিবিড ব্যাংক জাহাজের জবরদস্ত সারেঙ। টাক মাথা মুখ সাদা দাড়িতে ঢাকা। কালো রঙের আদ্দির পাঞ্জাবি গায়। স্যান্ডো গেঞ্জি জামার নিচে ভেসে আছে। লম্বা বুট জুতা তাঁরও পায়ে। ঢোলা পাজামা গোড়ালিতক। সবার কুশল নিচ্ছেন মনে হল।

বাদশা এক গাল হেসে সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আদাব দিল। বলল, 'সাব জাহাজের খবর টবর পাইলেন নি ?'

জাহাজের কোনো খবরই নেই, তবু কি করে যে বাদশা আগে থেকেই খবর রটিয়ে দিল—জাহাজ ঘাটে লাগছে। সারেঙসাব এসে যাওয়ায় জাহাজ ঘাটে ভিড়েছে এমনও ভাবতে পারে বাদশা মিঞা। কিংবা সারেঙসাব জাহাজের খবর না পেলে আসতেন না বাদশা আন্দাজে চাউর করে দিতে পারে। অথবা সারেঙসাব তার খুব কাছের মানুষ, এমনও প্রমাণের জন্য গুজব ছড়াতে

পারে। গুজবের তো শেষ নেই। ব্যাংক লাইন কোম্পানির জাহাজ মেলা। তবে এস/এস টিবিড ব্যাংক জাহাজখানার গুজব আরও অধিক। জাহাজটা ইবলিশ। দরিয়ায় ঘোরাঘুরি করার স্বভাব। ঘাটে ভিড়তেই চায় না। দুনিয়ার দু'জন সারেঙের কাছে জাহাজটা জব্দ। তার একজন আলতাফসাব।

জাহাজটা সম্পর্কে মাঝি-মাল্লাদের আতঙ্কেরও যেন শেষ নেই। জাহাজে কেউ উঠতে চায় না। গোপাল দেখেছে, বাদশা মিঞাকে দেখলেই মাঝি-মাল্লারা সরে পড়ে। তাকে এড়িয়ে চলে। কেমন যেন ভুতুড়ে জাহাজ। তার লোক-লস্কর বেশি সুবিধা হবার কথা নয়। বাদশা যেখানে যায়, লোকজন পালাতে থাকে। এই যে আলতাফসাবকে দেখে মাঝি-মাল্লারা জড় হয়েছে, তা একজন জবরদস্ত সারেঙসাবকে আদাব দেবার জন্য। কারণ আল্লার একান্ত মেহেরবানি না থাকলে টিবিড ব্যাংক জাহাজের সারেঙ হওয়া যায় না।

গোপালের কথা বলতেই তিন চারদিন লেগে গেল। বাদশার পিছু পিছু ঘুরছে। বাদশা সারেঙসাবকে নানা খবর দিচ্ছে—কে কোন জাহাজ ধরে চলে গেছে তার খবর। সে যে সঙ্গে আছে, বাদশা যে তাকে কথা দিয়েছে যেন সে ভুলেই গেছে। আলতাফসাব তাকে পাত্তাই দিচ্ছে না। না তিনি জানেনই না, সেও জাহাজ ধরার জন্য শিপিং অফিসে ঘোরাঘুরি করছে। বাদশার পিছু নিয়েছে। একদিন কেন যে বললেন, ছোট টিণ্ডাল ও কে? টিণ্ডাল ফ্যাক ফ্যাক করে হাসছে। সে কে যেন বলতে সাহস পাচ্ছে না। আলতাফসাব তাকে দেখে কিছুটা যেন বিভ্রান্ত। এবং মনে হয় তিনি নিজেও তাকে দেখে খুশি না। মুখখানা তার কেন যে ব্যাজার হয়ে গেল গোপাল বুঝতে পারছে না। তার মুখে কি কোনো পূর্বস্মৃতি কাজ করছে সারেঙসাবের! তাকে দেখেন—কিন্তু কেন যে এড়িয়ে যান—ইচ্ছে করেই যেন চোখ তুলে একবার দেখার পর অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। কেন এটা হচ্ছে সে বোঝে না। শেষে একদিন না পেরে বিরক্ত হয়েই বললেন, ও কে ছোট টিণ্ডাল! তোমার সঙ্গে লেগে আছে। ওকে নিয়ে ঘুরছ কেন! গোপাল বাদশা মিঞার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করছে বলে তিনি যেন সত্যি বিরক্ত, দেখে শুনে তাকে অপছন্দ করতেই পারেন। নিজের মুরদে হল না। বাদশাকে ধরেছে। বাদশা তাকে তুলে নেবে! হুঁ!

সে ঠিক বুঝতে পারে না, আসলে এ-ভাবে খাটো করার ইচ্ছা আছে কি না আলতাফের। বাদশা বলতে গেলে পাত্তাই পাচ্ছে না। সারেঙের মর্জি না

হলে, বাদশাও হয়তো জাহাজ পাবে না। গোপন আতঙ্ক বাদশার মনেও ক্রিয়া করতে পারে। অন্তত যে-ভাবে বাদশা গুম মেরে গেছে, তাতে তার এমনই মনে হচ্ছিল।

সে বিরক্ত হয়ে একদিন বলেই ফেলল, 'ধুস তোমার জাহাজ, জাহাজে কে যায়।' সে আর আপনি আজ্ঞে করছে না। বাদশাকে দেখলেই পালাচ্ছে।

এক দুপুরে মাস্তার দিয়ে গোপাল যখন জাহাজ পেল না, এবং গোপাল যখন ফিরে যাচ্ছিল, তখনই বাদশা হাজির। প্রসন্ন হাসি মুখে। পান খায় বলে, দাঁতগুলো ঝিঙে বীচির মতো দেখতে। হাসলে সব কটা কালো দাঁত বের হয়ে পড়ে।

'গোপাল শোন।'

গোপাল দাঁড়াল।

আজ কেন যে বাদশা তুই তোকারি করছে, বুঝছে না। সে কিছু বলার আগেই হাত ধরে টানতে থাকল। এবং প্রায় বগলদাবা করে যেন হাজির করল সারেঙের সামনে।

টিনের লম্বা শেডের নিচে আলতাফসাব একা বসে আছেন। হাতে একটি সাদা লম্বা কাগজ। তাতে টিক মারা হচ্ছে। এইমাত্র কি তবে টিবিড ব্যাংকের মাস্তার হয়ে গেল। টিবিড ব্যাংক নিয়ে বেশ মাতামাতি গেছে ক'দিন। টিবিড ব্যাংকের নাম শুনেই লাইন থেকে লোকজন সটকে পড়ে। কেউ লাইনে দাঁড়ায় না। জোরজার করে ধরে আনা হয়। নাম লেখানো হয়। এমন যখন পরিস্থিতি তখন তার ডাক পড়তেই পারে। জাহাজটার অপযশের শেষ নেই। তিনটে বয়লার যেন তিনটে কসবি। কসবি কি সে ঠিক ভাল জানে না। তবে কসবি যে খারাপ কথা সে বোঝে। টন টন কয়লা হজম করে ফেলে। অথচ ন্যায্য স্টিম তুলতে পারে না। ঝড়ের দরিয়ায় জাহাজটার নাকি মাথা খারাপ হয়ে যায়।

গোপালকে দেখেই আলতাফের মাথা গরম। ছোট টিণ্ডালের এত কাণ্ডজ্ঞানের অভাব! মাথা গরম হতেই পারে। সে বলল, 'আরে মিঞা এই তোমার গোপাল! পারবে! দরিয়ায় টিকতে পারবে! জাহাজ কত খারাপ জায়গা তোমার গোপাল জানে।' গোপালকে তিনি কেন যে সহ্য করতে পারছেন না। বাদশা বলল, 'জাহাজ পাচ্ছে না সাব।'

'জাহাজ পাচ্ছে না বলে ফালতু লোক তুলে নেবে! জাহাজ পাচ্ছে না বলে খোঁড়া লোক তুলে নেবে। ছেলেমানুষ, জাহাজের কি বোঝে! ছাগল দিয়ে

ধান চাষ হয়। বল, মিঞা, লোকজন তোমার আর কে আছে। নাম বল। মিলিয়ে দেখছি।'

তারপর নিজেই বিড় বিড় করে বকতে থাকল, 'জাহাজ পাচ্ছে না, বসে থাকবে, আরে আবার কোম্পানির জাহাজ কবে আসবে কেউ বলতে পারে। তবু পালিয়ে বেড়াচ্ছে। লাইনে মাস্তার দিচ্ছে না। না খেয়ে থাকতে রাজি, টিবিড ব্যাংকে উঠতে রাজি না।'

গোপাল পড়েছে মহাফাঁপড়ে। জাহাজটায় তবে কেউ উঠতে চায় না, কেন চায় না, বোঝে। জাহাজটা ভাল না। দোষ পেয়েছে জাহাজটা। ভাঙ্গা ঝরঝরে জাহাজে কে উঠতে চায়! কয়লার জাহাজ—কাজের অন্ত নেই। এটা ধরলে, ওটা খসে পড়ছে। জাহাজে ওঠা যায়, তবে ফিরে আসার সম্ভাবনা কম। জাহাজটি সম্পর্কে নানা গুজব ছড়িয়ে গেলে যা হয়—সেও গুজবের শিকার। বাদশাকে দেখলেই আর দাঁড়াত না। আড়ালে লুকিয়ে পড়ত।

সহসা আলতাফ তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার মা বাবার কি আক্কেল, জাহাজে কাজ করতে পাঠাল। পারবে?'

সে কেন যে ঘাড় কাত করে দিল।

বাদশা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বলল, 'বলেছি না পারবে। আমি তো বললাম, গুজবে কান দিবি না। কোন জাহাজটা ভাল শুনি। দরিয়া ক্ষেপে গেলে, কোন জাহাজের মাথা গরম হয় না! জাহাজের কি দোষ! বলেন সাব! আপনি আমি মাথা ঠিক রাখতে পারি না—কি ঠিক বলিনি!'

আলতাফ টেবিলে হাত চাপড়ে বললেন, 'সেই।' তবু কি ভেবে গোপালকে বললেন, 'তোমার তো বাছা ঠাকুর দেবতার মতো মুখ। পারলে ভাল। পালাতে পারলে আরও ভাল।' তারপর তিনি কি ভেবে বললেন, 'আর যাই কর, পালিও না বাপজান। যাকগে, ইনজিন রুমের জাহাজি বলতে বাদ থাকল, বড় টিণ্ডাল। রহমান আসছে। রহমান সিটি ব্যাংকে সফর দিয়ে দেশে ফিরেছিল। বললাম, মিঞা এত জাহাজে সফর করলা, একবার টিবিড-ব্যাংকে সফর কর। দুনিয়া দেখতে হলে টিবিড ব্যাংকে ওঠা চাই। একবার উঠে দেখতে পার। সে রাজি হয়েছে, যাবে।'

তখনই বাদশা বলল, 'গোপাল খত লিখতে পারে। আপনার আমার অসুবিধা হবে না।'

আলতাফ বলল, 'তোমার আগের রোগটা যায়নি দেখছি। খত লেখা নিয়ে তোমার এত বাহানা কেন বুঝি না মিঞা। বিশ্বাস কর না কাউকে। বিবির খত

যদি ফাঁস করে দেয়। আরে মিঞা, দরিয়ায় ভাসলে, ঘরের কথা মনে রাখলে চলে না। কি গোপাল, ঘরের জন্য মন খারাপ হবে না তো!'

গোপাল বুঝল, তার নিয়তি। সে জাহাজ পাচ্ছে না, টিবিড ব্যাংকে যেতে রাজি। কেন না, বাদশা সঙ্গে আছে। এই লোকটাকে কেন যে কখনও অবিশ্বাস হয়, আবার কখন যে মনে হয় বিপদে আপদে বাদশা তার পাশে আছে। নতুন জাহাজি পয়লা সফর, মাথার উপর মুরুব্বি থাকা কত যে জরুরী বাদশার সঙ্গে আলাপ না হলে টের পেত না। সে বলল, না চাচা মন খারাপ হবে না।

বাদশা বলল, 'লম্বা সফর বুঝলি গোপাল। মেলা টাকা। জাহাজ দেশে কবে ফিরবে কেউ বলতে পারবে না।'

গোপাল বলল, 'তোমরা তো আছ!'

আলতাফ তবু সতর্ক করে দিল, 'জাহাজ টালমাটাল হলে দোষ দিতে পারবা না।'

'আপনারা আছেন মাথার উপর। ভয় পাব কেন।'

'তোমার নলি আছে?' আলতাফের প্রশ্ন।

'আছে চাচা।' পকেট থেকে গোপাল নলি বের করে দেখাল।

'কাল আবার মাস্তার দিতে হবে বুঝলে। কাপ্তান আর চিফ-ইনজিনিয়ার আসবেন। মাস্তারে দাঁড়াতে গাফিলাতি কর না। না দাঁড়ালে, মুখরক্ষা হবে না। জাহাজটার দুর্নাম হয় আমি চাই না।'

গোপাল সুবোধ বালকের মতো সম্মতি জানাল। বলল, সে যাবে। টিবিড ব্যাংকে উঠতে রাজি। এস এস টিবিড ব্যাংকে। ব্যাংক লাইনের জাহাজ। কয়লায় চলে। কয়লার জাহাজেই সে যাবে। কিন্তু আলতাফ মিঞা তাকে দেখলেই কেন যে জ্বলে পড়ে যান সে বোঝে না। কেবল বলেন, জানি না আল্লার কি মর্জি! তুই কেন ফের ফিরে এলি বাপজান!

॥ দুই ॥

জাহাজ কিং জর্জ ডক থেকে বের হয়ে নদীতে পড়লে সারেঙসাব যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। কেউ নেমে যেতে পারবে না আর। তিনি ডেক ধরে এতক্ষণ ছোটাছুটি করেছেন। বোট-ডেকে উঠে গেছেন। স্টোকহোলডে নেমে গেছেন লোহার সিঁড়ি ধরে। গোপাল সঙ্গে আছে। গোপালকে নিয়েই ভয়। ঠাকুরদেবতার মতো মুখ—আসলে দেখতে সে কার্তিক ঠাকুর। যে

কোনো সময় শিকার ভেবে আড়ালে আবডালে তার হেনস্থা ঘটতে পারে। এই একটা আতঙ্কে তাকে এখনও পরি দেওয়া হয়নি। গোপাল এতে ক্ষুব্ধ। সে তো জাহাজে কাজ করতে এসেছে। সকাল দুপুর ইঞ্জিন-রুমে ঘসাঘসি করতে কাহাতক ভাল লাগে। সিরিস কাগজ আর কেরোসিন তেলের টব নিয়ে ইঞ্জিন-রুমের প্লেট ঘসছে। সে আর জাহির। জাহির সারেঙকে যমের মতো ভয় পায়। বুড়ো মানুষ। কাজের বার। সারেঙের মেহেরবানি না হলে এ-বয়সে কে আর জাহাজ পায়।

আসলে জাহাজ ছেড়ে দিলে, আলতাফ শেষবারের মতো তার গোনাগুনতি ঠিক আছে কি না পরখ করে নিল। কেউ পালিয়ে নেমে যেতে পারে। ইঞ্জিন-রুমে বারোটা-চারটের ওয়াচ চলছে। দু'জন কোল-বয় তিনজন আগয়ালা, একজন গ্রিজার ইঞ্জিন-রুমে থাকার কথা। সে স্টোকহোলডে নেমে দেখল, তিনটে বয়লারের সামনে মূর্তিমান তিন আগয়ালা। মাথায় নীল টুপি, পায়ে কোম্পানির দেওয়া বুটজুতো, গায়ে নীল রঙের জামাপ্যান্ট। তিনজনই তাকে আদাব দিল। সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল আলতাফ। গোপালও পিছু নিল। 'স্টারবোর্ড সাইডের বাংকারে কে জাগে?'

আলতাফ গলা ছেড়ে হাঁক দিলেন। কারণ একটা লম্ফ জ্বলছে শুধু। বিশাল পাহাড় কয়লার। অন্ধকার গর্ভগৃহ মনে হয়। ভুসো কালি মাখা একটা মুখ দেখা গেল। সে লম্ফ নিয়ে এগিয়ে আসতেই বললেন, 'সুট খালি কেন? কয়লা ফেল। দাঁড়িয়ে থেক না! সুট ভরে 'পরি' শেষ করতে পারবে না।'

গোপাল সবার নাম জেনে ফেলেছে। কিছুটা দোস্তিও হয়ে গেছে। জাহাজ মালবোঝাই হতে সময় লাগে। মাল বলতে গানি ব্যাগ, কিছু কাঠ, আর কিছু হেরন পাখি। কেপটাউনে পাখিগুলি নামিয়ে দেওয়া হবে। ফল্কার দু পাশে বড় বড় করে খাঁচায় পাখিগুলি রাখা। কাপ্তানের পুত্র ওজালিও ওদের দেখভাল করে। পুত্রটি নাবালক। রোগা। চঞ্চল এবং কিছুটা তরলমতি। ওজালিরও চোখে সোনালি চশমা। ছোট করে ছাটা সোনালি চুল। দেবদূতের মতো মুখ। দেখলেই ইচ্ছে হয় কথা বলতে। কিন্তু সাহেবের বাচ্চা সে কখনও দেখেনি। সে গাঁয়ের ছেলে। ইতিহাসে লর্ড ক্লাইভ থেকে কার্জন সাহেবের নাম সে শুনেছে। কলকাতায় সে আগন্তুক। পথঘাট ঠিক চেনে না। তবু চৌরঙ্গি কিংবা লাটভবনের পাশে কখনও যে সাহেব মেম দেখেনি তা নয়। কিন্তু জাহাজে উঠে সাহেবদের এত কাছ থেকে দেখতে পাবে আশা করেনি। ওজালিও তাকে চশমার ফাঁকে কয়েকবারই দেখেছে। তাকে কেন যে চুরি করে

দেখে, সে বোঝে না। চোখে চোখ পড়ে গেলে, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অফিসার্স কেবিনে ওজালিও থাকে। সে-দিকটায় তাদের যাবার নিয়ম নেই। ইঞ্জিন-রুমের এলিওয়ে ধরে ঢুকে গেলে ওজালিওর কেবিন। কেবিনের পোর্টহোল সবার খোলা থাকলেও ওজালিওর বন্ধ থাকে কেন সে বোঝে না। সে যে ইংরাজি একটু আধটু বলতে পারে এটা বোধহয় প্রকাশ করার ইচ্ছে আছে। কিন্তু সুযোগই পাচ্ছে না। ফাঁক পেলেই ঘুর ঘুর করার স্বভাব। সারেঙ সাবের নজরে চোখ পড়ে যেতে পারে। সারেঙ সাব পছন্দ নাও করতে পারেন।

সারেঙসাব পোর্ট-সাইডের বাংকারে ঢুকে গেলেন। সেখানে লম্ফ জ্বলছে না। রাবারের একটা লম্বা তারে লোহার ক্যাপসুলে বাল্ব জ্বলছে। সারেঙসাব তারটা তুলে, হাতে ঝুলিয়ে নিলেন আলোটা। তারপর আলোটা এক পাশে রেখে পকেট থেকে টর্চ বের করলেন। অন্ধকারে ঢুকলে, চোখে কিছু পড়ে না। সয়ে এলে সব ধীরে ধীরে দৃষ্টিগোচর হয়। বেলচায় কয়লা তুলছে কেউ। কাজ দেখে খুশি, না গুনাগুনতি ঠিকই আছে, এই ভেবে খুশি—গোপাল তার কিছুই বুঝল না।

সারেঙসাব লাফ মেরে সিঁড়িতে উঠলেন। সেও পিছু নিল তার। সারেঙ সাবের সে হেলপার। ছায়ার মতো তার সঙ্গে লেগে থাকার কথা। তিনি তার দিকে তাকাচ্ছেনও না। সে কি করছে দেখছেনও না। তারপর চিমনির পাশ দিয়ে মাথা গলিয়ে বোট-ডেকে উঠে এলেন। বোট-ডেকের মাথায় ব্রিজ। সেখানে কম্পাস আর স্টিয়ারিংয়ের সামনে কোয়ার্টার-মাস্টার, কাপ্তান এবং চিফ অফিসার। পাইলট জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দুপাশে নদীর তীর, গাছপালা, গাদা-বোট, জেলে-নৌকা। আকাশের গায়ে জেগে আছে কলের চিমনি।

গোপাল বড় বড় চোখে দেখছে। তার দেশ, তার নদী, সব ফেলে সে জাহাজে সফর করতে বের হয়েছে। কবে ফিরবে জানে না। বোট-ডেক থেকে জাহাজের আগিল পিছিল সব দেখা যায়। ফরোয়ার্ড-ডেকে লম্বা মাস্তুল। আফটার-ডেকেও লম্বা মাস্তুল। ফ্রোজনেস্টে একটা হাওয়া-কল ঘুরছে। ডেক ডেরিক, দড়িদড়া, রঙ বার্নিশের গন্ধের ভিতর সে সিঁড়ি ধরে টুইন-ডেকে নেমে এল। ডেক জাহাজিরা জল মারছে হোস-পাইপে। জাহাজের পাটাতন সাফ-সুতরো করছে। উইনচ মেসিনের বিটে লাফিয়ে উঠে গেল গোপাল। সারেঙসাব প্রায় যেন দ্রুত ছুটছেন। সেও ছুটছে।

আফটার-পিকে এসে একবার তার দিকে তাকালেন তিনি। কিছু বললেন না। সুর সুর করে সে ইঞ্জিন-গ্যালি পার হয়ে সিঁড়ি ধরে নিচে নামতে থাকল।

সারেঙসাব তার লোকজন গুনছেন। হিসাব করে দেখছেন সব ঠিকঠাক আছে কিনা—যেন রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে—সারেঙসাব নিজের ফোকসালে ঢুকলেন না। দু নম্বর ফোকসালে বড় টিণ্ডাল ঠিক আছে। তিন নম্বর ফোকসালে সে থাকে। জাহির থাকে। কেউ নেই দরজা বন্ধ। জাহির ইঞ্জিন-রুমে। সে সারেঙের সঙ্গে। ফোকসালের দরজা বন্ধ থাকতেই পারে। পরের ফোকসালে তিন আগয়ালা, এক গ্রিজার। সারেঙসাব উঁকি দিতেই সবাই তটস্থ। যে যার সিগারেট আড়াল করছে। তিনি সব দেখেশুনে নিজের ফোকসালে ঢুকে কিছুটা যেন নিশ্চিন্ত হলেন। গোপাল তামাক সেজে দিলে খুব খুঁশি।

সারেঙসাবের পেটি সামান এখনও গোছগাছ করা হয়নি। বড় টিনের এক টিন রাব, প্রায় বস্তাখানেক তামাকপাতা আর তামার ডেগ ভর্তি কাঠকয়লা বাংকের নিচে ঢোকানো। কাঠের পেটি বাংকের নিচে ঠেলে দিয়েছিলেন জাহাজে উঠেই—তারপর সারা দিনমান, ইঞ্জিন-রুমের সাফসুতরো, যে ক'দিন জেটিতে জাহাজ, সারেঙ সাবের নাওয়া খাওয়া প্রায় হাপিজ হবার যোগাড়। গ্যালি থেকে ভাণ্ডারি হাঁকছে, সারেঙসাব আপনের খানা তো ঠাণ্ডা পানি মেরে গেল। সারেঙসাব কেবল বলছেন, যাই। যাই বললেই হয় না, সঙ্গে সঙ্গে ডাক পড়ছে, মাইজলা মিস্ত্রি ডেকে পাঠাচ্ছেন—কি কথা হয় গোপাল জানে না। কেবল সে দেখতে পায়, বয়লার সুট পরে তিনি সারেঙসাবকে হুকুম করে যাচ্ছেন।

কয়লা লেভেল, বয়লারগুলির নিচে একহাটু ছাই জমে আছে। বিল্‌জে নামতে হবে। বালতি বালতি তেল-কালি মেশানো ছাই অ্যাস-রিজেকটারে নিকাশ করার ঝামেলা এত যে সারেঙসাব একদণ্ড ফুরসত পাননি। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ তুলে দিতে না পারলে মেজাজ তাঁর ঠিক থাকে না। ক্রস বাংকারে কয়লা লেভেলিং করতে দুটো দিন লেগে গেল। সবই কয়লাওয়ালাদের কাজ। কাজে ফাঁকি কে না দিতে চায়—কিন্তু সারেঙসাব সদাসতর্ক। তার চোখকে ফাঁকি দেয় কার সাধ্য।

জাহাজ ছেড়ে দিলে কিছুটা আরাম। তাঁর পরি নেই। বড় টিণ্ডালের পরি আছে। ছোট টিণ্ডালেরও। সারেঙ সাবের হয়ে পরি করবেন এক নম্বর ডংকিম্যান। পরি মানে ওয়াচ। চালু জাহাজে চার ঘন্টা করে অবিরাম তিনটে

পরি অর্থাৎ প্রহরী চলছে। গোপাল জাহাজে উঠে অনেক কিছু শিখে ফেলেছে। ভদ্রা জাহাজে প্রশিক্ষণের সময় জানতই না কাপ্তানকে বাড়িয়ালা বলা হয়। ওয়াচকে পরি বলা হয়। ডেক অফিসারদের বড়া সাব, মাইজলা সাব বলা হয়।

আলতাফ তখন বাংকের নিচ থেকে পেটি টেনে বের করছেন। গোপাল ভাবল, কাজে হাত লাগানো দরকার। সে নুয়ে পেটির অন্যদিকে টানতেই আলতাফ বললেন, আহা কি করছিস। এখন যা। গোসল করে নে না। সে বের হয়ে যেতেই আলতাফ কি ভেবে তাঁকে ডাকল ফের। সে কাছে গিয়ে দাঁড়ালে বলল, 'তোর দেখছি ঘুরঘুর করা স্বভাব। এটা ভাল না। ওখানে কি করছিলি ?'

'কোথায় ?'

'বাড়িয়ালার ছেলেটা ভাল না বলে দিলাম। এড়িয়ে চলবি। শয়তান। কোন তকলিফে ফেলে দেবে কে জানে ?'

গোপাল ঠিক ধরা পড়ে গেছে। সারেঙ সাবের চোখ। ফাঁকি দেওয়া কঠিন। সে তো দাঁড়িয়ে ওজালিওকে দেখছিল। তার কেন যে দেখতে ভাল লাগে। ওজালিও নাম কিনা জানে না। সে নিজেই ছেলেটার নাম মনে মনে কি পছন্দ করে নিয়েছে! ডেকে ওজালিও একা একা কাজ করে। সাদা বয়লার সুট পরে থাকে। কারো সঙ্গে কথা বলে না। কেমন নিঃসঙ্গ।

জাহাজের বুড়ো কার্পেন্টার চিয়াং-এর সঙ্গে দোস্তি থাকতে পারে। কারণ সে যা চায় চিয়াং তা দিতে পারে। হেরন পাখিগুলির খাবার চিয়াং দেয়। ওজালিও তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। অথবা ওজালিও যে কাজ পছন্দ করে চিয়াংকে তাই মেনে নিতে হয়। হেরণ পাখির খাঁচাগুলির ভিতর ওজালিওকে-ই বেশি দেখা যায়। চিয়াংকে দাঁড়িয়ে থাকার হুকুম দিলে কিছু করারও নেই।

গোপাল ভেবে পায় না, চিয়াং ওজালিওকে দিয়ে কাজটা করায়, না চিয়াং-এর কাজ ওজালিও কেড়ে নিয়েছে। পাখিকে কে খাওয়াতে না ভালবাসে। তারও ইচ্ছে হয়, খাঁচার উপরে মাংস ঝুলিয়ে রাখে। কি সুন্দর ঠোঁট পাখিগুলির। সারাক্ষণ কক-কক করছে। খাবারের গন্ধ পেলে হুটোপাটি শুরু করে দেয়। পাখা ঝাপটায়। খাঁচায় জোড়ায় জোড়ায় পাখি। হলুদ রঙের লম্বা পা, হলুদ রঙের লম্বা ঠোঁট। আর সাদা রঙের এই সব দুর্লভ সারস ভারত থেকে সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকায় যাচ্ছে। শত হলেও নিজের দেশের

পাখি—জাহাজে উঠে নিজের দেশের জন্য এত মায়া থাকে এই প্রথম টের পেয়েছে গোপাল। নির্বাসনে সে শুধু একা যাচ্ছে না, পাখিগুলিও যাচ্ছে। সমুদ্র সফরে বের হওয়া প্রায় যেন নির্বাসনেরই সামিল। কেউ ফেরে কেউ ফেরে না। আর টিবিড-ব্যাঙ্ক জাহাজের তো অপবাদের শেষ নেই। তা তার সামান্য লোভ হয়েছিল। সে খাঁচাগুলির পাশে দাঁড়িয়ে পাখিদের খাওয়ানো দেখছিল। ভাল লাগলে কি করবে।

সে বলল, 'কখন ঘুরঘুর করলাম ! আপনি কেবল ঘুরঘুর করতেই দেখেন ! ভারি বয়ে গেছে ঘুরঘুর করতে !'

সে যে ঘুরঘুর করছে না, একটা বিচ্ছু ছেলের পাল্লায় পড়ছে না, সারেঙসাবকে তা বুঝিয়ে দেবার জন্যই কথাটা বলল, অকারণে সারেঙ সাবের দুশ্চিন্তাও তার পছন্দ না। তাকে এত অসহায় ভাবার কি আছে ! সে তার ভালমন্দ ঠিকই বোঝে।

সারেঙসাব পেটি খুলে কিছু খুঁজছিলেন, তারপর পেয়ে গিয়ে যেন কিছুটা নিশ্চিন্ত—একটা ন্যাকড়ার পুঁটুলি—তাতে পাটালি গুড়। কিছুটা ভেঙে বললেন, 'কাছে রেখে দে। দেওয়ানি সামলাতে না পারলে খাবি।' কাগজে মুড়ে দেবার সময় তার মুখ দেখে কি ভাবলেন কে জানে ! বললেন, 'ম্লেচ্ছ বুঝলি না। বাপের আদরে মাথাটি গেছে। কাউকে গ্রাহ্য করে না। চিফ অফিসার থেকে মার্কনি সাব সবাই তটস্থ থাকে। কার নামে কি নালিশ দেবে ঠিক কি !'

গোপাল, পাটালি গুড়ের গন্ধ নিল নাকে। ভারি মিষ্টি ঘ্রাণ। আড়ালে ডেকে পাটালি গুড় দেওয়াটা কতটা শোভন সে বুঝতে পারছে না। জাহাজ সমুদ্রে পড়লেই সি-সিকনেসের শিকার হবে। সে নতুন জাহাজি, তাকে কাহিল করে দিতে পারে। তখন হয়তো পাটালি গুড় তাকে রক্ষা করতে পারে। কিছু খেতে পারবে না, মাথা ঘুরবে—বমি করে ডেক ভাসাবে—জাহাজের ওঠানামা প্রবল হতেই পারে, জুন-জুলাই-এর দরিয়া, ঝড় সাইক্লোনে পড়ে গেলে মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারবে না।

পাটালি গুড় খেলে দেওয়ানি লাগে না, সি-সিকনেস হয় না এটা বুঝতে গোপালের কষ্ট হল না। চাঁটগাই, সন্দীপি আর সিলেটি নিরক্ষর মাঝিমাল্লারা এতদিন কলকাতা বন্দরকে সচল রেখেছে। দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ায় এরা এখন বিদেশী। ভদ্রা জাহাজ থেকে কাতারে কাতারে নতুন জাহাজি নেমে আসছে। রুজিরোজগারের প্রতিবন্ধক তারা। জাহাজে উঠে চাচাদের কাছ থেকে ভাল

ব্যবহার পাবে আশাও করেনি। কিন্তু সারেঙসাব পাটালি গুড় দেওয়ায় গোপাল ভাবল, বাড়াবাড়ি। ফিরিয়ে দেবে তেমন সাহসও তার নেই। কেউ দেখে ফেললে, বলবে, 'সারেঙসাব দিল ! এত পীড়িত কেন রে ! হারমাদ লোক বলে দিলাম। একদম আসকারা দিবি না।' তা ছাড়া আগয়ালা বিকাশদা তাকে তড়পাতে পারে। চাচাদের আচরণে নানা খুঁত ধরার স্বভাব তার। বলতেই পারে, কেন দিল বোঝ না ! ভেটকি কোথাকার !

আসলে তার মন্দ স্বভাব এটা। কেউ গালাগালি দিলেও হাসে। হাসতে গিয়ে দন্তপাটি বের করে দেয়। যেন তাকে আদর করছে। হাসলেই নাকি সে একখানা ভেটকি মাছ। তার মুখের সঙ্গে ভেটকিমাছের তুলনা কেন যে করে বিকাশদা—সে আয়নায় বার বার মুখ দেখেও তা অনুমান করতে পারে না। তাড়াতাড়ি জ্যাবের ভিতর পাটালিগুড় লুকিয়ে ফেলে সে সারেঙের ফোকসাল থেকে বের হয়ে গেল।

সে তার নিজের ফোকসালে ঢুকে গেল। লকার খুলল। পকেট থেকে পাটালি গুড় বের করে গোপনে রেখে দিল—কেউ টের পেলে রক্ষা নেই ! তার পেছনে লাগবে। কথা ওড়াউড়ি হতে কতক্ষণ। সে লকার টেনে দেখল। না খুলছে না। জাহির আর সে এই ফোকসালটায় থাকে। জাহির থাকে নিচের বাংকে। উপরের বাংকে সে। স্নানের বালতি নিয়ে সে উঠে গেল সিঁড়ি ধরে। সাবান নিল। জাহির অবশ্য লকারটা খুলতে পারে। দু'জনের লকার—জাহির তার সামান লকারে রেখেছে। স্নান করার সময় মনে হল, যতই গোপন করার চেষ্টা করুক, জাহির না আবার ফাঁস করে দেয়। যদি বলে, আরে গোপাল লকারে কে পাটালি গুড় রেখেছে ! সে তখন কি বলবে ! তবে জাহির দুবলা মানুষ। বয়সের গাছপাথর নেই। লজঝরে জাহাজে সারেঙ-এর মেহেরবাণীতেই উঠে এসেছে। কেন যে এমন একজন দুবলা মানুষের সঙ্গে তার থাকার ব্যবস্থা করল সারেঙসাব তাও সে বোঝে না। জাহিরকেও সারেঙ সাব ফালতু করে রেখেছেন। কয়লায়ালার কাজ করতে হচ্ছে না। বাংকারে কয়লা টানতে হচ্ছে না। আগয়ালাদের হম্বিতম্বি পোহাতে হচ্ছে না। তা জাহিরের পক্ষে তেলজুট নিয়ে ইনজিনের প্লেট ঘসাঘসি মানায়। সে তো তা না। বিকাশদা পরি ভাগ হতেই ফোকসালে ঢুকে বলেছিল, 'গোপাল, জাহাজে কাজ করতে এসেছিস। ফালতু হতে আসিসনি। ইজ্জত বুঝতে শেখ। দামড়া কোথাকার !'

স্নানের সময় বাথরুমের বড় আয়নায় সে নিজেকে দেখতে পেল। সম্পূর্ণ

উলঙ্গ সে। সাবান সারা শরীরে, মাথায়। চিমনির ধোঁয়ায় সারা ডেক কালিময়। ডেকে সারাদিন ঘোরাঘুরি করলে গায়ে মাথায় কালি লেগে যেতেই পারে। নদীর হাওয়া আর নতুন কয়লা বয়লারে পড়ায় চিমনি গল গল করে ধোঁয়া উগলে দেয়। ডেক, মাস্তুল ফলকায় ভুসো কালি ওড়াউড়ি করে। সাবানে ময়লা কাটছে। সে ভাল করে স্নান করার সময় নিজের পেশি দেখল, কোমর দেখল। একজন ছিমছাম তরুণ নাবিকের সবই একটু বেশি আছে। এবং সে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে কেন যে কাপ্তানের পুত্রটির মুখ ভেবে কিঞ্চিত উত্তেজনা বোধ করল। কাপ্তানের পুত্রটি তাকে গোপনে নজর দিতে ভালবাসে কেন তাও সে বুঝছে না।

সেও ফাঁক পেলেই গ্যাংওয়ের দিকে হেঁটে যায়। আসলে দুজনই কমবয়সী। সমবয়সী না হলেও কাছে পিঠের। বিকাশদা মাঝে মাঝে তাকে, ঈশ্বরের পুত্র বলেও ডাক খোঁজ করে। সে তখন লজ্জায় পড়ে যায়।

সে তো গোপাল। ঈশ্বরের পুত্র হতে যাবে কেন! ঈশ্বরের পুত্রকে তো তাড়া খেতে হয়েছিল।

বাঘের মতো কুকুরটাকে লেলিয়ে দিয়েছিল ওজালিও। লেলিয়ে দিয়েছিল, না কুকুরটার স্বভাব মন্দ সে জানে না। বাদশা মিএগা তাকে ওজালিওর কেবিনে নিয়ে গেছিল। কাজটা ডেক জাহাজিদের। অথচ সারেঙসাব তাকে আর ছোট টিণ্ডালকে কেন যে পাঠালেন। কেবিনটি ধোয়া মোছা করতে হবে। রঙ লাগাতে হবে। কাপ্তানের কোনো গোপন নির্দেশ থাকতে পারে। একজন বুড়ো মতো মানুষ এবং তরুণ কোনো নাবিকের পক্ষেই কেবিনটিতে ঢোকার অনুমতি থাকতে পারে। জাহাজের ছোট টিণ্ডাল অর্থাৎ বাদশা মিএগা বয়সের ভারে জর্জর। তবে শক্তসমর্থ মানুষ। তার হাতে ছিল সাবান জলের টব। সে সাবান-জল মেরে দিচ্ছিল। বাদশা রঙ লাগাচ্ছিল। সাদা রঙ। হাতির দাঁতের মতো সাদা কেবিন। বিছানার চাদর সাদা। দামি বেডকভার। কাঠের লকার। থরে থরে বই সাজানো। বাথরুম খুলতে গিয়ে অবাক। একটা সোনালি গাউন।

গাউন কেন!

এতটুকুন বাচ্চা ছেলে, তার ঘরে গাউন আবিষ্কার করে কিছু বিভ্রমে পড়ে গেছিল। দরজায় নক করলে ওজালিও দরজা খুলতেও দেরি করছিল। বাদশা দরজায় টোকা মারছে। কুকুরটা ভিতরে দাপাচ্ছে। গোপাল ম্রিয়মান, এলিওয়েতে নীল রঙের কার্পেট পাতা। রঙ কিংবা সাবান-জল পড়ে গেলে

কেলেঙ্কারি। বাদশা মিঞা আর গোপাল খুবই সতর্ক ছিল। গোপাল বাদশা মিঞার পেছনে। তার ভয় ছিল, দরজা খুললেই কুকুরটা তার উপর লাফিয়ে পড়বে।

দরজা খুলতেই দেখেছিল লম্বা উঁচু মতো এক বালক, প্রায় তারই সমকক্ষ বের হয়ে যাচ্ছে। যেন জানত, কেবিন ধোয়া মোছা হবে। যেন জানত কেবিনে রঙ করা হবে। রুটিন কাজ। এত সুন্দর কেবিন হয়, গোপাল কিছুটা তাজ্জব বনে গেছিল। নীচে সবুজ গালিচা পাতা। কুকুরটা তার দিকে তেড়ে এলে সে প্রায় বাদশার গায়ে ঝাপিয়ে পড়েছিল। রক্ষা কুকুরটাকে সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়ে সে তরতর করে উঠে গেছিল সিঁড়ি ধরে। বোধ হয় বাপের কেবিনে চলে গেল। গায়ে সাদা তোয়ালে জড়ানো। স্নানটান বাপের কেবিনেই সমাধা করবে সম্ভবত। এটাচড বাথ। গোপাল জাহাজে উঠে বিলাসিতা কাকে বলে, কেবিনটায় না ঢুকলে যেন টের পেত না। সন্তর্পণে তারা গালিচা তুলেছে। লকার সরিয়েছে। সাবান-জল মেরেছে। দরজা খোলা। আর বাথরুমে সোনালি গাউন আবিষ্কার করতে না করতেই দুপদাপ হুড়মুড় করে আওয়াজ। ছুটে আসছে। যেন মারাত্মক ভুলের শিকার। এসেই ধরা পড়ে গেছে মতো কিছু ভেবে হ্যাচকা মেরে সোনালি গাউন কেড়ে নিয়েছে। কাগজে জড়িয়ে উঠে যাবার মুখে কেন যে বলল, হেল! কুকুরটা বোধ হয় তার গলা কামড়েই ধরত। একান্ত ঈশ্বরের পুত্র বলে রক্ষা পেয়ে গেছে। কুকুরটাকে টানছিল—কিছুতেই যাবে না। হা হা করছে। গোপাল চোখ বুজে দাঁড়িয়েছিল। তারপরই ওজালিওর খুক খুক হাসি! আরে এটা কি ধরনের মসকরা। কয়লায়ালা সে, জানতেই পারে। তা কয়লায়ালা বলে সে কি মানুষ না! বিশ্রী কাণ্ড। তার রাগই হয়েছিল।

অথচ সে এখন আর তার ক্ষোভের কথা মনে করতে পারছে না। জাহাজ এখন নদী ধরে যাচ্ছে। দু-পাড়ে গাছপালা, কলের চিমনি কমে আসছে—নারকেল গাছের ছায়া দু-পাড়ে। জেলে-নৌকো ভাসছে। পর পর জাহাজ নদী ধরে উঠে আসছে। সে রেলিঙে ভর করে দাঁড়ালে দেখতে পেত বোট-ডেকে ছেলেটি বসে আছে। ডেক চেয়ারে বসে আছে—সাদা প্যান্ট সার্ট গায়। প্যান্ট-সার্ট দুই বড় ঢোলা। কুকুরটা পায়ের কাছে শুয়ে থাকে। চোখ বুজে থাকে। গোপাল জাহাজের পিছিল থেকে সব দেখতে পায়। আসলে সোনালি গাউনটাই যত বিভ্রমের মূলে। বাথরুমে কিছুটা যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে, ঐ গাউনটাই তার কারণ। যেন ওজালিও মেয়ে হলে তার বেশি ভাল

লাগত।

তার মধ্যে কি কোনো সমকাম ক্রিয়া করছে। জাহাজ যে খারাপ জায়গা, কয়েকদিনেই টের পেয়ে গেছে। কাহাতক ভাল লাগে! দিনরাত শুধু পুরুষের সঙ্গ। সবাই তার উপরয়ালা। নারীর মুখ কত প্রিয় হতে পারে—জাহাজে না উঠলে বুঝি টের পেত না। সারাদিন কাজের পর ফোকসালে তাস খেলা, নয় গ্যালির পাশে বসে থাকা। রেলিঙে ঝুঁকে নদীর দু-পাড় দেখা। সে গরীব বাবার ছেলে। তার পক্ষে সম্ভবও নয় বই পড়ে সময় কাটিয়ে দেওয়া। কাপ্তানের পুত্রটি লকার ভর্তি বই এনে তুলেছে। অবসর সময় বই তার প্রিয় সঙ্গী হতে পারত। বই পড়তে সে ভালবাসে। তার কিছুই নেই।

আর কেন যেন মনে হয় ওজালিও ভারি সুন্দর। মেয়ে হলে তাকে দেবী-টেবি ভাবতে পারত। ওজালিওকে দেখার এত আগ্রহ কেন তাও বোঝে না। এলিওয়েতে ঢোকারও নিয়ম নেই। তারা সাধারণ মাঝি মাল্লা। তাদের কেউ অফিসার কিংবা ইনজিনিয়ার নয়। বিদেশী কোম্পানি, পয়সায় সস্তা হয় বলে কলকাতা থেকে নেটিভদের তুলে নেয়। দেশ স্বাধীন হলে কি হবে, শরীরে যে নেটিভের গন্ধ এখনও আছে। গোপাল এ-সব ভালই বোঝে। কোনো ডেক জাহাজি কিংবা এনজিন জাহাজির সাহসই নেই সাহেবদের সঙ্গে কথা বলে, মসকরা করে। এলিওয়েতে ঢুকে সে কেবিনগুলো দেখার সুযোগ পেয়েছে।

আসলে ওটা যেন ভিন্ন গ্রহ। কী সুন্দর ঘ্রাণ কেবিনে, কোথা থেকে ফুল আসে তাও সে জানে না। ওজালিওর কেবিনে সে ফুলদানিতে রজনীগন্ধা পর্যন্ত আবিষ্কার করেছিল। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য কত কিছু যে দরকার হয় এলিওয়েতে না ঢুকলে সে জানতেই পারত না।

ডাইনিং হলে ঝাড় লণ্ঠন দুলছে। পিতলের কারুকাজ করা নামের সব ফলক। জাহাজের জাঁদরেল কাপ্তানদের ছবি দেয়ালে। ইউনিয়ান জ্যাক উড়ছে। বিশাল ডাইনিং টেবিল সাদা চাদরে ঢাকা। বয় বাবুর্চি বাটলারের ছোটাছুটি দেখে হকচকিয়ে গেছে গোপাল। গোপাল বোঝে আসমান জমিনের ফারাক তার সঙ্গে ওজালিওর। সারেঙসাব সতর্ক করে দিয়ে ভালই করেছেন।

স্নান-টান সেরে গোপাল উপরে উঠে গেল। গ্যালিতে ঢুকে বলল, 'চাচা খেতে দিন।' সে তার গ্লাসে জল নিল। কলাইকরা থালা বাড়িয়ে দিল মেসরুমের ভিতর থেকে। জানালার মতো গ্যালির সঙ্গে মেসরুমের একটা যোগাযোগ আছে।

ভাণ্ডারি রহমত ঠিকমতো সোজা হতে পারে না। ভারি ড্যাগ নামাতে কোমর বেঁকে গেছে। কোনোরকমে টান টান হয়ে গ্যালি থেকে মুখ বাড়িয়ে থালা নিল। ভাত ডাল সবজি আলুভাজা দিল পাতে। গোস্ত দিল না। সারেঙসাবের হুকুম মটন হলে দেবে, বিফ হলে দেবে না। জাত মেরে আখেরে গুনাগার হতে চায় না বোধ হয়—তবে কেউ খেতে চাইলে দেয়। জাহাজে তারা পাঁচজন বাঙ্গালীবাবু উঠেছেন। ইনজিনে সে আর বিকাশ পাকরাশি, ডেকে ইন্দ্রনাথ, মাধব আর দেবনাথ। একমাত্র দেবনাথই বিফ মটন মানে না। সে যা পায় তাই খেয়ে নেয়।

রহমত কিংবা জাহিরকে দেখলে মনে হবে জাহাজটা বাতিল লোকের আখড়া। গোপাল তো জাহাজে উঠে রহমতকে দেখে কিছুটা বিভীষিকা প্রায় ভেবেছিল। সরু সরু হাত পা। কোমর বাঁকা, থুতনিতে অল্পবিস্তর পাকা দাড়ি। বিকাশদা বলেছিল, মিঞা জব্বর বিবির তাঁবে আছ, কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে দেখছি।

গোপাল রহমতকে কখনও চাচা বলে, কখনও জ্যাঠা বলে। চাচা বললে খুশি হয়, জ্যাঠা বললে ক্ষেপে যায়। সে এখন জ্যাঠা বলেনি, কারণ খাওয়ার সময় সামান্য তোয়াজ করতেই হয়। দরকারে কাচালঙ্কা, কাচাপেঁয়াজ চাইলে পাওয়া যায়। সবজির পরিমাণও বাড়ে।

গোপাল জাহাজে উঠেই বুঝেছে, জাহাজিরা প্রায় ক্রীতদাসের সামিল। এত দৈন্যদশা যে সকালে চর্বিভাজা রুটি চা, দুপুরে ভাত ডাল গোস্ত, বিকেলে ফের চর্বিভাজা রুটি, রাতে ডাল ভাত গোস্ত। সারা সফর বরফ ঘরের বাসি গোস্ত ছাড়া জীবনরক্ষার উপায় নেই। আর অফিসার্সদের জন্য এলাহী ব্যবস্থা। সকালে কফি স্যান্ডউইচ, কমলা লেবু নয় আপেল দিয়ে শুরু। রাতে ডাইনিং হলে মিউজিক পর্যন্ত বাজে। নদীর জলে জাহাজ যায়, মিউজিক বাজে, মাস্তুলে ডেরিকে নানা বর্ণের আলো আর তখন ওজালিও কি করে সে জানে না।

॥ তিন ॥

জাহাজের পাঁচ নম্বর মিস্ত্রি গোয়ানিজ বলে গোপালের একটা গর্ব আছে। তাকে দেশের লোক, নিজের লোকও মনে করতে পারে। আর সব অফিসার ইনজিনিয়াররা ওয়েলসের লোক। বাড়িয়ালা নিজেও। গোয়ানিজ সাহেবটিও কেমন প্রাণ খুলে কথা বলতে ভয় পায় তাদের সঙ্গে। অপ্রয়োজনে কথা বলে না। হুকুম করতে জানে শুধু। সাহেব আবার মাইজলা মিস্ত্রিকে যমের মতো

ভয় পায়।

একদিনতো মাইজলা মিস্ত্রি সবার সামনেই ফাইভারকে অপদস্থ করল। যা মুখে আসে বলল। গালাগাল দিল। উইনচের মেরামতি করতে গিয়ে ফাইভার ফাঁপড়ে পড়ে গেল। ডেকের উপর খোলামেলা জায়গায় মাথা নিচু করে অপমান হজম করল গোয়ানিজ সাহেবটি। গোপালের যাও অহঙ্কার ছিল দেশী সাহেবটিকে নিয়ে, তাও শেষে উবে গেল। বুঝল তারা মানুষ না আদমি। জানোয়ারও ভাবতে পারে। অন্তত মাইজলা মিস্ত্রির আচরণে এটা তার মনে হয়েছে।

কি করে বদলা নেবে, অপমানের জ্বালা খুবই কঠিন, ফাইভারকে বাস্টার্ড, বাগার বলা মানে, সব ভারতীয়দের অপমান। জাহাজ মোহনায় ঢুকতেই গোপাল এক সকালে সুযোগ পেয়ে গেল। জাহাজের থার্ড অফিসারটি ডেক ধরে হেঁটে আসছে। ডেক-সারেঙ দৌড়ে যাচ্ছে। কোনো কাজ কামের কথা থাকতে পারে। পাইলট বোট দেখা যাচ্ছে। বোটে জাহাজের পাইলট অফিসারটি নেমে যাবেন। দড়ির সিঁড়ি ফেলে দিতে হবে। ঝুলে ঝুলে নেমে গেলে, জাহাজ সমুদ্রে ঢুকে যাবে।

অনন্ত অসীম সমুদ্র সামনে। যতদূর চোখ যায় শুধু জল আর জল। উপরে নীল আকাশ। কিছু অ্যালবাট্রস মাথার উপর ওড়াউড়ি করছে। দূরে দুটো জাহাজ নোঙর ফেলে আছে। নদীতে ঢোকার জন্য অপেক্ষা করছে। জোয়ার না এলে নোঙর তুলতে পারবে না। জোয়ারে জোয়ারে নদীর ভেতর ঢুকে যেতে হবে। সেই আশায় জাহাজ দুটো পাইলটের অপেক্ষায় বসে আছে।

ডেকে জল মারা, চিপিং করা, রঙ করা, দড়িদড়া আগলানো, জাহাজ ঘাটে গেলে বাধাছাঁদার কাজ, সাঁজ লাগলে মাস্তুলে আলো জ্বালানো, ডেক জাহাজিদের এক্তিয়ারে। ইনজিন সারেঙের কাজ, ইনজিন আর বয়লার সামলানো। স্টিম ঠিক রাখা। ইনজিন জাহাজি গোপাল এখনও ফালতু। সারেঙসাব তাকে ডেকে কেন যে বললেন, গোপাল তুই পাঁচ নম্বরের লগে থাকবি। আমার লগে ঘুরবি না। যা কশপের ঘর থেকে তেল জুট চেয়ে নে। ফাইভারকে গিয়ে রিপোর্টি কর। চিজেল হাতুড়ি স্প্যানার যা লাগে এগিয়ে দিবি। জাহাজে মেরামতির শেষ নেই। উইনচে নোনা ধরে যায়। জং পড়ে। ঘাটে লাগার আগে উইনচে গণ্ডগোল থাকলে মাইজলা মিস্ত্রি ফাইভারকে গিলে খাবে।

আসলে ফাইভারের হেলপার হয়ে গেল। এটা পদোন্নতি কি না সে জানে না। সে ইংরাজি বোঝে, ইংরাজি বলতে পারে—সে কলেজে পড়তে পারেনি অর্থাভাবে—নেহাত খারাপও ছিল না পড়াশোনায়—সহজেই সে মেসিনের ভিতর পড়ে থেকে কি চাইছে ফাইভার, নম্বর মিলিয়ে হাতের কাছে এগিয়ে দিতে পারে।

সেই ফাইভারকে হেনস্থা। সহ্য হবে কেন! মৌকা মিলে গেলে কেই বা ছাড়ে। থার্ড অফিসার দু নম্বর মল্লার কাছে দাঁড়িয়ে ডেক সারেঙকে কাজের নির্দেশ দিচ্ছিলেন। ডেক-টিণ্ডাল পাশে দাঁড়িয়ে। ফাইভার স্ট্র্যাপার খোলার জন্য উইনচের নিচে চিত হয়ে পড়ে আছে। চিজেল হাতুড়ি তেলজুট যখন যা দরকার এগিয়ে দিচ্ছে গোপাল। জাহাজ সমুদ্রে পড়তেই পিচিং শুরু হয়ে গেল। অল্পবিস্তর জাহাজ ওঠানামা করতে শুরু করেছে। দুলছে জাহাজ, গড়াচ্ছে জাহাজ। গলগল করে ধোঁয়া ওগলাচ্ছে চিমনি। আর সে-সময় হঠাৎ থার্ড অফিসারটি তার দিকে তাকিয়ে কিছুটা যেন বিস্মিত। জাহাজে কি সত্যি সে ঈশ্বরের পুত্র! না হলে বলবে কেন, তোমার নাম কি খোকা?

এও হতে পারে, সব মানুষ তো সমান হয় না। এত বড় লম্বা সফরে হৈহৈ করে দিন কাটাতে না পারলে সমুদ্রের একঘেয়েমি গ্রাস করতে কতক্ষণ। তাকে দেখে পছন্দও হতে পারে—বয়েস কম হলে যা হয়। সবাই আদর করতে চায়। এই ন্যাকামিটাই গোপাল পছন্দ করে না। খোকা বলায় সে কিছুটা বিরক্ত। জাহাজে উঠে সে যেন খুব ভুল করেছে। এই বয়সে জাহাজ তার পক্ষে মোটেই নিরাপদ জায়গা নয়। খোকা বলে আবার যেন তার অস্তিত্বকে নাড়া দিতে চাইল। তার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। সে নিজেকে যুবক ভাবতে পছন্দ করে। গায়ে গতরেও সে বিশাল। তার হাতের পেশি কম মজবুত নয়। সে কি বলবে থার্ড অফিসারকে বুঝতে পারছে না। হঠাৎ তার নাম নিয়েই বা এত রাহাজানি কেন! আবদার!

সে জবাব দিচ্ছে না বলে, ডেক-সারেঙ কিছুটা অপ্রস্তুত। ডেক-সারেঙ তাকে ধমকও দিতে পারে না। কারণ গোপাল ডেক-জাহাজি নয় যে ধমকে কথা বলবে। তবে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে পারে তাকে। একজন কয়লায়ালাকে সমীহ করার কোনো কারণও নেই। ডেক-সারেঙ তার দিকে কপাল কুচকে বললেন, 'কি বলছে শুনতে পাচ্ছিস না?'

'না পাচ্ছি না!'

'কী ছেলেরে বাবা?'

গোপাল জবাব দিল না। সে উইনচের ভিতর মাথা গলিয়ে দিল।

থার্ড অফিসার পিটার যে খোস মেজাজের মানুষ পরে বুঝতে অসুবিধা হয়নি গোপালের। কারণ এই উত্তপ্ত জাহাজে মাথা ঠিক রেখে কাজ করা কঠিন। কি রোদ! ডেক তেতে যাচ্ছে। লোহার পাত ডেকে—কাঠের পাটাতন প্রায় নেই বললেই চলে। পা রাখলে তেতে যায়। গোপাল ওয়ারপিন ড্রামে ঝুঁকে তা টের পাচ্ছিল। জামা গায়েও স্যাকা লাগছে শরীরে। তেলকালিতে হাত নোংরা। মাথা গরম করতেই পারে।

পিটার পকেটে হাত রেখে চুরুট টানছিল। ফল্কার কিল মজবুত কিনা পরখ করে দেখছে। ঝড়ের দরিয়ায় ত্রিপাল উড়ে ফুঁড়ে গেলে বিপদ। সারেঙ তার কাজের কথা বুঝে চলে গেল। দাঁড়াল না। পিটার এবার তার কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, তোমার নাম বললে নাতো! মন খারাপ। বাড়ির জন্য মন খারাপ। মন খারাপের কি আছে! কত কিছু দেখবে। কত বন্দরে ঘুরবে। সমুদ্র ঝড় অ্যালবাট্রস পাখির ওড়াউড়ি দেখতে দেখতে সময় কেটে যাবে। নির্জন দ্বীপে শুধু একটা ক্যাকটাস হাজার মাইল ব্যাপ্ত নীল জলরাশির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে জানলে এর মধ্যে জীবনের মজা খুঁজে পাবে। মন খারাপ করে থাকবে কেন!

এত কথা কে যে বলতে বলেছে! বিকাশদা পাশ দিয়ে যেতেই থার্ড অফিসার পিটার বলল, 'নতুন বুঝি।'

বিকাশদা বলল, 'হ্যাঁ সাব।'

'নাম বলছে না।'

'ওরকমেরই। নাম বলে না। আমরা বাবা ডাকি।'

'কি হচ্ছে বিকাশদা।'

বিকাশদা মজা করার জন্য বলল, 'তুমিও ওকে ডাকতে পার।'

গোপাল প্রায় তেড়ে গেছিল বিকাশদাকে—'ভাল হচ্ছে না'। বলে সে লাফ দিয়ে ডেক পার হয়ে পিছলে চলে এসেছিল। তারপর মনে হয়েছে সাহেবের সঙ্গে কথা না বলে সে ধৃষ্টতার কাজ করেছে। আসলে বিজাতীয় ঘৃণা থেকেই সে কথা বলতে পারেনি। সাহেবরাতো তাদের মানুষ বলে মনে করে না। কাজ ছাড়া কেউ কোনো কথাও বলে না। অথচ এই পিটার অন্যরকমের মানুষ। সে নিজের বোকামির জন্য কেমন কিছুটা লজ্জিতও। দেখা হয়ে গেলে সে রাস্তা পাল্টে ফেলে। পিটারও ছাড়বে না। ধরে ফেলল ডেকে—বলল, 'কোথায় আমরা যাচ্ছি জান' গোপাল বলল, 'কেপটাউনে।'

'না ঠিক বললে না। যাচ্ছি কলম্বো। রসদ তোলা হবে।'

'ওখানে নামতে পারব না?' গোপাল কিছুটা সহজ গলায় প্রশ্ন করেছিল পিটারকে।

পিটার বলল, 'ডাঙ্গা মানুষের কত প্রিয় সমুদ্র সফরে বের না হলে বোঝা যায় না। লোকজন, রাস্তা, জানালায় বালিকার মুখ—দারুণ লাগে। অথচ নামতে পারবে না। রাতেই রসদ তোলা হয়ে যাবে। কেপটাউনে নামতে পারবে। খুশি মতো ঘুরতে পারবে। পাহাড়ের উপর শহর। দেখতে দারুণ। ডাচ মেয়েরা তোমাকে পেলে গিলে খাবে—সব কটা ডানা কাটা পরী। তারপর চোখ মেরে এমন অশ্লীল ইঙ্গিত করল যেন পিটার তার সমবয়সী ইয়ার।

জাহাজ সমুদ্রে নেমে যেতেই দোল খেতে থাকল। সোজা দাঁড়ানো যায় না। সামনে পেছনে কেবল টাল খায়। গোপালের পয়লা সফর।

নীল জলরাশি এবং অনন্ত আকাশের নিচে একটা সামান্য কাগজের নৌকার মতো বিশাল জাহাজ ভেসে চলেছে। জাহাজটা ছোটখাট শহর যেন। জাহাজে কাজের শেষ নেই। সাফ সুতরোর কাজ, ডেকে জল মারবার কাজ। বয়লারে হরদম কয়লা হাকড়াতে হচ্ছে। স্লাইস র‍্যাগ তুলে আগয়ালারা বয়লারের কলিজা ফুটো করে দিচ্ছে। আগুন উসকে দিচ্ছে। টন টন কয়লার ছাই হাফিজ করা হচ্ছে। অ্যাস-রিজেকটারে ছাই সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কাপ্তান, চিফ-অফিসার চার্টরুমে ছোটাছুটি করছেন। রেডিও-অফিসার ট্রান্সমিশান রুমে ডাঙ্গায় খবর পাঠাচ্ছেন। কোয়ার্টার-মাস্টার হুইলের সামনে দাঁড়িয়ে। বয় বাটলার বাবুর্চিরা ডাইনিং হলে না হয় কেবিনে কেবিনে ছুটে বেড়াচ্ছে। টোপাস বাথরুম পরিষ্কার করে বের হয়ে আসছে। কেউ বসে নেই। আর গোপাল বমি করছে ডেকে বসে অক অক করে।

সি-সিকনেস। গোপালের মাথা ঘুরছে। সে হাতে টব নিয়ে হাঁটিতে হাঁটিতে অক অক করে জল বমি করল। গোপাল কিছু খেতে পারছে না। খেলেই বমি হয়ে যাচ্ছে। সে শুয়ে থাকতে পারছে না। শুয়ে থাকার নিয়ম নেই। পয়লা সফর—একটু বেশি ভুগবে—কেবল আলতাফ বোঝাচ্ছে, ছেলে পাটালি গুড় মুখে দে। আলতাফ হাতে এক গ্লাস জল নিয়ে ছুটে এসেছে। কার কাছে খবর পেয়েছে, গোপাল বমি করছে ডেকে বসে। কাহাতক আর গোপন রাখা যায়। কেউ দেওয়ানির শিকার না। কেবল সে কেমন ঘোরে পড়ে গেছে। দাঁড়ালে মাথা ঘোরে, বসলে মাথা ঘোরে, শুয়ে থাকলে বমি আরও বাড়ে।

নিদারুণ কষ্ট। সকাল থেকেই মহান পর্বটি তার শুরু হয়েছিল।

রাতে ভাল ঘুমাতে পারেনি। শুয়ে থাকলেও বিছানায় শরীর টাল খায়। ঘুমিয়ে থাকলেও টাল খায়। আচ্ছা বিরম্বনা। সারারাত শরীরে ঝাকুনি গেছে—ঘুম হয়নি। সকালে চা খায়নি। চর্বিভাজা রুটিও খায়নি। এক রাতেই চোখ মুখ তার বসে গেছে।

নিচের বাংকে জাহির নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছিল—গোপাল উপরের বাংক থেকে ঝুঁকে দেখছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল, লাথি মেরে তুলে দেয়। এত ঝাকুনিতে ঘুম হয়! শুয়ে থাকতে অস্বস্তি বসে থাকতে অস্বস্তি—বড় বড় ঢেউ পোর্টহোলের কাছে আছড়ে পড়ছে। যেন জাহাজটার হাড় মুড়মুড়ির ব্যথা—ডাইনে বায়ে কেবল গড়াগড়ি খাচ্ছে। জাহিরও ডাইনে বায়ে গড়াগড়ি খাচ্ছিল। একবার যমুনাবাজুর দিকে, একবার গঙ্গাবাজুর দিকে—অথচ কি আরামে সে ঘুমাচ্ছে! রাতটা কোনোরকমে কেটেছে। তার একবারও মনে হয়নি পাটালি গুড়ের কথা। সকালে জাহির চা করে আনলে সে বলেছে, আমার খেতে ইচ্ছে করছে না। তুই খা।

তারা এক ফোকসালে থাকে বলে, চা চিনি টোবাকো রেশনে একসঙ্গে তোলে। খুব সকাল সকাল জাহিরের ওঠার অভ্যাস। সে বদনা নিয়ে বাথরুমে যায়। হাত মুখ ধুয়ে গ্যালি থেকে চা করে আনে। দু-কাপ চা। বিস্কুট বের করে ডাকে, গোপাল ওঠ। চা খাবি না!

বয়সের গাছ পাথর না থাকলেও জাহির একদণ্ড বসে থাকতে পারে না। কিছুটা কুঁজো হয়ে গেছে। শীর্ণকায়। অথচ কাজে এত পটু যে মনে হয় জাহিরের মতো লোকেরই দরকার জাহাজে। সে কাম-চোর নয়। কাজে ফাঁকি দেয় না। সে গোপালকে চা বানিয়ে দেয়, এমন কি গোপালের ময়লা জামা প্যান্ট ধুয়ে দেয়। গোপাল কেমন ঢিলেঢালা স্বভাবের। জাহির যেন বুঝিয়ে দেয়, তার ফোকসালে থাকতে হলে সাফসুতরো থাকতে হবে। পবিত্র থাকতে হবে। চা খেয়ে মাদুর বগলে নিয়ে সে উঠে গেছে। মেসরুমে বসে সকালের নামাজ পড়বে। সেই ফাঁকে গোপাল চা পোর্টহোল গলিয়ে ফেলে দিয়েছিল। কারণ সি-সিকনেসের শিকার সে—ধরা পড়তে চায় না।

আর গোপাল ডেকে বমি করে দিলে জানাজানি হয়ে গেল। আলতাফ ছুটে এসেছে। হাতে তার পাটালি গুড়। বাদশা মিঞা ছুটে এসেছে। ফলঞ্চা বেঁধে যারা মাস্তুলে রঙ করছিল তারাও নেমে এসেছে। কিন্তু গোপাল, সব তুচ্ছ করতে চায়। সে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। আলতাফ কেবল বলছে,

'ছেলে, পাটালি গুড় মুখে দে। বাপজান, বমি করে মরে যাবি। পেট খালি থাকলে বমি বেশি পায়। বমি বড় নচ্ছার ব্যামো। খেয়ে দ্যাখ। মুখে দে। জল খা। নুন-জল খা একটু। হাতের তালু নাকের কাছে রাখ।'

গোপাল এতটা বাড়াবাড়ি পছন্দ করছে না আলতাফ সারেঙের। সে কি বাচ্চা! সে কি ছেলেমানুষ! সে কি সারেঙের আর জন্মের কেউ! সারেঙের বাড়াবাড়িতে অনুরোধ রেখেছে। কারণ তার হাতের কাছে আর কোনো দাওয়াই নেই। পাটালি গুড় খাওয়ায় সে কিছুটা স্বস্তি বোধ করছে। সে হাঁটিতে থাকলে, সারেঙসাব বললেন, 'কাজকামে লেগে থাক। ধীরে সুস্থে সয়ে যাবে। সবারই হয়। ঘাবড়াবার কিচ্ছু নেই।'

এত কথা কে শোনে! কাজকামের সঙ্গে তার সম্পর্ক। তা মোড়লগিরি করার আর জায়গা পেলে না! সে সারেঙের বাড়াবাড়িতে ফরোয়ার্ড-ডেকে হেঁটে গেল। হেঁটে যাবার সময় কেন যে তার চোখ গেল পোর্টহোলে। যদি পোর্টহোলে ওজালিও দাঁড়িয়ে থাকে! যদি তাকে চুরি করে দেখে! ওজালিও মজা পেতেই পারে। বাপের সঙ্গে জাহাজে উঠে আসে। জাহাজ হোমে গেলে সে নেমে যায়। সি-সিকনেসে সে কাবু টের পেলে কাপ্তানের পুত্রটি মজা পেতে পারে। আশ্চর্য পোর্টহোলে কাপ্তানের পুত্রকে দেখতে পেল না। যা দেখল, তা আরও ভয়াবহ—সেই কালো রঙের অতিকায় কুকুরটা মুখ বার করে রেখেছে। যেন সে গেলেই মাথা চেটে দেবে। সে কিছুটা ঘাবড়ে গেছে দেখে জিভ বার করে কুকুরটা ঘেউ করে উঠল। ইচ্ছে হচ্ছিল টবের তেল কুকুরটার মুখে ছুঁড়ে মারে। কিন্তু সাহস নেই। কাপ্তানের পুত্র, আদরে আদরে যার মাথাটি গেছে, সে যে কি করতে পারে—ভেবেই ভাল ছেলের মতো কুকুরটা দেখে এক গাল হেসে দিল। কুকুরটার সঙ্গে তার যে কোনো শত্রুতা নেই হেসে বুঝিয়ে দিল। কুকুরটার নামও সে জানে। টমি। সে বলল, 'টমি গুড মর্নিং। কাজে যাচ্ছি। উইনচে কাজ। কথা বলার সময় নেই। পরে দেখা হবে।' পরে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে টমিকে স্যালুট করল। তারপর কিছুটা নুয়ে সে কেবিন পার হয়ে গেল। যেন নাগাল পেলে সত্যি কুকুরটা তার মাথা চেটে দেবে। নাগালের বাইরে আসতেই তার তেজ বেড়ে গেল—সে কুকুরটাকে গাল দিল—হারামির বাচ্চা।

কুকুরটা জাহাজে তার কাছে বড় অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতিমধ্যে দু-বার তাড়া খেয়েছে। বোট-ডেক থেকে কুকুরটা লাফিয়ে তাড়া করেছে তাকে। তাকে দেখলেই কেন যে ক্ষেপে যায়। কুকুরটা মাদি কুকুর। তারই

এত র‍্যালা। তা কাপ্তানের পুত্রটির কাজ কি না তাও জানে না। তিনিই লেলিয়ে দিতে পারেন। কুকুরটাকে জব্দ করার ফন্দি নানাভাবে মাথায় কাজ করছে ঠিক। তবে কোনো উপায় বের করতে পারছে না। দু-বারই তাড়া খেয়ে সে ছুটে গেছে পিছিলে—কোথা থেকে কি সংকেত পায় কে জানে।

জাহাজের পিছিলে উঠে গেলেই কুকুরটা ফিরে যায়। আবার লাফিয়ে উঠে যায় বোট-ডেকে। তারপর অদৃশ্য। দু দু-বার বেইজ্জত হওয়ায় সে যমুনাবাজু ধরে ফরোয়ার্ড-পিকে যাবার সময় খুবই সতর্ক থাকে। কেন যে কুকুরটাকে তার পেছনে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে! ওজালিওর সঙ্গে সে কোনো খারাপ ব্যবহারও করেনি। তার সঙ্গে কথাও হয়নি। কথা বলার তার এক্তিয়ারও নেই, অথচ জাহাজে ওঠার পর কার এমন পাকা ধানে মই দিয়েছে যে তার প্রতি এমন অসাধু আচরণ করতে সাহস পাচ্ছে। অবশ্য ওজালিওর বাথরুমে সে সোনালি গাউন দেখে ফেলে ঠিক করেনি। ওজালিও ধরা পড়ে গেছে ভাবতে পারে। ওজালিও তাকে 'হেল' বলেছে। 'হেল' মানে নরক।

আরে আমার কি দোষ! গোপাল নিজের হয়ে কথা বলছে। আমি নরক হতে যাব কেন? আমি কি মেয়ে নিয়ে কেবিনে ফূর্তি ফার্তা করি! পেলে কি করব! বাথরুমে গাউন পড়ে থাকতে পারে আর আমি হাতে নিয়ে অবাক হতে পারব না! বাথরুমে মেয়েদের পোষাক আসে কি করে! মালের জাহাজ এটা বোঝ না!

সে উইনচের পাশে গিয়ে গোমড়া মুখে দাঁড়াল। পেটে কিছু পড়ায় অস্বস্তি কম। ফাইভার টব থেকে নুয়ে হাঁতুড়ি নিল। চিজেল নিল। সব নাট বোল্ট জাম হয়ে আছে। কেটে বের না করলে চলবে না। হাতুড়ির ঘায়ে হয় উড়িয়ে দিতে হবে, নয় স্প্যানারে পাইপ ঢুকিয়ে টেনে দেখতে হবে প্যাচ ছাড়ে কি না।

গোপাল তেল জুট দিয়ে নাট বোল্ট, স্ট্র্যাপার সাফ করছিল। অন্যমনস্ক। এমন সুন্দর ছেলেটির কেন এত দুর্মতি সে বুঝতে পারছে না। কেন এই ভ্যাবিচার বুঝতে পারে না। বালকই বলা চলে। কাপ্তানের কোনো শাসন নেই। ওজালিও সম্পর্কে সবাই শুধু আতঙ্কের কথা বলে। তার নাকি সাত খুন মাপ। সে কিছুটা সংকোচের সঙ্গেই বলল, 'ফাইবার একটা কথা বলব?'

'কি কথা।' ফাইবার মুখ তুলছে না। গল্প করতে দেখলে মাইজলা মিস্ত্রি তেড়ে আসতে পারে। সে যেন কাজ করছে এমন ভঙ্গী রেখেই বলল, 'বল। শুনলাম বমি করছ। কিছু খেতে পারছ না!'

'কে বলল?'

গোপাল কিছুটা তাজ্জব। তারা কে কেমন থাকে ভিন্ন গ্রহে সহজে পৌঁছায় না। মারদাঙ্গা না হলে কেউ নালিশও দেয় না। জাহাজের শেষ প্রান্তে প্রপেলারের মাথায় তাদের গুটিকয় ফোকসাল। যমুনাবাজুতে থাকে ইনজিন জাহাজিরা, গঙ্গাবাজুতে থাকে ডেকজাহাজিরা। ফাইবার থাকে ভিন্ন গ্রহে। সেও জেনেছ, গোপাল অসুস্থ। অবশ্য জাহাজে প্রথম প্রথম সবারই অসুখটা হয়। অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে বাঙ্কে পড়েও থাকা যায় না। কাজকামের মধ্যে থাকতে থাকতে একসময় সব স্বাভাবিক হয়ে যায়। খবরটা চাউর হয়ে গেছে।

সে বলল, 'কি ঝামেলা বলত ? কিছু খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না।'

'ও কিছু না। ভাববে না। জাহাজের পিচিং সহ্য হয়ে গেলে খেতে পারবে।

॥ চার ॥

গোপাল দেখল সমুদ্র শুধু নীল হয়ে আছে। তরঙ্গমালায় ভেসে যাচ্ছে সমুদ্র। জাহাজের মাস্তুলে নিশান উড়ছে। ব্রীজের কাচের ভিতর দূরে কোয়ার্টার মাস্টার আফজল। ঠিক আফজল না লতিফ বুঝতে পারছে না। চার নম্বর ফল্কার উইনচে তার কাজ। ডেরিক রঙ লাগাচ্ছে ডেকজাহাজিরা। অন্য সময় হলে রঙ গালে মুখে লাগিয়ে ঠাট্টা তামাসা হত। কিন্তু ব্রিজ থেকে সব দেখা যায় বলে, সবারই যেন কাজে খুব মনোযোগ। লতিফ হতে পারে স্টিয়ারিঙের সামনে, আফজলও হতে পারে। দু'জনের চেহারায় বড় সাদৃশ্য আছে। দু'জনই উঁচু লম্বা। দু'জনেরই লম্বা দাড়ি। এক মাথা কাচা পাকা চুল। পায়ে কেডস জুতা, নীল জামা নীল প্যান্ট। মাথায় নীল টুপি। আফজলই হোক লতিফই হোক তাতে তার কিছু আসে যায় না। কিন্তু পাশে সাদা প্যান্ট সাদা জামা গায়ে মাথায় অ্যাংকারের টুপি নিয়ে যিনি ওয়াচ দিচ্ছেন তিনি যে জাহাজের চিফ অফিসার বুঝতে কষ্ট হল না। তার পাশে কে দাঁড়িয়ে ! ওজালিও ! কি দেখছে ! তাকে ! তাকে দেখার কি আছে এত সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না।

গোপালের মনে হয় ওজালিও তার গতিবিধির নজর রাখছে। ব্রীজের সামনে বিশাল কাচের ভারি পর্দা। তার ভিতর ওজালিওকে আবছা দেখা যাচ্ছে। গায়ে ধবধবে সাদা বয়লার সুট।

হাতে তার চিপিং করার হাতুড়ি থাকে। পকেটেও রেখে দেয়। ইচ্ছে

করলে যে কোনো জায়গায় সে উবু হয়ে বসে যেতে পারে। চিপিং করতে পারে। নুয়ে নিবিষ্ট মনে চিপিং করার সময় কুকুরটা তার পাশে বসে থাকে। বুড়ো কাপ্তানবয় কফি না হয় চা রেখে যায়। মাঝে মাঝে সে দেখতে পায় তার ঠিক যাবার রাস্তায় সে হঠাৎ হঠাৎ বসে পড়ে। চিপিং করতে থাকে। কখনও চিমনির গোড়ায়, কখনও কোনো উইণ্ডসহোলের নিচে। যেন রাস্তা জুড়ে বসে থাকা। তাকে এড়িয়ে যাবার জন্য গোপাল, ফল্কা পার হয়ে গঙ্গাবাজু ধরে হাঁটে। ফেরার সময় দেখতে পায়, ঠিক তার রাস্তায় ফের বসে পড়েছে। কি যে জ্বালা! তাকে এড়িয়ে যাবার রাস্তা খুঁজতে গিয়ে সিঁড়িতে উঠে যায়। বোট-ডেক ধরে দড়িতে ঝুলে দু নম্বর ফল্কায় লাফিয়ে পড়ে। তখনই বোধ হয় রেগে গিয়ে কুকুরটাকে লেলিয়ে দেয়।

ফাইবার উইনচের ভিতর মাথা গলিয়ে দিচ্ছে। উইনচ ঠিক না থাকলে ডেরিকে মাল তোলা যায় না। এমনিতেই ভাঙ্গা ঝরঝরে জাহাজ। ঝুর ঝুর করে হাত দিলেই খসে পড়ছে। রঙ বার্নিশ উঠে যাচ্ছে। জাহাজটায় কাজের শেষ নেই। এত কাজের চাপ, মাথা ঠিক রাখা এমনিতেই কঠিন। তার উপর সি-সিকনেসের শিকার। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো কুকুরটার আতঙ্ক। সে যে কি করবে!

'গোপাল ছোট হাতুড়িটা দাও।' ফাইভার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। টব থেকে গোপাল হাতুড়িটা তুলে উইনচের ভিতর এগিয়ে দেবার সময় বলল, 'কাপ্তানের পুত্রটি আমার পেছনে লেগেছে কেন বল তো!'

'তোমার পেছেনে?' ফাইভার কিছুটা যেন বিস্মিত।

'হ্যাঁ আমাকে কেবল তাড়া করছে। কুকুর লেলিয়ে দিচ্ছে।'

'কুকুরটাতো খুব ভদ্র। তুমি কি কুকুর দেখলে ছুটে পালাও? পালালে তো তাড়া করবেই।'

'ভয় করে না। আমার কলার কামড়ে ধরেছিল, জান?'

'কবে! এত কাণ্ড হয়ে গেছে। কুকুরটা কি তোমাকে শত্রু ভেবে নিয়েছে কুকুরটাকে আদর করতে পার না।'

'আদর করলে আমাকে তাড়া করবে না বলছ?'

'করে। কখনও করে। আদর করে দেখ না!'

'ওরে বাপস! দেখলেই আমার ভয় লাগে। যদি কামড়ে দেয়।'

'কামড়াবে না। কাপ্তানের পুত্রটির দুষ্টুমিতে দেখছি খুব ঘাবড়ে গেছ। ভয় পেলে তো তাড়া করবেই। জাহাজ কি একঘেয়ে বোঝ না। কত একা যে

বোঝ না ! তার তো সঙ্গীর দরকার। কার পিছনে লাগবে ! লাগারও তো লোক চাই। সব তা জাহাজে বুড়োহাবড়া। তাদের পেছনে লাগলে মজা কোথায় বোঝ না।'

কেন যে মনে হল, সে ওজালিওকে যতটা খারাপ ভাবছে, ঠিক ততটা বোধ হয় খারাপ নয়। ভাব করলে হয়তো কুকুরটাকে আর লেলিয়ে দেবে না। ওজালিওর সোনালি চুল, নীল চোখ এবং আশ্চর্য মায়াবী মুখ। চোখ দুটো এত বড় যে গল্পের কোনো রাজপুত্র যেন। আবার মাঝে মাঝে সে দেখতে পায় ওজালিও কেমন বালিকা হয়ে যাচ্ছে। চোখে তার যেন বালিকাসুলভ চাউনি। চোখে চোখ পড়ে গেলে লজ্জা পায় কেন সে বোঝে না।

'আচ্ছ ফাইভার, মাকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হয় না ?'

'জিজ্ঞেস করে দেখ ? তুমি তো ইংরাজি ভালোই বোঝ। বলতেও পার। অসুবিধা কোথায় তোমার।'

'যাঃ ! আমি বলতে পারি ! জাহাজে কোলবয়ের কাজটা তো ভাল না। কুলি কামিনের কাজ—আমাকে জব্দ করে তার কি লাভ বুঝি না। কবে বাংকারে কয়লা ঠেলতে পাঠিয়ে দেয় দেখ। আমাকে পাত্তা দেবে কেন ? তুমি আমার হয়ে বল না, কুকুরটাকে যেন লেলিয়ে না দেয়।'

'ঠিক আছে বলে দেব।'

তারপরেই মনে হল, এটা কি নালিশের পর্যায়ে পড়ে। ওজালিওর বিরুদ্ধে নালিশ ! এত সাহস ! গোপাল কেমন কিছুটা গোলমালে পড়ে গেল। বলা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারল না। সে বলল, 'থাক তোমাকে কিছু বলতে হবে না। ওজালিও রাগ করতে পারে ?'

'ওজালিও কে ? ও তো ববি। ওজালিও বলছ কেন ?'

'কারপেন্টার যে সেদিন বলল, ওজালিও গুড মর্নিং। ওজালিও পাখিগুলির খাবার দিচ্ছিল। চিয়াং সঙ্গে। আমি স্পষ্ট শুনেছি।'

'তুমি ভুল শুনেছ গোপাল। পাইপ লাগাও। টান মার। আরো জোরে। হচ্ছে না। যা ফসকে গেল। আরে তড়বড় করছ কেন ! দাঁড়াও। নাটের মাথা ফসকে যাচ্ছে বুঝতে পারছ না !'

গোপাল কোমরে পাইপ রেখে ঠেলে দিতে গিয়ে পড়ে গেল। স্প্যানার পাইপ থেকে খুলে ছিটকে গেছে। সে কিছুটা চোট পেল। ফাইভার উইনচের তলা থেকে উঠে এসে বলল, 'লাগেনি তো দেখি !'

গোপাল জামা-প্যান্ট ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'লাগেনি।'

ফাইভার বলল, 'অত তড়বড় করলে চলে। কৈ দেখি।'

গোপাল কিছুতেই দেখাল না। তা তার ছালচামড়া উঠে যেতে পারে—কারণ জ্বালা করছে হাঁটুর কাছে—তবু সে কেন যে মরিয়া হয়ে বলল, 'আমি স্পষ্ট শুনলাম।'

'শুনেছ, বেশ করেছ। নামে কিছু আসে যায় না। তুমি ওজালিও ডাকতে পারে, ডার্লিং ডাকতে পার। যা চোখমুখ পুত্রটির আদর করতে কার না ইচ্ছে হয়।' তারপর গোপালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমিও কম যাও না। খুব সাবধান।'

সে স্পষ্ট শুনল, ওজালিও।

না কি নিজের কাছেই এমন একটা নাম স্মৃতির ভিতর সঞ্চিত ছিল। সে নিজেই ভেবেছে। চিয়াং-এর হিন্দি ইংরাজি উচ্চারণ বোঝাও কঠিন। বাংলা ভাঙা ভাঙা উচ্চারণ। চন্দ্রবিন্দুর উপসর্গ বড় বেশি। দেখা হলেই গোঁপাল দাঁদা, গোঁপাল দাঁদা। ওজালিও কি কোনো যাদুকরের পুত্র, সে কি সেই গল্প থেকে নামটা নিয়েছে—বৃষ্টি নেই, খরা-রোদে গাছপালা শুকিয়ে যাচ্ছে। পাতা ঝরে পড়ছে, ফুল ফুটছে না, শস্য জন্মাচ্ছে না—পাখিরা উড়ে গেছে—জীবজন্তু সব বন থেকে পালাচ্ছে—কোথা থেকে উদয় সেই যাদুকর—সে হেঁটে যাচ্ছে, আর গাছে গাছে ফুল ফুটছে, পাখিরা ফিরে আসতে শুরু করেছে। ছিল উষড় উপত্যকা, হয়ে গেল সবুজ বনভূমি। যাদুকর আর তার পুত্র হেঁটে যায়, পাখিরা ওড়াউড়ি করে আকাশে—দূর দেশ থেকে আসে প্রজাপতিরা—ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতির ছায়ায় তাঁরা হাটে।

যাদুকরের নাম ওজালিও ? কিংবা তার পুত্রের নাম। আসালে গোপাল কেন যে ভাবল, কাপ্তানের পুত্রকে ওজালিও ছাড়া অন্য কোনো নামেই মানায় না। সে যদি কোনোদিন কথা বলার সুযোগ পায়, তবে বলবে, আপনি ওজালিও, কাপ্তানের পুত্র, আমি গোপাল, একজন দর্জির পুত্র। আপনার বাবা জাহাজ চালায়। রাত নেই, দিন নেই জাহাজটা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কম্পাসের কাঁটা, অঙ্কের হিসাব, অক্ষাংশ দ্রাঘিমায় সব যে হয় না দেখতে পাচ্ছি। কত বড় সমুদ্র, দিক নির্ণয় অথবা ঠিক ঠিক ঘাটে নিয়ে যাওয়া কি চাট্টিখানি কথা ! আমার কাছে তিনি যাদুকর—এক সকালে আমরা বন্দর পেয়ে যাব। নিশ্চিন্তে জাহাজঘাটায় নেমে যাব। সবই তো তাঁর কল্যাণে। এই যে ঝোড়ো হাওয়া বইছে, তালগাছ প্রমাণ ঢেউ জাহাজটার চারপাশে আছড়ে পড়ছে—জাহাজের দুর্নামের তো শেষ নেই, ইচ্ছে করলেই সমুদ্রে হারিয়ে যেতে

পারে, ডুবে যেতে পারে, অদৃশ্য হয়ে থাকতে পারে—কেন পারছে না, আপনার বিচক্ষণ পিতা কেনি রজার্স আছেন বলে।

এভাবে কথা বললে ওজালিও নিশ্চয়ই খুশি হবে। তোষামোদে কে না খুশি হয়! তোষামোদ করার আর কি কি প্রক্রিয়া থাকতে পারে সে নিয়েও গোপাল গবেষণা করল। গুড মর্নিং ওজালিও, বলবে? না গুড মর্নিং ববি রজার্স বলবে। ওজালিও বললে সাড়া দিতে নাও পারে। যা খুশি ডাকলে ক্ষেপে যাবারই কথা। তাকেই যদি কেউ গোপাল না বলে অবিনাশ বলে, সে কি খুশি হবে! কখনও না। বরং মনে করবে তার নাম নিয়ে ছেলেখেলা হচ্ছে।

ফাইভাইরের কথাই ঠিক। ভাব কর। দেখবে আর কুকুর লেলিয়ে দিচ্ছে না। সে একদিন কেবিনের পাশ দিয়ে যাবার সময় শুনতে পেল আশ্চর্য মিউজিক বাজছে। পোর্ট-হোল বন্ধ। পোর্ট-হোলে উঁকি দেওয়া অসভ্যতা। ওজালিও পছন্দ নাও করতে পারে। লতাপাতা আঁকা পর্দা ফেলা। সে শুনল মিউজিকের সঙ্গে গান—গানের কলি, উই আর সো ইয়ং—এইটুকই বুঝতে পারছে।

উহ্ আর সো ইয়াং—কেমন শিরশির করে উঠল তার শরীর। জাহাজে উঠলে কি সবাই যৌন বিকৃতিতে আক্রান্ত হয়! সে তো খারাপ ছেলে নয়। সমকামিতা জাহাজে জলচল। অনেকেই তার শিকার হয়ে পড়ে। একঘেয়ে সমুদ্রযাত্রা, ঝড় টাইফুন, নয়তো নিরিবিলি সমুদ্র, কোনো বৈচিত্র্য নেই—দিনের পর দিন কাহাতক সমুদ্র দেখে দিন কাটানো যায়—সূর্য ওঠে, অস্ত যায়—জ্যোৎস্না রাতে ফল্কায় মাদুর পেতে শুয়ে থাকতেও খারাপ লাগে না, বেশ দুলে দুলে জাহাজ চলে, যে যার মতো অবকাশ যাপন করে। কেউ জাল বোনে ফোকসালে বসে, কেউ কোরাণ শরিফ পাঠ করে—গোল হয়ে বসে থাকে প্রাচীন নাবিকেরা। আল্লা এবং পয়গম্বরের বাণী শুনতে শুনতে চোখের জল ফেলে। বুড়ো জাহাজিরা ধর্মালাপে মত্ত থাকতেই পারে।

জোয়ান জাহাজিরা তাস নিয়ে বসে। কেউ বাংকে শুয়ে উলঙ্গ নারীর অ্যালবাম দেখে উত্তেজিত হয়। কারো লাইটারে একজন নর্তকি থাকে। লাইটার জ্বালালেই উলঙ্গ নর্তকি হাত তুলে, পা তুলে ঘুরে ঘুরে নাচে। গোপাল এতে বেশ মজা পায়।

বিকাশ তার পাশে বসে একদিন লাইটার জ্বালিয়ে যাদু দেখাল। লাইটারের আগুন বাতাসে যত বেশি কাঁপে, কাচের ভিতর নারী তত উদ্দাম হয়ে ওঠে। আসলে আগুনের প্রতিবিম্ব থেকেই নারী-রহস্য। কিন্তু তার কিছুই ভাল লাগে

না। রশিদ মিঞার দূরবীন নিয়েও নানা গুজব।

কলম্বোর ঘাটে জাহাজ ভিড়ল। সাঁজবেলায় ভিড়ল, সকাল না হতেই রসদ তুলে আবার জাহাজ ছেড়ে দেবে। সারাটা রাত তারা রেলিংয়ে বসে না হয় দাঁড়িয়ে। কেউ কিছু যদি আবিষ্কার করতে পারে। জাহাজে আবিষ্কার কি—কিসের আশায় রাতজাগা কিংবা কোনো সুদূরের খবর যদি আসে—খবরটাই বা কি জানতে কারো অসুবিধা হয় না। দূরে শহর, রাস্তা, বাড়িঘর এবং লোক চলাচলের আবছা দৃশ্য থেকে কোনো নারী আবিষ্কারের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে তারা। কখনও কখনও চোখের উপর অলীক নারীর ছবি ভেসে উঠবে বেশি কি। নারী নেই, শুধু পুরুষ থাকলে কি হয় জাহাজে উঠলে টের পাওয়া যায়। কেমন বিষাদে আক্রান্ত হতে হয়। গোপাল মনমরা—সে বাংকে চুপচাপ শুয়ে আছে। তার কিছু ভাল লাগছে না। রশিদের ফোকসালে খুব ধস্তাধস্তি হয়েছে। দূরবীনটা কব্জা করার চেষ্টা। রশিদের এক কথা, নেই। ঝামেলা পাকাবে না।

বাদশা মিঞা উঁকি দিয়ে দেখল, গোপাল শুয়ে আছে। গোপালের মেজাজ ঠিক নেই। কেন ঠিক নেই বুঝছে না। তা জাহাজ তো ভাল জায়গা নয়। কিনার আরও খারাপ জায়গা। কাপ্তানের পুত্রটির নজর পড়েছে—গোপালকে জব্দ করার সুযোগ খুঁজছে, কি যে হবে! গোপালের উচিত সারেঙকে সব খুলে বলা। সারেঙ অবশ্য বলেছে, মাথা খারাপ আছে। বাপের সঙ্গেই ঘোরে। সব তো উড়ো খবর। যে যেমন শোনে—কে কোথাকার, কার কি আছে দেশে কেউ বলতে পারে না। ছেলেটা কি কোনো ঘোরে পড়ে যায়—মাঝে মাঝে বাড়ি থেকে পলাতক। কাপ্তানের এটাই শেষ সফর। কিনারায় রেখে, দুশ্চিন্তা সার। মা না থাকলে এমনই যেন হওয়ার কথা। তা গোপাল, তুই ভাবিস না, আমরা তো আছি!

'গোপাল ঘুমালি!'

গোপাল উঠে বসল।

'তোর মন খারাপ! শুয়ে আছিস! সবাই উপরে, তুই শুয়ে আছিস। কিনার দেখবি না। তিন নম্বর সাব তো খোঁজাখুঁজি করছিলেন।'

তিন নম্বর সাব মানে, থার্ড অফিসার। মানুষটি তাকে খোঁজাখুঁজি করলে নিশ্চয়ই হাসাহাসি হয়েছে। গোপালকে সে বাবা ডাকে। জাহাজিরা মজা পেলেই হল। যা হয় কিছু—উপভোগ করার মতো এটা একটা ঘটনা। সে বলল, 'এখানে নিয়ে এলে না কেন?'

'জাহাজ বাঁধাছাঁদা করছে, আসে কি করে ?' তারপরেই বলেছিল, 'আমার খতটা লিখে দে গোপাল। বিবির মন আনচান করবে। কবে দেশ ছাইড়া আইছি, খত নাই কোনো। তুই জম্পেস কইরা লিখবি ক্যামন।' বলে বাদশা একটা খাম এগিয়ে দিল। তারপর হাঁটুগেড়ে বাংকের নিচে বসে গেল। দরজা বন্ধ করে বলল, 'গোপাল, লেখ—জাহাজ ব্যুনাসাইরিস যাচ্ছে। কেপটাউনে মাল খালাস হবে। তা এজেন্ট অফিসের ঠিকানা তর কাছে আছে, না সারেঙসাবের কাছ থেকে চেয়ে আনব'।

গোপাল বলল, 'আছে। আনতে হবে না।'

'লেখ গোপাল, আমার জন্য যেন চিন্তা না করে। খত পেলেই যেন আমার জবাব দেয়। জ্যোত-জমির কথা লেখ। সাতনড়ি হার দেব বলেছি, সফর শেষে ফিরা দিমু। লেখ, বিবি তুই আমার কলিজা।'

গোপাল চেয়ে আছে। একটা অক্ষরও লিখছে না।

'অ গোপাল ল্যাখ। বসে আছিস কেন ?'

'কাকে লিখবে বলবে তো ?'

'ছোট বিবিকে। শোন কাউরে কইস না।'

'কি কমু।'

'আরে আমার ছোট বিবিরে তুই দেখস নাইরে—মন-কাড়া সুন্দরীরে। তারে রাইখা আইছি। বইলা আইছি ফিরা গিয়াই সাতনড়ি হার বানাইয়া দিমু। কান্দিস না। কান্দলে মন মানে নারে গোপাল !' গোপাল লিখল, স্নেহের ছোটবিবি।

তারপর গোপাল বলল, 'লিখলাম, স্নেহের ছোটবিবি। এবারে বল ! মন খুব কান্দে লিখলাম। হল। তারপর।'

বাদশা বলল, 'তারপর ল্যাখ, ঝগড়াঝাটি য্যান না করে। আল্লা ভরসা ল্যাখ। অর বাপজানের তবিয়ত কেমন আছে ল্যাখ। তাঁরে ল্যাখ—পাক জনাবেষু, আপনার কথা মোতাবেক কাম হইব। পশ্চিমপাড়ার আরও দুই কানি জমিন আপনের কন্যার নামে লিখা দিমু।'

গোপাল লেখা বন্ধ করে দিল। চিঠির কোনো মাথামুণ্ডু নেই। লিখছে ছোটবিবিকে চিঠি—কোথা থেকে এসে ছোটবিবির বাপজান এসে হাজির। সে বলল, 'বাদশা কাকে চিঠি লিখছিস ?'

বাদশা কেমন গুম মেরে গেল। বলল, 'তুই কি বুঝলি তবে ! কারে চিঠি লিখতাছি—কতবার কমু ?'

'ছোটবিবির চিঠিতে তার বাপজান আসবে কেন। বাপজানকে আলাদা চিঠি লিখবি তো। পাক জনাবেষু বলছিস!'

বাদশা জিভে কামড় দিল। বলল, 'ভুল হয়ে গেছে গোপাল।'

গোপাল যে কত বড়, কত বুদ্ধিমান, ভুল ধরিয়ে দিলে এটা বড় বেশি টের পায় বাদশা। লেখাপড়া জানে বলেই মাথা পরিষ্কার গোপালের। তোয়াজ করার সময় খেয়ালই থাকে না, সে ওপরয়ালা, না গোপাল ওপরয়ালা—গোপাল তুই তুকারি করলে আজকাল সে খুশি হয়—যেন গোপাল তার কত আপনারজন সবাই দেখুক।

'তা গোপাল তুই গুছিয়ে লেখ। আমার মহব্বতের কথা খত পড়ে যেন বিবি টের পায়। বুঝলি।'

'বোঝলাম। আর কি লিখতে হবে ছোটবিবিকে—বল?'

'আমার আশায় য্যান পুকুরপাড়ে আইসা দাঁড়াইয়া না থাকে।'

'পুকুর পাড়ে দাঁড়াবে কেন?'

'আরে মন মানে! রাইতে ঘুম হয় না তার। নিজেরে দিয়া বোঝস না। শুইয়া আছস ক্যান। সামনে কিনার—অথচ নামার অনুমতি নাই। নাই থাকতে পারে। উপরে উইঠ্যা গ্যালি না ক্যান। কার লাইগা ব্যাজার মুখ। ক' দিহি।'

'বকর বকর করবি না। আর কি লেখার আছে বল? ছোটবিবি তর জানের কলিজা লিখেছি। তোর মহব্বতের কথাও লেখা হয়ে গেছে। পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে থাকবি না—লিখেছি। তারপর বল।

'লেখ কেপটাউনে বিবির খত না পাইলে খুবই চিন্তায় থাকব বাদশা।'

গোপাল তার মতো লিখল। লিখল, কেপটাউনে আমরা যাচ্ছি। বিশ-বাইশ দিন লাগবে। ছোটবিবি আশা করি আপনার চিঠি কেপটাউনে পাব। চিঠি দিতে যেন অন্যথা না হয়। সফরে বের হয়েছি—যা কিছু মনোরম সবই আপনার জন্য সংগ্রহ করে নিচ্ছি। সাতসমুদ্রের জলও নেব। তারপর গোপাল চিঠিখানা পড়ে শোনালে বাদশা অভিভূত। খাম ভাঁজ করে ঠিকানা লিখে দিলে বাদশা বলল, 'গোপাল একটা কথা।'

'কি কথা।'

'আমায় বিবিরে নিয়া য্যান দু-কান না হয়?'

'হবে না। তোর ছোটবিবির বয়েস কত।'

বাদশা বলল, 'তোর বয়সী।'

॥ পাঁচ ॥

কলম্বো বন্দর ছাড়ার পরই জাহাজ ভারি দুর্যোগে পড়ে গেল। আকাশ মেঘলা। ঝড়ো হাওয়া—বৃষ্টিপাত এবং ঘূর্ণিঝড় মাঝে মাঝে। জাহাজ প্রচণ্ড ওঠানামা করতে থাকল। দড়িদড়া ছিঁড়ে যাচ্ছে। ঢেউ-এর ঝাপটায় জাহাজের ছালচামড়া উঠে যাবার যোগাড়। ইনজিন-রুমে মার-মার কাট-কাট চলছে। স্টিম ঠিক রাখা যাচ্ছে না। প্রপেলার পাক খেতে খেতে কেমন দম হারিয়ে ফেলেছে। জাহাজটা মাতালের মতো টলতে টলতে এগুচ্ছে। মাস্তুলের ক্রোজনেস্ট উড়ে গেছে ঝড়ের দাপটে। কাপ্তান বিপদসংকেত পাঠিয়ে দিচ্ছেন—ডেকে হিবিংলাইন বেঁধে দেওয়া হয়েছে। উপরে উঠলে হিবিংলাইনের সাহায্য নিতে হচ্ছে।

উপরের কাজকর্ম প্রায় বন্ধ। ঢেউ-এর ঝাপটায় ডেক ভেসে যাচ্ছে। টানেল-পথ খুলে দেওয়া হয়েছে। ফোকসাল থেকে সোজা সিঁড়ি ধরে নেমে গেলে চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট গভীরে প্রপেলোর শ্যাফট। শ্যাফটের গা ঘেষে সরু এক গর্ভগৃহ চলে গেছে।

আলতাফ লাফিয়ে নেমে যাচ্ছন টানেল পথে—জাহাজ কাত হয়ে যাচ্ছে—গেল বুঝি সব। জাহাজের প্রচণ্ড গড়াগড়িতে গ্যালির হাঁড়ি-কড়াই ছিটকে পড়ছে। ওদিকে স্টোকহোলডে ধস্তাধস্তি চলছে। বড় টিণ্ডালের ওয়াচ। সে ছুটে এসে খবর দিয়েছে—বাহার পড়ে গেছে। ইনজিন-রুমে মার-মার কাট-কাট চলছে।

ফোকসালে ফোকসালে একই খবর, বাহার পড়ে গেছে। তাকে তুলে আনা, তারপর ওয়াচে কে যাবে—সারেঙ হাজির ফের। সবাই তটস্থ। এখন কে নামবে নিচে—কারণ বাহারের 'পরি' কাউকে দিতেই হবে। ঝড়ের তাণ্ডব কখন কমবে, কে জানে! গোপাল না হয় জাহিরকে এখন নিচে যেতে হবে। সারেঙ সাব ফোকসালে উঁকি দিলেন। গোপালকে দেখলেন, যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। বলল, 'আমি যাচ্ছি চাচা।' সারেঙ সাব তাকে বারণ করলেন। 'পারবি না। জাহির মিঞা তুমি যাও। সুট খালি হয়ে গেছে। বড় টিণ্ডাল সুটে কয়লা ফেলছে। ওকে গিয়ে নিচে পাঠিয়ে দাও।'

'আমি যাচ্ছি। জাহির থাকুক।' গোপাল ফের বলল।

আমি পারব না, জাহির পারবে! গোপাল যথেষ্ট উত্তেজিত। সারেঙসাব ভেবেছেন কি! সে কি ননির পুতুল। অন্য জাহাজিরাই বা কি ভাববে! জাহির

একটা টিকটিকির মতো রোগা লোক, সে পারবে, হয়। গোপাল কিছুটা গোয়ার্তুমি করে ফেলল। কারণ সারেঙ না বললে সে নিচে নামতে পারে না। জাহাজে আটজন কোল-বয়। দুজন করে ওয়াচে থাকে। পোর্ট-সাইডের বাংকারের দায়িত্ব বাহারের। চারঘন্টা অবিরাম গাড়ি ঠেলে সুটে কয়লা ফেলার কাজ। ঝড়ের তাণ্ডব বাহার সহ্য করতে পারেনি। বাহারের মতো যোয়ান কয়লায়ালা ঝড়ের ধকল সহ্য করতে পারেনি—তা ছাড়া কয়লার জাহাজে বাহার আরও সফর করেছে। সে অভিজ্ঞ জাহাজি—সেই পড়ে গেল আর তার কপালে আরও বড় দুর্ভোগ জুটতে পারে। এ সব জেনেও, কেমন যেন আত্মমর্যাদার খাতিরেই সে গোয়ার্তুমি করে ফেলল। সারেঙের নির্দেশ উপেক্ষা করে জাহিরকে বলল, 'তুমি থাক চাচা, আমি যাচ্ছি।'

জাহির কেমন ইতস্তত করছে। সে বলছে, 'সারেঙসাব গোঁসা করতে পারেন।'

'একটু গোঁসা করুক। দুটো ভাত বেশি খাক।' সে কাজের পোশাক পরে বের হবার মুখে দেখল, সারেঙসাব সামনে দাঁড়িয়ে। তিনি বললেন, 'পারবি তো! না আবার বাহারের মতো নাটক করতে যাচ্ছিস?' সারেঙসাবের কথায় গোপালের গায়ে কেমন জ্বালা ধরে গেল। সে নাটক করতে যাচ্ছে! সে তো জাহাজের হাল হকিকত জেনেই উঠেছে। সে পারবে না, যেন সারেঙসাব ধরেই নিয়েছেন। কিন্তু সে দেখল, সারেঙ তার সঙ্গে নেমে আসছেন। সে তাঁর নির্দেশ আমন্য করছে বলে এতটুকু বিরক্ত নন। বরং খুশি। নামতে নামতে বলছেন, কাজ কাম শিখে রাখা ভাল। সব জাহাজে আমাকে পাবি কোথায়। কাজ কামে ভয় পেলে জাহাজি হওয়া চলে না। বাহারটা জাহাজির ইজ্জত ডোবাল।

সে বাংকারে ঢুকে দেখল, সুট একেবারে খালি। নিচে তিনজন আগয়ালা পাগলের মতো ফার্নেসে বেলচায় কয়লা মেরে যাচ্ছে। তবু স্টিম ঠিক রাখা যাচ্ছে না। স্টিম নেমে গেলে জাহাজ ডুবতে কতক্ষণ? বড় টিণ্ডাল অপলক স্টিম গ্যাজ দেখছেন। স্টিম ঠিকঠাক রাখা দুর্যোগের সময় বড় বেশি দরকার।

গোপাল বেলচা নিয়ে এগিয়ে গেল। গাড়ি উল্টে আছে। গাড়িটা টেনে সোজা করে কয়লার পাহাড়ের কাছে নিয়ে গেল। রাত কটা বাজে সে জানে না। তবে বড় টিণ্ডালের ওয়াচ আটটা-বারোটা। রাত বেশ হয়েছে সে বুঝল। লম্ফটা তুলে নিয়ে গেল ভেতরের দিকে। অন্ধকারে ইনজিনের ঝমঝম আওয়াজ আর সমুদ্রের তীব্র গর্জন কানে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

ঝড়ের দরিয়ায় শুয়ে থাকা, বসে থাকা সমান। সে দাঁড়াতে পারছে না। টলছে। সামনে পিছনে টলছে। বেসামাল হলে গড়িয়ে পড়বে। হাত-পা ভাঙবে। বাহারকে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বিকাশদা, মনির দুজনেই ছুটে এসেছিল, কাপ্তান চিফ-ইঞ্জিনিয়ার সবাই। সারেঙসাবই তাকে খবর দিলেন।—বাহার মানে বাহারুদ্দিন পড়ে গেলে বাড়িয়ালা, বড়সাব পর্যন্ত মাথা ঠিক রাখতে পারেনি—বাংকারে ঢুকে চিল্লাচিল্লি করেছেন। সারেঙ কেন বাংকারে! স্টোকহোলড ফেলে চলে আসা কেন—অথচ তিনিই কেন যে ফের ঢুকে গেলেন বাংকারে। স্টোকহোলড ফেলে এ-সময় তো বাংকারে ঢোকা ঠিক না। সে দেখল তিনি গাড়িটা ঠেলে দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

গোপাল ক্ষেপে গিয়ে বলল, 'চললাম। ফেলেন কতো কয়লা ফেলতে পারেন। আপনি কি ভাবেন বলুন তো!

সারেঙ পড়ে গেল মহাফাঁপড়ে। গোপালের উপর নির্ভর করতে পারছেন না। নিজে ছুটে এসেছেন। কোম্পানির কাজ নিয়ে কথা। জাহাজে ঠিক স্টিম না উঠলে তাঁর সুনাম নষ্ট। এ-সব ভেবেই আলতাফ গোপালের পেছনে পেছনে বাংকারে ঢুকে গেছিলেন। নিরিবিলি অন্ধকারে গোপাল সারেঙসাবকে দেখে ক্ষেপে গেছে। সে 'যাচ্ছি' বলে সত্যি সিঁড়িতে উঠে গেল।

আলতাফ ছুটে গেলেন। বললেন, 'পারবি সুট ভরতে! কয়লা কোথায় নেমে গেছে দেখেছিস!'

'দেখেছি। আপনি যাবেন কি না বলুন।' আলতাফ কেমন নিজেই বেকুব বনে গেল। গোপাল কি তাকে খারাপ লোক ভাবছে। গোপাল তো তাঁর নিখোঁজ পুত্রের বয়সী। সে বলল, 'ঠিক আছে যাচ্ছি। সাবধানে কাজ করিস। সুটে কয়লা ফেলতে গিয়ে পড়ে যাস না। পড়লে মরবি। আমরা আর তোকে খুঁজে পাব না। কয়লার সঙ্গে মরামানুষ নেমে যাবে। কয়লার ভেতর থেকে টেনে বের করতে হবে।'

তাকে নিয়ে সারেঙসাব এতটা আতঙ্কে কেন ভুগছেন সে বুঝতে পারে না। সারেঙসাব জাহাজে ওঠার পরই বেশ বিচলিত। তার খারাপও লাগে। সারেঙ সাবের বাড়াবাড়ি যে সন্দেহের উদ্রেক করে তিনি কিছুতেই বুঝতে চান না। মাঝেমাঝে বড় ছেলেমানুষ হয়ে যান।

সে দেখল, সারেঙসাব হেঁটে চলে যাচ্ছেন সিঁড়ির দিকে। সিঁড়িতে কেন যে খুবই কম পাওয়ারের ডুম জ্বালিয়ে রাখা হয়—কেমন আবছা অন্ধকার—চারপাশে লোহার জালি, দেওয়াল। ঝুরঝুর করে অনবরত কিছু

যেন ঝরছে। কয়লার গুঁড়ো, ধোঁয়ার ভুসোকালিতে মাখামাখি সব। সে কয়লা ভরতে থাকল, সে গাড়ি টেনে কয়লা ফেলতে থাকল সুটে। দম ফেলতে পারছে না। নিজের সঙ্গে বাজি রেখে এই কাজ—তাকে সুট ভবে যেতেই হবে। ঘামে ভিজে গেছে জামাপ্যান্ট। মাথা ঘেমে যাচ্ছে। জবজবে ভিজে শরীর। যখন আর পেরে উঠছে না উইন্ডসহোলের নিচে দাঁড়িয়ে সে জোরে শ্বাস টানছে। কেবল মনে হচ্ছে এই বুঝি হাওয়া বাতাস বন্ধ হয়ে যাবে। সে ক্লান্ত অবসন্ন।

সুট ভরে উপর উঠতেই দেখল চিমনিটা দুলছে। অতিকায় হলুদ রঙের চিমনিটা তার মাথার উপর দুলছে। গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে, আবার উঠে আসছে। সোজা দাড়াতে পারছে না। সে টলছিল। সে বসে আছে। সমুদ্রের জলকণায় সে ভিজে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা বাতাস। আরাম। আগয়ালারা উঠে যাচ্ছে। বারোটা-চারটার পরিব জাহাজিরা নেমে আসছে। তারা তাকে দেখছে। সে বসে আছে। কেউ বলল, কিরে বসে থাকলি কেন। যেতে পারবি ডেক ধরে। হিবিংলাইন থেকে দেখিস হাত যেন ফস্কায় না।' সে বলল, 'পারব।'

'হিবিংলাইন ধরে যাস। সাবধানে।'

'যাব।'

যে যার মতো ওয়াচ সেরে উঠে গেল। তখনই মনে হল, সে ফিরছে না বলে, সারেঙসাব ছুটে আসতে পারেন। বুড়ো মানুষটাকে আব সে বিব্রত করতে চায় না।

ওঠার মুখে দেখল, ঠিক তিন নম্বর বোটের আড়ালে একটা ছায়ামূর্তি। সে উইংসের আলোতে অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ এক নারী দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘোর নয় তো। জাহাজে মেয়েমানুষ! সে ফাঁপড়ে পড়ে গেল। কড়-কড় করে বাজ পড়ল সমুদ্রে। বিদ্যুৎ চমকাল। বোট-ডেক, ব্রিজ, উইংস সব স্পষ্ট চোখে। গাউন পরে অন্তর্হিত হচ্ছে এক নারী। উইংসের সিঁড়ি ধরে নেমে যাচ্ছে। সে কিছুটা বিমূঢ়। জাহাজ খারাপ জায়গা। জাহাজটা কখনও অশুভ প্রভাবে পড়ে যায়। এই ঝড় এবং দুর্যোগের মধ্যে সে এটা কি দেখল! নিজের চোখকে অবিশ্বাস করে কি করে। ভীত সন্ত্রস্ত গোপাল বোট-ডেকে ছুটে গেল। সিঁড়ি ধরে নামল। হিবিংলাইনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। লম্বা কাছি জাহাজের শেষ মাথায় টানা দেওয়া। সে হিবিংলাইনে ঝুলে ঝুলে এগিয়ে যেতে থাকল।

পেছনে তাকাচ্ছে না ভয়ে। যেন তাকালেই দেখতে পাবে সেই নারী বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে। সবুজ রঙের গাউন, মাথায় কালো ঝালর দেওয়া টুপি, পায়ে কারুকাজ করা জুতো। সে স্পষ্ট দেখছে। আর তখন বিশাল ঢেউ আছড়ে পড়ছে ডেকে। সে ঝুলে আছে দড়িতে। দু হাতে শক্ত করে ধরে রেখেছে। ঢেউ তার জলরাশি নিয়ে জাহাজ ভাসিয়ে চলে যাচ্ছে। সে জলের ভিতর লম্বা হয়ে গেছে। শ্বাস ফেলতে পারছে না। দড়ি ছেড়ে দিলে সমুদ্র তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে। আফটার-পিকে জাহাজিরা চেঁচামেচি করছে। খবর রটে গেছে গোপালের বড় দুঃসাহস। বেটা মরবে। ঢেউ চেনে না, সমুদ্র চেনে না—ঝড়ের দাপট বোঝে না, গোপাল মরবে।

ইনজিন-জাহাজিরা সবাই প্রায় উপরে উঠে এসেছে। সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। গোপাল কি ভেসে গেল সমুদ্রে ! ডেক ধরে ছুটে যাবার অবসর পায়নি ! বিশাল ঢেউ তাকে কি ভাসিয়ে নিয়ে গেল। সারেঙ চিৎকার করছেন—শক্ত করে ধরে থাক। তখন গোপাল যে জলের নিচে সে খেয়ালও তাঁর নেই। তিনি কেমন শক্ত কাঠ হয়ে গেছেন। ঘোর অন্ধকারে ঢেকে আছে চরাচর। টর্চ জ্বালাতেই দেখলেন—ডেক সাফ, জল নেমে গেছে। জলে চুবিয়ে দিয়ে গেছে গোপালকে। সে জল কেটে এগিয়ে আসতে পারছে ভেবে সারেঙসাব ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'তোর কি মাথা খারাপ আছে ? তুই কি পাগল !'

সে বলতে পারত, আর পাগল ! যা দেখেছে, সবার সামনে বলতেও সঙ্কোচ হচ্ছে। জাহাজে কে সেই নারী—যে রাতেবিরেতে ভয় দেখাতে পারে। অশরীরী কোনো আত্মার প্রকোপ যে নয় কে বলবে ! সে বলল, সরুন। আমাকে যেতে দিন। যেন গোপালের কিছু হয়নি।

গোপাল বুঝতেই পারছে না কত বড় ফাঁড়া কেটে গেল তার।

শুধু সারেঙ কেন, সবাই আহাম্মকের মতো পিছিলে দাঁড়িয়ে থাকল। বাদশা ছুটে গেছে নিচে। জাহিরও। সবাই তারপর নেমে গেছে। গোপালের ফোকসালে জড়ো হয়েছে সবাই। গোপাল কোনো কথা বলছে না। লকার থেকে জামাপ্যান্ট বের করে বাথরুমে উঠে গেল। তারপর নেমে এসে দরজা ঠাস করে বন্ধ করে দিল সবার মুখের উপর। সে কোনো কৈফিয়ত দিতে রাজি না। মনমেজাজ ঠিক নেই। সকাল আটটা না বাজতেই ফের বাংকারে ঢুকতে হবে। কয়লা ফেলতে হবে। দুর্যোগ কবে কমবে সে জানে না। যেন নিরবধিকাল এই যাত্রা। যা ধকল গেছে—সে শুয়ে পড়তে পারলে বাঁচে।

আর যা দেখল—ঘোরই বা ভাবে কি করে !

পরদিন খবরটা চাউর হয়ে গেল। সবাই তাকে দেখছে। এই সেই গোপাল !

ঘূর্ণিঝড় নেই। পাতলা মেঘ আকাশে ওড়াউড়ি করছে। ডেকে লোকজন কাজে বের হয়েছে। সাফসুতরোর কাজ। ডেরিক আলগা হয়ে গেছে। কপিকলে ডেরিক টেনে সোজা করে ফেলে রাখা হচ্ছে। তাকে নিয়ে কেবিনে ফোকসালে সর্বত্র কথাবার্তা—তাকে দেখলে সবার একগাল হাসি, 'গোপাল দেখালি বটে। এত সাহস ভাল না', এমনও কেউ বলল !

কাকে যে বলা যায়। সারেঙসাবকে বলা যায় না। তিনি তো আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন, জাহাজটা ভাল না। কাকে দেখতে কি দেখে ফেলবি। কত নাবিক দীর্ঘ সমুদ্র সফর করতেই পারেনি। পাগল হয়ে গেছে। জাহাজ কারে রাখে, কারে মারে কেউ বলতে পারে না। যেন জাহাজটা তাকে দিয়েই কাজটা শুরু করতে চেয়েছিল। পারেনি। অকস্মাৎ বজ্রপাতের মতো নারী-রহস্য জাহাজে তাড়া না করলে নিচে নেমে অন্তত দেখার সময় পেত কোনো বড় ঢেউ মাথায় তারাবাতি জ্বালিয়ে ছুটে আসছে কিনা। বিশাল এক অন্ধকারের সাম্রাজ্য এগিয়ে আসতে থাকলে, ঢেউ-এর মাথায় ফসফরাস জ্বলতে থাকলে বোঝা যায় ডেক নিরাপদ নয়। আসছেন তিনি। ঢেউ মর্জিমতো ডেক ভাসিয়ে চলে গেলে ফাঁকফোঁকরে গলে যাওয়া যায়। আর একটা ঢেউ আছড়ে পড়ার আগেই কাছি ধরে আফটার-পিকে উঠে যাওয়া যায়। সে তাড়া না খেলে কোনো কথা ছিল না। দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটার কারণেই সে বিশাল ঢেউ-এর থাবায় পড়ে গেছিল। তার বিপদের মূলে সেই রহস্যময়ী নারী।

বিকাশদাকে বলতে পারে। কিন্তু বিকাশদা যদি মজা করে তাকে নিয়ে। 'তাই নাকি ! তুই তো ভাগ্যবান। জাহাজে তোর লোভে পড়ে মেয়েমানুষ উঠে এসেছে। জাপটে ধরেনি তো ?'

ঘরে ঘরে তাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা জমতে কতক্ষণ ! তা গোপাল মেয়েমানুষ কোথায় দেখলি, কখন দেখলি। কি বলল ! নোনা জলের গন্ধে তুই পাগল—আরও কত কিছু দেখবি—সবে তো শুরু। মালের জাহাজ, গড়িয়ে গড়িয়ে যাবে—যত দিন যাবে, তত সর্ষে ফুল দেখবি।

তারপর কেন যে গোপালের মনে হল, ঘোরে পড়েই সে এমন দেখেছে। মরীচিকা। মরীচিকার কুহকে পড়ে এমন দেখেছে। সমুদ্র বড় কুহকিনী

এমনও সে শুনেছে। কলম্বো থেকে কোনো যাত্রী ওঠেনি তো! এটা তো মালবাহী জাহাজ। যদি উঠে থাকে রাতে সে তো জেগে ছিল না। কিনার দেখার জন্য রেলিঙে সারারাত ঝুঁকে থাকেনি। ডাঙ্গা যে নাবিকদের কাছে কত প্রিয় শেষ রাতের দিকে একবার উপরে উঠে টের পেয়েছিল। তখনও কেউ কেউ জেগে আছে। কাঠের হাতি, ময়ূরের পালক বিক্রি করতে যারা নৌকায় এসেছিল, তারা কেউ নারী নয়, কারণ জাহাজ ঠিক জেটিতে ঢুকতে পায়নি। বয়াতে জাহাজ বাঁধা। যদি তারা নৌকায় আসে—পলকের এই দেখা কত রোমহর্ষক হতে পারে নাবিকদের করুণ প্রতীক্ষা থেকে এটা সে টের পেয়েছে।

সকালে কেমন গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল। জাহির চা করে নিয়ে এল। বিকাশ, বাহার এবং আরও সব জাহাজিরা তার ঘরে ঢুকে গেছে। জাহির সবাইকে চা দিচ্ছে। গতরাতের লোমহর্ষক ঘটনার কথা বলছে। সে খবুই আহাম্মক এমনও বলেছে। জাহাজ এ-ভাবেই কুহকে ফেলে দেয়। সমুদ্রও।

গোপাল রা করেনি।

গোপাল শুধু বলল, 'কলম্বো থেকে কোনো কি যাত্রী তুলে নেওয়া হয়েছে? তোরা জানিস কিছু।'

সবাই একবাক্যে বলল, 'না।' কেউ বলল, 'কার্গো শিপে যাত্রী নেবে কোথায়!' বিকাশদা বলল, 'নিতে পারে।' কোনো কোনো জাহাজে ব্যবস্থা থাকে। তবে আমি তো জানি না কোনো যাত্রী উঠেছে বলে। উঠলে আমরা দেখতে পেতাম না!

গোপাল প্রায় বলে ফেলেছিল আর কি—আমি যে দেখলাম। এবং গোপাল বুঝল এই নিয়ে কথা আর বলা যুক্তিসঙ্গত হবে না। সে নিজেই ফাঁস করে দিতে পারে কথায় কথায়। শুধু বলল, 'সারেঙসাব ঠিকই বলেছে, জাহাজটা ভাল না।'

'জাহাজটা খারাপ কি! তা পুরানো লজঝরে জাহাজ কাজ কাম বেশি।' কে যেন এমন বলে উঠে গেল। গোপাল বুঝতে পারল না, কে বলল। সে চা খেতে খেতে অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল। মাথায় তার ঝকমকে টুপি, বিদ্যুৎ চমকাতেই টুপিতে সূর্যকিরণ যেন ঝলসে উঠেছিল। যেন দামি মণি মাণিক্যে টুপিটা তৈরি। গলায় বড় বড় স্বচ্ছ পাথরের মালা। দীপ্ত হয়ে উঠেছিল বিদ্যুৎ চমকে। আপার্থিব এই সুন্দীর কে সে জানে না। ঘোরই হোক আর সত্যি হোক, সে এই জাহাজের দেবী এমন মনে হল তার। তাকে নিয়ে বেশি ঘাটাঘাটি করা ঠিক না।

সে তার পরি দিতে উপরে উঠে গেল। যাবার মুখে দেখল, ওজালিও চিমনির গুঁড়িতে বসে ঠুক ঠুক করে চিপিং করছে। চুল ওর কিছুটা বড় হয়ে যাওয়ায় পেছন থেকে মাথাটা বেশ বড় মনে হচ্ছিল। একমাথা সোনালি চুল। আর কাছে গেলেই আশ্চর্য ঘ্রাণ পাওয়া যায়। কেন যে ওজালিও তার কাজে নামার রাস্তা আগলে বসে থাকে সে বুঝতে পারে না। কুকুরটা তাকে দেখে ভুক ভুক করে উঠল—কিন্তু আগের মতো তেড়ে এল না। সে ভাল ছেলে এমন হয়তো টের পেয়েছে। হাই তুলল কুকুরটা। ওজালিও মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করল। তাকে দেখে সামান্য হাসল। গোপালও হাসল। না হাসলে তার ক্ষতি হতে পারে—সে কি পছন্দ করে এখনও ঠিক জানে না—আর তাকে কি ভাবে খুশি রাখা যায় তাও জানে না। ফাইভার তো বলল, মেক ফ্রেন্ডশিপ। কথা বল। দেখবে আর কুকুর লেলিয়ে দেবে না। সে বলল, গুড মর্নিং। গুড মর্নিং বললে, ওজালিও নিশ্চয় খুশি হবে। কিন্তু খুশি হওয়া দূরে থাক, তার কথায় যেন কর্ণপাতই করল না ! এমন কেন হয় গোপাল বোঝে না। সে সিঁড়ি ধরে নামার সময় বেকুফের মতো বলে ফেলল, আর ইয়ো গার্ল !

আসলে ওজালিওকে নিয়ে রগড় করার ইচ্ছে কবে থেকে যেন—মাথায় তো নানা দুষ্টবুদ্ধি খেলে বেড়ায়। দুষ্টবুদ্ধি ছলেবলে শেষে বালিকাতে এসে দাঁড়াবে গোপাল নিজেও ভাবতে পারেনি। বলেই কিছুটা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। টুপ করে জালির ভিতর অন্তর্হিত হয়ে গেলে তার নাগাল পাবে না। লোহার সিঁড়ি টপকে কুকুরটাও তার পিছু নিতে পারবে না। বাংকারে ঢুকে গেলে নিরাপদ—ঠিক জালির নিচে অন্তর্হিত হবার মুখেই সুযোগ বুঝে কথাটা বলল গোপাল।

আর আশ্চর্য সে দেখল, ওজালিওর যেন বড় কষ্ট হচ্ছে কথা বলতে। কেমন স্তিমিত গলায় বলল, নো মি বয়। মি বয়। এমন করুণ চোখে তার দিকে তাকাল যে গোপাল সত্যি গোলমালে পড়ে গেল। তাকে তাড়া করল না। কুকুর লেলিয়ে দিল না। এমনকি আরও ঘাড় গুঁজে লজ্জায় সরমে মুখ ঢেকে ফেলার মতো নিবিষ্ট মনে চিপিং করতে লাগল।

বাংকারে ঢুকে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল গোপাল। খুবই অনুচিত কাজ করে ফেলেছে। কেন যে এমন দুর্বুদ্ধি গজাল মাথায় ! কোথাকার জল শেষে কোথায় গড়ায়। তার জন্য সারেঙসাবও বিপদে পড়তে পারেন। সামান্য একজন কোলবয় গোপাল—জাহাজে উঠে কাপ্তানের পুত্রটির উপর লোভ—না

হলে তাকে বালিকা ভাবে কোন সাহসে ! যৌন বিকৃতি যে নয় কে বলবে ! গোপাল কিছুটা কেমন ম্রিয়মান ।

আর তখনই দেখল ওজালিও বাংকারে ঢুকে গেছে । কুকুরটাও সঙ্গে । সে এখানে কেন ! গোপাল তটস্থ । সে ভাবল, তার এখন সোজা অস্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই । সোজা বলবে, না এমন কথা আমি বলিনি । আপনি ভুল শুনেছেন । আমি এমন বিদ্‌ঘুটে প্রশ্ন করতেই পারি না, আপনি বালিকা কি না । আমার কি মাথা খারাপ ! জলজ্যান্ত একজন ছেলেকে আমি কেন বালিকা ভাবতে যাব । আমার কি দায় পড়েছে ! সে তাড়াতাড়ি তার গাড়ি এবং বেলচা টেনে নিয়ে গেল ভিতরের দিকে । বাংকারের মাঝামাঝি জায়গায় এখন কয়লার পাহাড় । সে দ্রুত গাড়িতে কয়লা ভরে হ্যাণ্ডেল ধরে সুটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে আর ঠেলে দিচ্ছে—এই বাংকারে আর কেউ ঘাপটি মেরে থাকতে পারে সে যেন জানেই না । সে যেন ওজালিওকে আদপে দেখেইনি ।

গোপাল চোখ তুলে তাকাতেও পারছে না । তাকালেই দেখতে পাবে কাপ্তানের পুত্র দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে । কুকুর দিয়ে তাকে খাইয়েও দিতে পারে । হিংস্র হয়ে উঠলে মানুষ সব পারে । তাকে বালিকা বলে অসম্মান করেছে, রাগ হতেই পারে—এ-ছাড়া যদি খবর রটে যায় বাংকারে ঢুকে গেছে কাপ্তানের পুত্র, তবে আর এক কেলেঙ্কারি । আর যাই মানাক একজন জাঁদরেল কাপ্তানের ছেলে বাংকারে ঢুকে পড়তে পারে কেউ বিশ্বাসই করবে না । নিশ্চয়ই সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে । গোপাল ঘামছিল ।

আর তখনই সে বলছে, তুমি কি রুডি ? দেয়ালে ঠেস দিয়ে তাকে বলছে, 'তুমি কি পাহাড়ী দেশের যুবক । সারাদিন কি তোমার অরণ্যে দিন কাটে ?'

গোপাল কয়লা তুলছে না । বেলচার উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে । ওজালিও জানতে চাইছে, সে রুডি কি না ! রুডি সে হতে যাবে কেন ? সে একেবারে হতভম্ব ।

গোপাল বলল, 'না আমি রুডি না । অরণ্যে আমি ঘুরে বেড়াই না ।' গোপালের গলা বুক শুকিয়ে যাচ্ছে কথা বলতে গিয়ে ।

ওজালিও সেখান থেকে নড়ছে না । বাংকারে কয়লার পাহাড় । জাহাজ ওঠানামা করলে, কয়লার বড় চাঙ্গর গড়িয়ে নামে । পায়ে পড়লে জখম । সতর্ক থাকতে হয় । বেলচায় খোঁচা মারলে ঝুর ঝুর করে পায়ের কাছে নেমে আসে কয়লা । সে ব্যস্ত কয়লা ফেলতে । তবু কাপ্তানের পুত্র তার বাংকারে সম্মানিত অতিথি । সে রূঢ় হতে পারে না । সে বলল, আপনি যে এখানে

ঢুকলেন সাহেব, জামা কাপড় তো যাবে। দেখছেন তো কয়লার গুঁড়োতে কেমন অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে বাংকার ! আপনি বরং উপরে যান, আমি সেখানে যাচ্ছি।

গোপাল সাহেব বলে তোষামোদ করার চেষ্টা করলে কি হবে—সে নড়ছে না, উপরেও উঠে যাচ্ছে না। কুকুরটা লেজ নাড়ছে। বাংকারে লাফাচ্ছে। গোপাল বলল, 'সাহেব আপনার কুকুর সামলান। কুকুরকে আমি বড় ভয় পাই।' তারপরই বলল, কুকুরটা কামড়ায় না। এত ভাল জাতের কুকুর আমি জীবনেও দেখিনি সাহেব।

কয়লার গুঁড়ো কখনও কখনও এত বেশি ওড়ে যে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। রাশি রাশি কয়লার ধুলো শ্বাস-প্রশ্বাসে যাওয়া-আসা করে। ওজালিওর পক্ষে এ-ভাবে বাংকারে ঢুকে যাওয়া কত বেমানানা তাও বুঝছে না। সে কি সারেঙসাবকে খবর দেবে !

ওজালিও ফের বলল, তোমার বাবা কি অশ্বারোহী সৈনিক ?

এ তো আচ্ছা ছেলের পাল্লায় পড়া গেল ! সে যে কি বলে ! একেবারে মাথা খারাপ ! সে বলল, 'না আমার বাবা অশ্বারোহী সৈনিক নন। তিনি একজন সামান্য দর্জি। সেলাই রিপুর কাজ করে থাকেন। বোনেরা বাবার কাজে সাহায্য করে। বোতামের ঘর সেলাই করে দেয়।'

ওজালিওর মুখ কেমন ব্যাজার। সে কি গোপলাকে কোনো অশ্বারোহী সৈন্যের পুত্র ভেবেছে। সে গোপাল নয়, সে রুডি ওজালিওর কাছে ! মাথার গণ্ডগোল নেই ! প্রায় পক্ষকাল হয়ে গেল তারা সমুদ্রে, তাকে দেখার পর থেকেই ওজালিও নিজের মতো কিছু ভেবে রেখেছে হয়তো। তা মনে হতেই পারে। কে কাকে দেখে কি ভাবে মনের মধ্যে কার কি ক্রিয়া করে গোপাল জানবে কি করে। ওজালিও কি জানে, তার চাউনি, কথা বলার ঢং-এ একটা মেয়েলি স্বভাব আছে। সে যে একজন জাহাজের দেবীকেও দেখেছে, ঝড়ের সমুদ্রে তিনি তার সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন—ওজালিও কি জানে ?

'রুডি তুমি তুষার প্রান্তরে, কখনও সবুজ উপত্যকায় ঘুরে বেড়াও। আমি জানি। তুমি যাই বল, আমি জানি, চিলনে তুমি গেছ। আমি জানি রুডি। তুমিও জান, স্বীকার করছ না। সেই গিরিখাতের তুষার স্রোত। দু-পাশে বরফের উপত্যকা, জান সেখানে বাস করতেন একজন তুষার কুমারী !

গোপাল বলল, 'সেটা কোথায় ?'

'রুডি সব ভুলে গেলে ! পাহাড়ের উপর রোদ ঝকমক করে। হাজার

হাজার বছর ধরে রোদ তরল হাওয়ায় পিণ্ড পাকিয়ে বরফ হয়ে যায়। পাহাড়ী শহর গ্রিনডেনওয়ালের কাছে গিরিখাতের মধ্যে রয়েছে এমন দুটি স্রোত। সে দুটি অতি চমৎকার দেখতে। গ্রীষ্মকালে কত বিদেশী আসে গিরিখাত দুটি দেখতে। তুমি সব ভুলে গেলে!'

গোপাল গ্রিনডেনওয়ালের নামই শোনেনি।

'আমি গ্রিনডেনওয়ালেতে কখনও যাইনি ওজালিও। আপনি বিশ্বাস করুন সাহেব।'

'আমাকে ওজালিও বলছ কেন! আমি বাবেতি। আমাকে ওজালিও বললে অসম্মান করা হয় জান।'

গোপাল আর কি করে। সে যেন পুত্রটির হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যই বলল, ঠিক আছে আমি রুডি। তুমি বাবেতি। এখন যাও। কারণ গোপাল জানে, রুডির লোভে বাবেতি যেখানেই যাক, এই বয়সন্ধিকালে নানা স্বপ্নে বিভোর কে না হয়! আর মনে হল, বাবেতি তাকে যদি রুডি বলে ডাকে তাতে ক্ষতিরই বা কি। আর যাই হোক, রুডিকে কুকুর লেলিয়ে দেবে না। কিংবা যখন তখন বিপদেও ফেলতে চাইবে না, এ-রকম সাত পাঁচ ভেবেই গোপাল রুডি হতে চাইল। সে বলল, ঠিক আছে বাবেতি, তুমি এখন যাও। আমাকে কয়লা ফেলাতে হবে। দেখছ না, সুট খালি হয়ে যাচ্ছে। স্টোকহোলড থেকে চিল্লাতে শুরু করল বলে। ওদের দোষ কি। কয়লা হাতের কাছে না পেলে চিল্লাবে না! জাহাজ চলবে কি করে।'

কাপ্তানের পুত্রটি খুব খুশি।

'তুমি আমাকে মিছে কথা বলছ না তো?'

'মিছে কথা বলব কেন বাবেতি!'

বাবেতি বাবেতি—কেমন চোখ বুজে উচ্চারণ করল কাপ্তানের পুত্র। কতদিন পর যেন তাকে কেউ বাবেতি বলে ডাকছে।

গোপাল ভাবল, সত্যি মাথা খারাপ। অথচ জাহাজে ওঠে বাবেতি সম্পর্কে নানা গুজব—কেউ সঠিক কিছু বলতে পারেনি। দু-সফর ধরে কাপ্তান তার পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজে উঠছেন। বোঝাই যায় শেষ বয়সের সন্তানের প্রতি মায়া মমতা বেশি। আর সে যদি কোনো কারণে মানসিক ভারসাম্য হারায় তবে তো সঙ্গে নিতেই হয়। আসলে গোপাল জানেই না, রুডি কোন দেশের যুবক হতে পারে, বাবেতি কোন দেশের তরুণ হতে পারে। দুটো নামই তার কাছে একান্ত অপরিচিত। কিংবা এমনও হতে পারে, জাহাজে সে কিছুটা

সমবয়সী বলে, বাবেতি তার একজন সঙ্গী খুঁজছে। গোপালের মধ্যে তা আবিষ্কার করে আজ নিচে নেমে এসেছে। কারণ গোপাল তাকে আজ গুড মর্নিং বলায়, বোধ হয় যারপরনাই সে খুশি।

গোপাল কেন যে বলল, 'মাকে ছেড়ে জাহাজে ঘুরে বেড়াতে তোমার কষ্ট হয় না বাবেতি ?'

বাবেতি কেমন নিষ্প্রাণ হয়ে গেল। সে তার দিকে তাকিয়েই আছে। কোনো সাড়া দিচ্ছে না।

'আমার খুব কষ্ট হয় বাবেতি। মাকে ছেড়ে ভাইবোনদের ছেড়ে আমার জাহাজে ঘুরে বেড়াতে খুব কষ্ট হয়। দেশে ফেরার সময় ভেবেছি, মা-র জন্য একটা কম্বল নিয়ে যাব। শীতে খুব কষ্ট পান।

বাবেতি বলল, 'তোমার মা খুব ভালবাসে তোমাকে ?'

'বাসবে না! জাহাজে আসছি শুনে, কি কান্নাকাটি। ঠাকুরের কাছে মানত। ভালয় ভালয় ফিরে গেলে, তিনি কালীবাড়িতে পূজা দেবেন।'

বাবেতি বলল, 'তোমার মা খুব সুন্দর।' বলতে বলতে কেঁদে ফেলল।

গোপাল হতবাক। বাবেতি তার মা-র কথা শুনে কাঁদছে। বাবেতিকে কি বলে সান্ত্বনা দেবে তাও বুঝতে পারছে না।

সে ডাকল, বাবেতি!

হুঁ।

'কাঁদলে আমার খুব খারাপ লাগে।'

'ঠিক আছে কাঁদব না। চোখের জল মুছে গোপালের কাছে এগিয়ে এল। বলল, 'আমি তোমাকে কাজে সাহায্য করতে পারি!'

'না না। প্লিজ বাবেতি তুমি উপরে যাও। এক্ষুনি হয়তো খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে যাবে। তোমার খোঁজে এখানে নেমে এলে আমার বিপদ হতে পারে। তুমি যাও। প্লিজ। আমার কাজ আমি নিজেই করতে পারব।'

বাবেতি, একটি বড় কয়লার চাঙ্গর তুলে নিল হাতে। গাড়িতে রেখে বলল, 'আমাকে শিখিয়ে দেবে ?'

'কি শেখাব ?'

'কি করে গাড়িটা ঠেলে দিতে হয়। তুমি বেলচায় কয়লা ভরে দেবে। আমি নিয়ে ফেলব।'

গোপাল কেবল বলছে, 'যাও বাবেতি। শেষে তোমার জন্য না আমার মাথা কাটা যায়! এত আস্পর্ধা—তোমার বাবা ভাবতেই পারেন।'

বাবেতির চোখ দুটি ভারি শান্ত। গোপালকে দেখছে—আর কোন এক অতীতে, গভীর অতীতে ডুবে যাচ্ছে। যেন অন্য জন্মের কথা। কেউ তার অন্য জন্ম থেকে উঠে এলে যেমন হয় বাবেতি তেমনি মাথায় দু-হাত ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গোপালের কয়লা ফেলা দেখছে। গোপাল কাজ করছে—যেন বাবেতিকে চেনেই না। বাবেতি জাহাজে এখন বাঙ্গালী নাবিকদের কাছে কুট্টিসাহেব। বড়টিণ্ডাল ঘুরে যেতে পারেন, গোপাল ঠিকঠাক কয়লা ফেলতে পারছে কি না দেখে যেতে পারেন। গোপাল সুট ভরতে না পারলে দোষ হবে বড়টিণ্ডালের। সারেঙকে নালিশও দেওয়া যাবে না। দিলেই বলবেন, আরে গোপাল নতুন সফর করছে। সে পারবে কেন! তোমরা কি করতে আছ! সবাই মিলে কয়লা ফেললে ক' বেলচা কয়লা লাগে শুনি! সারেঙসাব উল্টে বড়টিণ্ডালকেই তড়পে উঠবেন, বুড়া জান মিঞা তোমার জাহাজে কাম করতে করতে চুল পাকিয়ে ফেললে, কে কতটা কাজের হতে পারে দেখে বোঝ না। গোপাল পারছে কি না দেখবে না। না পারলে কি কাজ আটকে থাকবে! কাজ তুলে দিতে হবে না!

গোপাল জানে, বড়টিণ্ডাল তার দায় এড়াতেই উঠে আসতে পারেন। উঠে এসে বাবেতিকে দেখলে তোতলাতে শুরু করতে পারেন—আরে কুট্টিসাহেব কয়লার জঙ্গলে, কয়লার গুঁড়োর মধ্যে দাঁড়িয়ে কি করছে! সেলাম দেবে। তারপর আতঙ্কে পালাবে। বাড়িয়ালার পুত্র গোপালের বাংকারে—এবং দৌড়ে বোট-ডেকে উঠে যেতে পারেন। সারেঙকে খবর দিতে পারেন। মাথা যে ঠিক নেই বাবেতির এমনও ভাবতে পারেন। তারপর গোটা জাহাজে তোলপাড় শুরু হতে পারে—কিংবা কাপ্তানবয় তার খোঁজ খবর নিতে এসে যদি দেখে, কাজের জায়গায় চিপিং-এর হাতুড়ি পড়ে আছে, কুকুরটা নেই—বাবেতির কেবিনে যেতে পারেন, বুড়ো কাপ্তানবয় খোঁজাখুঁজি শুরু করলে—চার্টরুম কিংবা কাপ্তানের কেবিনে খবর চলে যাবে—তখন সারা জাহাজে হৈ চৈ—গেল কোথায়! বাংকারের অন্ধকারে পালিয়ে থাকতে পারে বাবেতি এমন অনুমানই করতে পারবে না কেউ। আর যদি দেখে ফেলে বাংকারে বাবেতি, তবে গোপালকেই চেপে ধরবে—তুই দেখতে পাসনি, কে ঢুকে গেছে তোর বাংকারে।

বাবেতি তখনও বক বক করছে। গোপাল কান দিচ্ছে না। কারণ বাবেতি যে জেদি এবং এক গুঁয়ে বুঝতে তার অসুবিধা হয়নি। বোধ হয় জাহাজে সে কাউকে তোয়াক্কা করে না। বাবেতি বলেই চলেছে, জান, তোমার দাদু

থাকতেন পাহাড়ের মাথায়। বুড়োর ঘরে ছিল, বাচ্চারা যা দেখে মুগ্ধ হয়—যেমন কাঠের কাবার্ড—কাবার্ডের মধ্যে প্রচুর খোদাই করা খেলনা, বাদামভাঙ্গা হাতুড়ি, ছুরি ও কাঁটা, লতাপাতা ও লাফিয়ে চলা শ্যাময় হরিণের নক্সাকাটা বাক্স। কিন্তু তুমি পছন্দ করতে দাদুর রাইফেলটা। দাদু বলেছিলেন, সেটা একদিন তোমাকেই দেবেন।

গোপাল বেলচা কয়লার মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। লোহার পাত এবং কয়লার গুঁড়ো আর বেলচার ধার সব মিলে এমন বিশ্রি শব্দ হচ্ছে যে, বাবেতি দূরে দাঁড়িয়ে কিছু বললেও শুনতে পাচ্ছে না। সে আসলে কিছুই শুনতে চায় না। কারণ বাবেতির খোঁজে কেউ এলে যেন দেখতে পায় গোপাল কয়লা ফেলে দম পাচ্ছে না। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, বাংকারের অন্ধকারে ঘাপটি মেরে কে লুকিয়ে আছে তার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। এতে সবার কাছে সে সুনাম অর্জন করতে পারবে। সে কামচোর নয়, কাজে ফাঁকি দেয় না, পরিশ্রমী এবং আন্তরিক—এইসব যখন ভাবছিল, তখনই বাবেতি দু-হাতে বিশাল একটা কয়লার চাঙ্গর তুলে এনে গাড়িতে ফেলল। গাড়ির হ্যান্ডল দুটি দু-হাতে ধরতে গেলে বুঝল, না আর সামলানো যাবে না। ইতিমধ্যেই কয়লার গুঁড়োতে বাবেতির মুখ চোখ প্রায় ঢেকে গেছে। যেমন তার ঢেকে গেছে। নাকের ফুটোতে কয়লার গুঁড়ো ঢুকছে। মাথায় নীল টুপি বলে রক্ষা। কিন্তু মুখ এবং হাত দুটি কয়লায় বিবর্ণ। বাবেতির ধব ধবে সাদা বয়লার সুট কয়লার কালিতে মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে। টকটকে ফর্সা রঙে কালির পলেস্তারা পড়ছে। বাবেতির হুঁস নেই। এবারে হয়তো গাড়ি ঠেলতে গিয়ে উল্টে পড়বে। হাতপা ভাঙলে কেলেংকারির শেষ থাকবে না। সে বেলচা ফেলে, প্রায় একটা শিম্পাঞ্জির মতো ঝুলতে ঝুলতে বয়লার রুমে নেমে গেল। বড়টিণ্ডালকে বলল, শিগগির উপরে যান, কুট্টিসাহেব দেখুনগে কি আরম্ভ করেছে! আমাকে কয়লা ফেলতে দিচ্ছে না। গাড়ি নিয়ে টানাটানি করছে।

বড়টিণ্ডাল জবরদস্ত চেহারার মানুষ। তিনি কুট্টিসাহেবের নাম শুনে তার চেয়েও বেশি ঘাবড়ে গেছেন—বললেন, 'তোর পেছনে আবার লাগল কেন। আমি গিয়ে কি করব!'

'কে জানে, কেন লাগল'। আগয়ালারা বেলচা হাতে এগিয়ে এল—গোপাল এ-ভাবে ছুটে নেমে আসায় কোন বিপদ টিপদের গন্ধ পেয়ে তারা জড় হয়েছে গোপালের পাশে। কোথায় কখন কি ভেঙ্গে পড়বে, জাহাজ কখন ফুটো হয়ে যাবে, কিংবা কয়লা ফেলতে গিয়ে কেউ যদি সুটে পড়ে যায়,

তুলে আনা ঝকমারিই না শুধু জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হতে পারে—এসব কারণেই তারা ফার্নেসে কয়লা মেরে দম ফেলতেও পারেনি, গোপালের কাছে তারা হাজির।

আর তখন দেখছে, কুট্টিসাহেব আরও দ্রুত নেমে আসছে। একেবারে লাফ দিয়ে গোপালের সামনে—গোপালের জামা ধরে টানাটানি, প্রায় যেন টেনে হিঁচড়ে গোপালকে বাংকারে নিয়ে যাবে—এত অপমান, 'রুডি তুমি আমাকে একা ফেলে চলে এলে কেন ! আমি কি করেছি ! আমার কি দোষ !'

টিণ্ডাল বলল, 'সেলাম সাহেব। যাচ্ছে। গোপাল যা। তুই কেন সাহেবকে একা ফেলে নেমে এলি ! যা উপরে যা।' গোপালের মনে হল বড়টিণ্ডাল নিজের আত্মরক্ষার্থেই গোপালকে বাংকারে পাঠিয়ে দিতে চান। যা হোক পরে পরে। এই স্টোকহোলডে কোনো নাটক শুরু হয়ে গেলে তাকে কৈফিয়ত দিতে হবে।

গোপাল দাঁড়িয়ে আছে।

আর কেন যে তখন বাবেতি, বলল, 'রুডি বাংকারে যাবে, না যাবে না !' টিণ্ডাল বলছে, 'যা গোপাল !'

'যাব। যাই আর মরি। কি করছে, গাড়ি ঠেলে নিয়ে যাবে বলছে। গাড়ির হ্যান্ডেল ধরে আছে। আমাকে ফেলতে দেবে না। ফেলতে গিয়ে উল্টে পড়ে গেলে, জখম হলে আমার দোষ দিতে পারবেন না।'

বড়টিণ্ডাল ঘাবড়ে গেল। উপরে খবর পাঠাতে হয়—এ-ভাবে কুট্টিসাহেব গোপালের পেছনে লাগবে তিনি অনুমানও কবতে পারেননি। সত্যি যদি জখম হয়, গোপালতো বলবে, আমার কি দোষ—বড়টিন্ডালই তো বললেন, যা গোপাল, যা। টিন্ডাল পড়িমরি করে ছুটে উপরে উঠে গেল। সারেঙকে জলদি খবর দিতে হয়—কুট্টিসাহেব নিচে নেমে ঝামেলা পাকাচ্ছে—কি করবেন করুন। সারেঙসাব তখন বুঝবেন, তার আর দায় থাকবে না। সারেঙসাব সোজা মাইজলা মিস্ত্রিকে খবর দিবেন—মাইজল মিস্ত্রি খবর দেবে বড়মিস্ত্রিকে। বড়মিস্ত্রিই একমাত্র কাপ্তানের ঘরে ঢুকে বলতে পারেন, সার আপনার পুত্র বয়লার রুমে নেমে গেছে। উঠে আসতে চাইছে না।

হয়তো বড়মিস্ত্রি নিজেও একবার নিচে নেমে চেষ্টা করতে পারেন—কিংবা কাপ্তানের নির্দেশে চিফ-মেট, সেকেন্ড-মেট নিচে নেমে আসতে পারে, বুঝিয়ে সুজিয়ে উপরে তুলে নিয়ে যেতে পারে—বড় টিণ্ডাল রহমান ডেক ধরে ছুটছে আর মাথায় যত রাজ্যের চিন্তা ভাবনা কাজ করছে। বড়ই ফ্যাসাদে পড়া

গেল।

খবর চাউর হতে সময় লাগে না। ইনজিন সারেঙ আলতাফ খবর পেয়েই ডেক-সারেঙকে ফ্যাসাদের কথা বললেন। ডেক সারেঙ, ইনজিন সারেঙ, বড় টিন্ডাল আরও দু-চারজন মুরুব্বি জাহাজি বোট-ডেকে উঠে গেল। বোট-ডেকে বাড়িয়ালার কেবিন—ব্রিজে ওঠার মুখেই উইংস, উইংসের এক পাশে চার্ট-রুম, অন্য পাশে ট্রান্সমিশান রুম। তিনি কোথায় আছেন একমাত্র চিফ-মেট বলতে পারবেন। ব্রিজে থাকলে নিচ থেকেই দেখা যেত। চার্ট-রুমে থাকতে পারেন। কেবিনেও থাকতে পারেন। সাধারণ জাহাজিদের জানার কথা নয়। কাপ্তান-বয়কে দিয়ে খবর পাঠানো হয়েছে। সিঁড়ি ধরে তড় তড় করে নেমে আসছেন চিফ-মেট। সাদা হাফপ্যান্ট সাদা হাফ সার্ট গায়, চকচকে জুতো মোজা এবং স্ট্রাইপ সোনালি রঙের কাঁধের ব্লেডে। মাথায় অ্যাংকোর মার্কা সাদা টুপি। তিনি সব শুনে উপরে উঠে গেলেন। আবার নেমে এলেন। কাপ্তান-বয়কে ডেকে কি বললেন, আবার উপরে উঠে কাপ্তানের কেবিনের ভিতর অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। সবাই কেমন বুদ্ধুর মতো দাঁড়িয়ে থাকল।

কাপ্তান-বয় যে বাড়িয়ালার খুব বিশ্বাসী লোক বুঝতে কারো অসুবিধা হল না। কাপ্তান-বয় সবাইকে বলল, সাহেব হুজ্জোতি করছে ? কোথায় করছে !

বড় টিন্ডাল বললেন, 'হুজ্জোতি করছে না—তবে গোপালকে কাজও করতে দিচ্ছে না। বাংকারে ঢুকে বসে আছে।'

কাপ্তান-বয় ছানাউল বেটেখাটো বুড়ো মানুষ। গায়ের রঙ টকটকে ফর্সা। পাকা চুল। সাদা উর্দি গায়। আভিজাত্য আছে চোখে মুখে। কাপ্তান-বয় বলতে কথা। কাঁধে সাদা তোয়ালে। কাজ করতে করতে খবর পেয়ে ছুটে এসেছেন। বাবেতিকে সামলানো তাঁর যেন দায়। কাপ্তানের অনুগত এবং বিশ্বাসী। তিনিই সারেঙ টিন্ডালের ফ্যাসাদের কথা কাপ্তানকে বুঝিয়ে বলতে পারবেন। তাঁর স্মরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায়ও নেই। কাপ্তানকে বুঝিয়ে বলতে পারবেন, গোপাল কে, কি কাজ করে—ভাল কি মন্দ ছেলে। গোপাল যখন এ-সফরে কুট্টিসাহেবের লক্ষ্যবস্তু, এমন কি গোপালের বাপ নানার ইতিহাসও জানতে চাইতে পারে। গোপাল একজন দরিদ্র দর্জির পুত্র, কম বয়সে রুজি রোজগারের আশায় জাহাজে উঠে এসেছে—সে এমন ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়লে যায় কোথায়। কাজ করতে না দিলে, সুট খালি পড়ে থাকবে। ছানাউল চিমনির গোড়ায় এসে ঝুঁকে দেখলেন—নিচে দু'জনই দাঁড়িয়ে আছে সামনা সামনি—সাহেব আর গোপাল। গোপালের পথ আটকে

দিয়েছে। বেচারা কোনোদিকে পালাতে পারছে না। তা সমবয়সী যখন তাড়াতো করবেই। কাপ্তান-বয় গোপালকে দেখে মজাও পেলেন। তাপে ভাঁপে এবার দু'জন ফুটে উঠবে। এর আগেও গোপালকে ছানাউল দেখেছে। কমবয়সী ছোকরা। ফেরাস্তারা মতো দেখতে—মুখখানি ভারি মিষ্টি। চোখ চঞ্চল। একটুকুতেই ঘাবড়ে যায়। সব কিছু ভয়ে ভয়ে দেখে। সেই ছোঁরা একবার ঝড়ের মধ্যে পড়ে গিয়ে দরিয়ার পানিতে ডুবতে বসেছিল, আল্লার দোয়ায় জানের কোনো ক্ষতি হয়নি। বাড়িয়ালার পুত্রটিতো তাকে তাড়া করবেই। তাড়া না করাটাই অস্বাভাবিক। আগের সফরেও বংশদণ্ডটি কাপ্তান বজারসাবের সঙ্গে উঠে এসেছিলেন। এবারে তো আরও লম্বা হয়েছেন, ঢ্যাঙ্গা হয়েছেন। শরীরের ভিতর আদম ইভের ঐশ্বর্য ফুটে উঠতে শুরু করেছে। নিচে নেমে বললেন, 'গোপাল সাহেব কি তোমাকে নিয়ে ধস্তাধস্তি করেছে!' গোপাল বলল, 'আজ্ঞে না।' কাপ্তান-বয় মজার হাসি হাসলেন, বললেন, 'কোনো ক্ষতি করছে না তো।' গোপাল এবারেও বলল, 'আজ্ঞে না, কেবল গল্প করতে চায়। কি সব বলে মাথামুণ্ডু কিছু বুঝিও না—প্রায় দুই দেবদূত সামনাসামনি। কেমন হাই তোলার মতো বললেন, 'তা গল্প করুক না। কার সঙ্গে আর কথা বলবে। কার হাতে এত সময় আছে। বোঝলানা গোপাল সন্তান অতি বিষম বস্তু। কাপ্তান নিজেই ফাঁপড়ে পড়ে গেছেন পুত্রটিকে নিয়ে।'

কাপ্তান-বয় রুডিকে কি বলছে তার একবর্ণ বুঝতে পারছে না বাবেতি। সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। তার কি দোষ নিজেও বোধহয় বুঝতে পারছে না।

কাপ্তান-বয় বললেন, 'যতটা পারবে সাহেবকে সামলে রাখবে। যা বলবে, শুনবে।' যেন কাপ্তানের দূত হয়ে এসেছেন তিনি। কাপ্তানই তাঁকে পাঠিয়েছেন বুঝিয়ে সুজিয়ে গোপালকে নিরস্ত করা যায় কি না!

গোপাল বিরক্ত। তার কি দায় সে বুঝছে না। সে চুপ করে আছে। বিপাকেই পড়া গেল। সামান্য একজন দর্জির ছেলের পক্ষে এত বড় দায়িত্ব নেওয়া শোভনও নয়। সে বেশ বিচলিত হয়ে পড়ল।

হঠাৎ সারেঙ সাব উত্তেজিত গলায় বললেন, 'ছানাউল তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল! গোপাল পারবে। গোপালের বুদ্ধি আছে! ছেলেমানুষ। ঝগড়াঝাটি হলে কে গোপালকে রক্ষা করবে। কখন কি করে বসবে সাহেবটি—মাথার ঠিক নেই—যত্ত পাগলছাগল জাহাজে উঠে আসবে—দায়

গোপালের।' পাগলছাগল বলে ঠিক করলেন কি না সারেঙসাব বুঝতে পারলেন না। শুধরে দিতে চাইলেন—'শুনেছি সাহেবের মাথা ঠিক নেই।'

কাপ্তান-বয় আশ্বস্ত করলেন সারেঙসাবকে। বললেন, সব ঠিক আছে—ভাববেন না। বয়েসটা দেখছেন না। উনুনে সবে আঁচ পড়েছে। ধোঁয়া উঠবে, তারপর গরম হবে—উত্তাপ বোঝলেন না সারেঙসাব। ঘাবড়ালে চলে! খুব খারাপ লাগবে না গোপালের। পারলে গোপালই সামলাতে পারবে

সারেঙসাব কেমন ম্রিয়মান হয়ে গেলেন। গোপালের সমূহ বিপদ টের পেয়ে তিনি যেন বাক্যহারা। আর একটা কথা বললেন না। এমন কি গোপালের দিকে তাকালেনও না। সিঁড়ি ধরে উঠে যাবার মুখে শুধু বললেন, খোদা ভরসা।

॥ ছয় ॥

গোপাল বোঝে জাহাজের সে সবচেয়ে ছোট নাবিক। তার মুখে কোনো যাদু থাকতে পারে—সেই যাদুর টানে বাবেতি তার সঙ্গে মিশতে চায়। এতে খারাপ কি থাকতে পারে সে বুঝতে পারছে না। জাহাজে উঠে সারেঙসাবই কি কম মুরুব্বি শুরু করেছেন! 'গোপাল আল্লার কসম, একটা কথা সত্যি করে বলবি! ঝুট বলবি না বল?' জাহাজে উঠে সারেঙসাব সবে তার লটবহর গোছাতে শুরু করেছেন—দু খানা কাঠের বড় পেটি। একটা পেটি খোলা। খোলা পেটিতে, তামার বদনা, হুঁকো, কাগজে মোড়া একটা বড় পিণ্ড। কিসের পিণ্ড বুঝতে পারেনি গোপাল। পরে বুঝেছিল, তামাকের পিণ্ড। এক হাঁড়ি টিকা—কালো রঙের বাতাসায় যেন ভর্তি হাঁড়িটা। কাঠ কয়লার গুঁড়ো, তাতে গাবের কষ মিশিয়ে যত্নের সঙ্গে সারেঙসাবের বাড়ি থেকে তামাক খাবার জন্য টিকা বানিয়ে দিয়েছে। তিনি তাঁর হুঁকোটা দড়ি দিয়ে বাঁধছিলেন, হুঁকে ঝুলিয়ে রাখার জন্য। গোপাল যে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে আছে তিনি যেন ভুলে গেছেন। যেন এই যে বলা, আল্লার কসম, কিছুটা যেন স্বগতোক্তি! আল্লার কসমটা কি গোপাল বুঝতে পারছিল না। সত্যি কথাটা কি গোপাল বুঝতে পারছিল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে গেছিল। শেষে গোপাল না পেরে বলেছিল, 'সত্যি কথাটা কি বলবেন তো!'

'না, বলছিলাম তরা মরতে জাহাজে উঠিস কেন—কি হাড্ডাহাড্ডি কামকাজ, পারবি!'

সেই এক কথা ! গোপাল বিরক্ত হয়ে বলেছিল, 'দেখুন পাবি কি না। আমাকে নিয়ে কেন আপনার এত মাথাব্যথা বুঝি না !'

'না বলছিলাম, তোদের ধর্মরক্ষা হবে ?'

ভারি ঝামেলার কথা ! গোপাল এটা ভালই বোঝে। ধর্মরক্ষা নিয়ে সারেঙসাবের এত চিন্তা কেন গোপাল তাও বোঝে। ভদ্রাজাহাজের সেকেন্ড-অফিসার চ্যাটার্জী সাহেবের ক্ষেদোক্তিও তার মনে পড়ছিল—দুনিয়ায় কত জাতপাত—তবে বিফ কে খায় না জানি না। হিন্দুরা শুধু খায় না। খেলে ধর্মনাশ হয়। যত গণ্ডগোল এই বিফ নিয়ে। জাহাজে উঠলে বিফ খেতে হবে —জেনেই উঠতে হবে। বিফ খাবে না, মটন চাই, চিল্লাচিল্লি জাহাজে চলবে না। ভারতীয় নাবিকদের খুব বদনাম। জাহাজে উঠেই বিফ নিয়ে ঝামেলা পাকায়। সব বিদেশী কোম্পানি—বিফ নিয়ে ঝামেলা পাকালে, জাহাজে তুলবে কেন !

জাহাজ ধরার দিন থেকে সারেঙসাব নানা ঝামেলা পাকাচ্ছিলেন, জাহাজে উঠেও। শেষে তার ধর্মরক্ষা নিয়ে পড়েছিলেন। গোপাল বলেছিল, ভাববেন না। ধর্ম ঠিকই রক্ষা হবে।

সারেঙসাব চটে লাল ! 'কি বললি, ধর্মরক্ষা হবে ! তুই বামুনের বাচ্চা হয়ে বলতে পারলি ! মুখে আটকাল না ! খাবি ! খেতে পারবি !

তখনই রহমান উঁকি দিয়ে বলেছিল, অরে বঙ্গালীবাবু সারেঙসাবের ফোকসালে তোমার কি কাম !' যেন সারেঙসাবের ফোকসালে ঘুর ঘুর করা ঠিক না। নোংরা ইঙ্গিত ছিল কথাটাতে।

সারেঙসাব ছেড়ে দিতে নারাজ। বলেছিলেন, 'কাম আছে, কাম না থাকলে আসবে কেন ! ডেকে পাঠিয়েছি। যাচ্ছে।' তারপর তার দিকে তাকিয়ে কি ভাবছিলেন যেন, পরে কেমন নিজের সঙ্গে কথা বলার মতো উচ্চারণ করলেন, 'তোদের ধর্ম না থাকতে পারে। আমার আছে। দেখি বাটলারকে বলে...'

গোপাল ঠিক বুঝতে পারত না, সে জাহাজে উঠে আসায় তিনি কেন এত অসন্তুষ্ট। তার জাত থাকল কি গেল, কি আসে যায় সারেঙসাবের। বিফ না খেলেই হল। যতই গোপালের ধর্ম নিয়ে হামবরাই ভাব থাকুক, বিফের নামে তারও কম সন্ত্রাস ছিল না।

আর সেই সকালেই সারেঙসাব বাটলারের কাছে চলে গেছিলেন। কেন গেছিলেন, গোপাল জানত না। সে সবার সঙ্গে ইনজিন-রুমে কয়লা লেভেল করতে নেমে গেছে। সবার সঙ্গে দুপুরের টিফিনে উঠেও এসেছে। গ্যালিতে

জল খেতে গিয়ে তাজ্জব। আড়াল থেকে সে শুনতে পাচ্ছে, সারেঙসাব ভাণ্ডারি রহমত মিঞার কাছে আফশোষ করছেন—'জাত মারলে গুনাহ বুঝলে ! বড়ই বিপাকে পড়া গেল। বাঙ্গালীবাবু তোরা, হিন্দুর জাত ধর্ম বলে কথা, তাই বলে অভক্ষ্য ভক্ষণ করবি ! চোখের সামনে দেখতে হবে ! শোনো রহমত মিঞা বাঙ্গালীবাবুদের জন্য মটনের ব্যবস্থা করে এলাম। শোনো রহমত মিঞা, তোমার মধ্যে জাত মারার ব্যামো আছে। অগো পাতে যদি বিফ পড়ে তবে তোমার মুণ্ডু ছিঁড়ে ফেলব। বোঝলা।'

রহমত গ্যালির ভাণ্ডারি। অর্থাৎ কুক। সে সারেঙসাবকে যমের মতো ভয় পায়। সারেঙসাব ভাণ্ডারির কাজে ক্ষুব্ধ হলে তার 'নলি' মন্দ করে দিতে পারেন। 'নলি' মন্দ করে দিলে পরের সফরে জাহাজ পাওয়া কঠিন। রহমত শুধু বলেছিল, জী সাব।'

রহমত এত বিনয়ী কথাবার্তায় যে, মুণ্ডু ছিঁড়ে নিলেও জী সাব, না নিলেও।

সারেঙসাব ফের বলেছিলেন, শোনো রহমত, আলাদা ডেকচি রাখবে। ভাত ডাল সব্জি এক লগে পাকাবে। মটন আলাদা, বিফ আলাদা। কি, বুঝলে কিছু। আলাদা ডেকচিতে পাকাবে।'

'আজ্ঞে মটন আলাদা, বিফ আলাদা।'

'গড়বড় করে ফেল না যেন !'

'জী না সাব।'

গোপাল বুঝতে পারত না, তাদের জাত ধর্ম রক্ষার দায় কে যে সারেঙসাবকে দিল। মানুষটার এই ধর্মভীরু স্বভাবই গোপালকে এক লহমাতে কিছুটা যেন কাছে টেনেছিল। জাহাজে ওঠার আগে সারেঙদের নির্যাতনের কথাই শুধু শুনেছে—জাহাজি-সারেঙদের নিয়ে তার ভয় কুণ্ঠা কম ছিল না—কিন্তু জাহাজে উঠে এমন বিপরীত চিত্র সে দেখবে আশাই করতে পারেনি। সারেঙকে তোয়াজ করে চলতে না পারলে, পরের সফরে জাহাজ পাওয়া কঠিন। তারা চটে গেলে, জাহাজের কাপ্তানরা চটে যান। যদি কোনরকমে কাপ্তানের কানে পৌঁছে যায়—বেয়াদপ আদমি, তবেই হয়েছে। সি ডি সি মানে 'নলি'তে কালো দাগ পড়ে যাবে। কাজেই সারেঙসাবকে জাহাজিরা এত তোষামোদ করে কেন জাহাজে উঠেই গোপাল তা টের পেয়েছিল।

তার হয়েছে উল্টো। সারেঙসাব তাকে নিয়ে কেন যে এত অস্বস্তিতে আছেন বুঝতে পারছে না। বাবেতি খুব ভাল ছেলে। সে তো তার মায়ের

কথা শুনে কেঁদে ফেলেছিল। বাবেতির মা নেই, মা না থাকলে এ-বয়সে কেউ থাকে না—কিন্তু বাবেতি কেন যে জাহাজে উঠে আসে! বাপের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়—ওর মা কোথায় থাকে—এ-সব জানার কৌতূহল তার আছে—তবে বাবেতি নিজ থেকে না বললে, সে প্রশ্ন করতে পারবে না—করার অধিকারও নেই। পারিবারিক ঘটনা, খুবই ব্যক্তিগত এবং গোপন। সে এমন কিছু জানতে চাইবে না, যাতে বাবেতি কিংবা তার বাবা ছোট হয়ে যান।

সে নিজের ফোকসালে শুয়ে কত কিছু যে ভাবছিল। জাহাজ কেপটাউনে যাচ্ছে। দু তিন দিনের ভিতরই জাহাজ বন্দর ধরবে। ফাঁক পেলেই গোপাল উপরে উঠে রেলিঙে দাঁড়িয়ে থাকে। দু-দিন হয়ে গেল, বাবেতিকে সে কোথাও দেখছে না। দেখছে না, না, বাবেতির সঙ্গে দেখা হয়ে যায় এই ভয়ে সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ওয়াচ থেকে টানেল পথে উঠে আসে। কারণ আতঙ্ক বোট-ডেকে উঠলেই বাবেতির সঙ্গে হয়তো দেখা হয়ে যাবে।

বাবেতি তার বাংকারে ঢুকে যাওয়ায় সারেঙসাবও যেন খুব বিপাকে পড়ে গেছেন। 'পরি' শেষে উঠে এলেই সে দেখতে পায় মাস্তুলের নিচে সারেঙসাব দাঁড়িয়ে। আড়ালে ডেকে নেবার জন্য এই অছিলা। তাঁর তখন এক কথা, আজ নেমেছিল! কিরে তোকে কিছু বলল! আরে কথা বলছিস না কেন?

সে বলত, 'না নামেনি।'

যেন তিনি হাফ ছেড়ে বাঁচতেন। বলতেন, 'আল্লা মুবারক।' আল্লাই তাকে রক্ষা করছেন। সারেঙসাবের কথাবার্তায় এমনই মনে হত তার। বাবেতিকে নিয়ে এত ত্রাসে পড়ে যাওয়া গোপালের পছন্দ হত না। বাবেতি তার সঙ্গে কখনো খারাপ আচরণ করেনি। বাবেতি ভাবে সে একজন অশ্বারোহী সৈনিকের পুত্র। সে গোপাল নয়, রুডি।

জাঁদরেল কাপ্তানের পুত্র বাংকারে ঢুকে যাওয়ায় জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, অথবা কোনো রহস্য যদি এর সঙ্গে যুক্ত হয় গোপাল নাচার। বাবেতির চোখে জলও দেখেছে। সে আর যাই ভাবুক, বাবেতিকে শয়তান ভাবতে পারে না। ঐ দু-বার কুকুর লেলিয়ে দেওয়া ছাড়া বাবেতি তার কোনো অনিষ্ট চিন্তা করেনি।

যাই হোক বাবেতির সঙ্গে দেখা না হওয়ায় সারেঙসাব খুশি। সেও কিছুটা হাল্কা। তবু মাঝে মাঝে বোট-ডেকে তার চোখ চলে যায়। দূরে কে হেঁটে যায়, বাবেতি নয়তো! না, সেজ-মিস্ত্রি। বয়লার সুট পরে তিনি হয়তো ইনজিনরুমে নেমে যাচ্ছেন। বাবেতিকে খুব সুন্দর লাগে। সুশ্রী মুখ, সোনালি

চুল। জাহাজের নীরস এক ঘেয়ে যাত্রায় কিছুটা যেন বাবেতি মরুদ্যানে মতো।

জাহাজ যত ঘাটের দিকে এগোচ্ছে, গোপাল দেখছে তত তার গতিবিধি নজর সারেঙসাব বেশি লক্ষ্য করছেন।

'আচ্ছা ঝামেলা। এত খবরদারি কাহাতক ভাল লাগে। জাহাজ ঘা লাগতেই তার উপর কেন যে সারেঙসাব ক্ষেপে গেলেন। অপরাধ, থার্ড মে তার কেবিনে ঢুকে কানে কি সব মন্ত্র পড়ে গেল—তাতেই না কি সে উতলা। এত উতলা হাওয়া ভাল না। মরবে। জাহাজ খারাপ জায়গা, কিনার আর খারাপ জায়গা ছেলেটা কেন কিছুতেই বুঝছে না। এমন সব কথাবার্তা কানে আসছে গোপালের।

গোপাল সারেঙসাবকে রাগিয়ে দিয়েও মজা পায়।

'আমি কি করব। থার্ড-মেটকে বলুন ! ও আমাকে বাবা বাবা করে জাহাজে চষে বেড়াবে, আমি সাড়া না দিয়ে পারি।' থার্ড-মেট ওয়েলসের মানুষ, আমুদে এবং জাহাজে হৈ চৈ করে থাকতে ভালবাসে। না হলে তার নাম নিয়ে বা বার তাকে প্রশ্ন করত না। নাম তার বাবা বলাতে কি খুশি ! সেই মানুষ যদি তার ফোকসালে চলে আসে---কি করতে পারে।

সারেঙসাবের ক্ষোভ, 'তুই গোপাল ডাকল আর কুকুরের মতো সুর সুর করে চলে গেলি ! ওর মতলব ভাল না বলে দিলাম।' সারেঙসাব জানেনই না স্টিফেন বলে তার এক বন্ধু জাহাজঘাটায় দেখা করতে আসবে। স্টিফেন ভারতীয়দের সম্পর্কে কি সব পড়াশোনা করছে। স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। গোপালের মনে হয় জাহাজের সব চেয়ে ছোট্ট নাবিক বলেই থা মেট তাকে পছন্দ করে। ভাবতেই পারে, মা বাবা ভাইবোন ফেলে কত দূ সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছে। আর তার কাজটাও তো খাটুনির। তা-ছাড়াও সে বে হাসিখুশি, ব্যাজার মুখে থাকতে পারে না। থার্ড-মেটের সঙ্গে দোস্তি হতে পারে। এই দোস্তি নিয়েও তাঁর নানা বিভ্রম। থার্ড-মেটের কেবিনে গেলে ক্ষুব্ধ। তার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দেন। তারপর শুরু হত সারেঙসাবের মা অভিমান ভাঙ্গাবার পালা। সে বদনাতে করে অজুর জল, নামাজের মাদু ডেকে পেতে রাখলে বালকের মতো খুশি সারেঙসাব। তখন তাঁর এক কথা 'জাহান্নমে যাস না বাপজান, জাহান্নমে যাস না।'

জাহান্নমটা কি গোপাল কিছুতেই বুঝে উঠতে পারত না। তবে এটা বুঝত সে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এমন একটা সংশয়ে সারেঙসাব ভুগছেন।

আসলে জাহাজে সব চেয়ে ছোট্ট নাবিক সে। লম্বা চওড়ায় জাঁদরেল। [মু]খের রেখাতে তার কোনো যাদু থাকতে পারে—যে কারণেই হোক—এও হতে [প]ারে, বৃটিশ অফিসাররা এত দিন নেটভ জাহাজিদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে [এ]সেছে। জাহাজিদের আচরণে হয়তো কোনো আভিজাত্য ছিল না। কাজ [চ]ালাবার মতো দু-চারটে ইংরাজি বুলি সম্বল—সেক্ষেত্রে গোপাল বেশ কথা [ব]লে—তার ইংরাজি বলার ঢঙ নজর কাড়তে পারে—হয়তো এ-জন্য [গো]পালকে নিয়ে থার্ড-মেট ঠাট্টা তামাসা করত—গোপালও থার্ড মেটকে নিয়ে [র]ঙ্গ তামাসা কম করেনি। সে যে গোপাল, বাবা তার নাম নয়—থার্ড মেটকে [আ]র বিশ্বাসই করানো গেল না।

আর এই বাবা ডাকই কাল হল গোপালের। থার্ড-মেট এসে ফোকসালে [উঁ]কি দিত। বলত, বাবা কোথায় ?

ব্যাস সবাই হা হা করে হেসে উঠত।

বিকাশদা বলত, 'ওরে আমার বাবা, কোথায় গেলি। থার্ড-মেট তোকে [খুঁ]জছে।'

তাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা হচ্ছে—থার্ড-মেট একদম আমল দিত না। কেন [হা]সছে, বোঝার চেষ্টা করত না। বাবা কোথায়, বাবাকে দরকার। বাবার [বা]ংকারে কে না কি ঢুকে যেতে চায় ! কে সে ! কেন ঢুকে যেতে চায় !

দু-কান না হয়, সারেঙ সাব এমন চান। কারণ কাপ্তানের পুত্রকে নিয়ে কথা উঠলে ধকল সামলানো দায়। কে বলেছে, কাপ্তানের পুত্র গোপালের বাংকারে [ঢু]কে গেছে ! কার এত মাথা ব্যাথা ! এই ঢোকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে ! বিকাশদা [প]র্যন্ত বলতে সাহস পেত না, কাপ্তানের পুত্র বাংকারে ঢুকে হুজ্জোতি করেছে [গো]পালের সঙ্গে। কারণ তার ঢুকে যাওয়াটাই একটা অবাস্তব ব্যাপার। সে [কা]রণে কাপ্তানের পুত্রের কথা উঠলে সবাই চুপ মেরে যেত।

গোপালের খারাপ লাগত—থার্ড-মেট তার বাবার বয়সী—তাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা ! আসলে কিছুটা পাগলাটে স্বভাবের। না হলে, জাহাজিদের গ্যালিতে [পা]উরুটি নিয়ে বসে থাকে ! কারি মাংতা বলতে পারে ! দু-চারটে হিন্দি শব্দ সে [ব]লতে পারে। অফিসারদের জন্য—ডাইনিং হল, মেসরুম মেট—কত সব এলাহি ব্যবস্থা। অথচ মাঝে মাঝে থার্ড-অফিসাররের মাথায় ক্যাড়া ঢুকে [যে]ত—কারি, কারি মাংতা বলে চিৎকার করত। ডেকে পা ছড়িয়ে বসে [মা]ংসের ঝোলে রুটি ভিজিয়ে খেত। সারেঙসাব মজা করতেন, ভয় দেখাতেন, [সা]ব কাপ্তান আসছে ! যেন জুজুর ভয়। কাপ্তান দেখতে পেলে আস্ত খেয়ে

ফেলবে তোমাকে ! সঙ্গে সঙ্গে আরও আড়ালে গিয়ে গোস্ত-রুটি চিবাতো থার্ড মেট।

বিকাশদা বলত, 'সাহেবদের ইজ্জত রাখলে না থার্ড !' থার্ড এতেও আমল দিত না।

গোপাল একদিন ভুল শুধরে তার নাম বললে, সে হা হা করে হেসে উঠেছিল। বলেছিল, বাবাই ভাল, ফাদার মিনস বাবা। ইয়ে ! মাই ফাদার ! গ্র্যান্ড ! কেমন কিছুটা তাজ্জব হয়ে গেল গোপালকে দেখতে দেখতে।

সেই থার্ড অফিসার গোপালকে কেবিনে নিয়ে গিয়ে তার বন্ধুব সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল।

সাহেবের বন্ধুটি কেপটাউনে চাকরিসূত্রে সম্প্রতি এসেছে। জাহাজ আসছে শুনে ঘাটে হাজির। এখানে এসে প্রথমে উঠেছিল ইউনিভার্সিটি মাউন্টেন ক্লাবে। পরে ওলসেনের গলিতে বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। স্ত্রী কন্যাকে দেশ থেকে নিয়ে এসেছে। থার্ড অফিসার পিটার বন্ধুকে পেয়ে বেজায় খুশি। বোধহয় সাহেবের বন্ধু ভাগ্য খুবই ভাল।

গোপাল রাজি হয়েছে, সেও সাহেবের সঙ্গে বেড়াতে যাবে। বর্ণ বিদ্বেষ আছে। তবে গোপালকে স্প্যানিশ বলে চালিয়ে দিতে অসুবিধা হবে না, পিটার বুঝেসুজেই সঙ্গে নিতে চায়। গোপালেরও ইচ্ছা, শহর না দেখলে, ডাঙ্গায় নেমে ঘুরে বেড়াতে না পারলে—জাহাজি হওয়া কেন। এতদিন ধরে, সেই কবে যেন জাহাজে উঠেছে—তারপর দিন যায়, শুধু নীল জলরাশি, অনন্ত আকাশ, ঢেউ আর সমুদ্র ঝড়, কখনও অ্যালবাট্রস পাখি ডানা মেলে দেয় মাথার উপর—আর কোনো জীবনের চিহ্ন নেই। এক ঘেয়ে সমুদ্রযাত্রায় সেও কম উতলা নয় ডাঙ্গা দেখার জন্য। প্রপেলার শুধু জল ভাঙে—ক্ষুব্ধ জলরাশি পড়ে থাকে পিছনে। সেতো কিনারায় নামার জন্য পাগল হয়ে আছে।

জাহাজ জেটিতে ভিড়ে আছে। মাল ওঠা নামা চলছে। সামনে পাহাড়শ্রেণী—তার উপত্যকায় লাল নীল কাঠের বাড়ি—কেমন ছবির মত হয়ে আছে চোখের সামনে। নিগ্রো কুলিকামিনদের ভিড় বন্দরে।

এই বেড়াতে যাওয়া নিয়েও সারেঙ ক্ষুব্ধ। কেন সে পিটারের সঙ্গে কিনারায় বেড়াতে যায়।

গোপাল লক্ষ্য করত বিকাল হলেই সারেঙসাব কেমন অস্থির হয়ে উঠতেন। ফোকসালে পায়চারি করতেন। জাহাজের কাজ কাম সেরে গোপাল ছুটে আসত ফোকসালে। দ্রুত বালতি হাতে বাথরুমে ঢুকে যেত।

সে সারেঙসাবকে আমল দিতে চায় না। সবতাতেই বাধা। কত সহ্য হয়। আবার কখনও হয়তো সারেঙসাব ভাবতেন, যা ইচ্ছে করুক। তাঁর কি। তিনি যথেষ্ট নির্মোহ থাকারও চেষ্টা করতেন—কোরাণশরিফ নিয়ে বসতেন, পাঠ করতেন। ছুটিছাটার পর জাহাজিরা যেখানে খুশি যেতে পারে। তার ওটা দেখার নয়। কাজকামের সময় জাহাজে হাজিরা দিলেই হল। রাত কাটিয়ে এলেও তাঁর প্রশ্ন করার কোনো এক্তিয়ার নেই।

কিন্তু সারেঙসাব শেষে বুঝি আর পারতেন না। সব ফেলে দৌড়ে যেতেন গ্যাংওয়েতে। কিন্তু ততক্ষণে গোপাল সিঁড়ি ভেঙ্গে জেটিতে নেমে গেছে। পিছন ফিরে দেখারও সময় নেই। ডাঙ্গার নেশায় সে দ্রুত ক্রেন পার হয়ে লাফিয়ে উঠে গেছে বন্দরের সদর রাস্তায়।

গোপাল ফিরে এসে শুনতে পেত, সারেঙসাবের চোটপাটে সবাই অস্থির। তাকে তিনি কিছু বলতে কেন যে সাহস পেতেন না। কারণ প্রশ্ন করলেই গোপালের উত্তর—আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন ? সাহেবকে বলুন, কোথায় নিয়ে যায়। তাকে বলতে পারেন না। কেবল যত চোটপাট আমার উপর। নরম মাটি পেলে সবাই আঁচড়াতে চায়।'

সারেঙসাব একদিন অগত্যা গ্যাংওয়েতে হাজির। থার্ড সেজেগুঁজে বের হয়ে এসেছেন। গোপাল আগেই জেটিতে নেমে দাঁড়িয়ে আছে। সারেঙসাব বললেন, 'সাহেব ওকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ ?'

সেদিন গোপাল কেন যে বোটডেকে দেখে ফেলল, বাবেতি দাঁড়িয়ে আছে—সেও লক্ষ্য করছে, গোপাল কিনারায় নামছে। বাবেতি কি রোজই তবে আড়াল থেকে লক্ষ্য করে ! করতেই পারে। ডাঙ্গার নেশায়, সে খেয়ালই করেনি, আর কে তার এই নেমে যাওয়া নিয়ে অস্থির হয়ে পড়ছে। আবার মনে হয়, জাহাজের কে কোথায় যায়, এবং কখন ফিরে আসে, সঙ্গে কোন নারী নিয়েও উঠে আসে কেউ, কেবিনে মাতলামি হৈ চৈ, নেশা কি না হয়। জাহাজিদের এটা স্বভাব। কাপ্তানও তখন তার সংরক্ষিত এলাকা থেকে বোধ হয় বের হন না। কি দৃশ্য দেখবেন, জাহাজিদের দোষ দিয়ে তো লাভ নেই—জাহাজি জীবনে এটাই স্বাভাবিক—বরং কেউ চুপচাপ ডেকে বসে থাকলে, ফূর্তিফার্তা না করলে, কিনারায় না নামলে অস্বাভাবিক ব্যাপার।

গোপালের কথা সারেঙসাব বিশ্বাস করতেন না।

সে নিছক বেড়াতেই যাচ্ছে বিশ্বাস করতেন না।

সারেঙসাব বললেন, 'সাহেব, ওকে কোথায় নিয়ে যাও। বন্দরের

ভুলভালাইয়ায় না রাস্তা হারিয়ে ফেলে। বয়েসটাতো ভাল না। বয়েসটারই দোষ। ওর মা বাবার কথা ভেব।

কেন যে তিনি কথায় কথায়, তার মা বাবাকে টেনে আনতেন গোপাল বুঝত না। 'তোর মা বাবার কথা মনে থাকে না! দেশের কথা মনে থাকে না। বাড়িঘরের কথা মনে হয় না!'

বেশি চোটপাট করলে গোপালের এক জবাব, না মনে থাকে না। সারেঙসাব তখন রেগে মেগে কোনো কথা না বলে ফোকসালে ঢুকে যেতেন। এত অপমান! ডাঙ্গার নেশায় মা বাবার কথা মনে থাকে না! তুই মানুষ!

রাত করে ফিরলে গোপাল দেখতে পেত তিনি ডেকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। কোনো কথা না। অপেক্ষার যেন শেষ। যাক ফিরে এসেছে। হারিয়ে যায়নি। তিনি চুপচাপ ফোকসালে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিতেন। গোপালের ভাল মন্দ নিয়ে একটা কথাও বলতেন না।

গোপাল একদিন ফিরে এসে দেখল, সারেঙসাব তার ফোকসালে বসে আছেন। তাকে দেখেই যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। বললেন, 'বাপজান শোন!'

গোপাল বলল, 'যান, আমি যাচ্ছি।'

আসলে সারেঙসাব তাকে আড়ালে ডিকে নিয়ে যেতে চান। কি বলবেন তাও যেন জানা। সে খুব একটা গ্রাহ্য করছে না। আর তখনই বিকাশদা হাজির।

'গোপাল একটু সকাল সকাল ফিরতে পারিস না! দেখছিসতো সারেঙের কাণ্ড। এই নিয়ে সিঁড়িতে পাঁচবার খোঁজ নিয়েছে। এক কথা, ফিরল! ফেরেনি বললেই মুখ গোমড়া। এত রাতে কোথায় ঘোরে! কি করে! সাহেবের কি কাণ্ডজ্ঞান নেই। ছেলেমানুষ সে। বুদ্ধিসুদ্ধি কম। তাকে নিয়ে এ-ভাবে রাতে জাহাজের বাইরে থাকা উচিত?'

গোপাল উত্তেজিত। বলল, 'উচিত কি অনুচিত সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেই পারে। আমাকে কেন। সে ব্যাপারে তো মুরদ নেই। অষ্টরম্ভা। যত তাপ উত্তাপ আমার ঘাড়ে।'

তারপরই মনে হয়, জাহাজে তার ফেরা নিয়ে কেউ তো অপেক্ষা করে না। কেউ তো জেগে থাকে না ফোকসালে। তখনই কেন যে তার মন নরম হয়ে যায়। বাবার কথা মনে হয়। শহর থেকে ফিরতে দেরি হলে, বাবা রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন লণ্ঠন হাতে। রাস্তাটা ভাল না। দুর্ঘটনার তো শেষ

নেই।

সিঁড়ি ধরে গোপাল উঠে গেল। তিনি মোড়ায় বসে নিবিষ্ট মনে তামাক খাচ্ছেন। গোপাল ফিরে আসায় তাঁর দুর্ভাবনার শেষ। পরনে খোপকাটা লুঙ্গি। গায়ে ফতুয়া। পোর্ট-হোলের পাশে কাবা মসজিদের একটা ক্যালেণ্ডারের পাতা উড়ছে। মাথায় বুটিদার নামাজি টুপি। পায়ে খড়ম। ঠাণ্ডা পড়েছে বলে একটা উলের চাদর গায়।

ভিতরে ঢুকলে গোপালের দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'সে তোকে নিয়ে কোথায় যায়! সকালে বের হলি, ফিরলি মধ্যরাতে। তোর বাপ নানা জাহাজে থাকলে পারতিস! তোর মা বাবার কথা মনে থাকে না!'

কেন যে তিনি গোপালকে কথায় কথায় তার মা বাবার কথা মনে করিয়ে দেন সে বোঝে না। তবে বোঝে, জাহাজে ঘুরে বেড়ালে নষ্ট হওয়া সোজা। কার্নিভেল, জুয়া, মদ আর মেয়েমানুষের ছড়াছড়ি। সে লোভে পড়ে যেতেই পারে। বাবা মা ভাই বোন মানুষকে কতদিক থেকে যে রক্ষা করে!

'আমার কিন্তু ভাল ঠেকছে না গোপাল! বলতে পারিস আমি তোর কে! তুই জবাব নাও দিতে পারিস। যা মনে হয়েছে বললাম।' তাঁর চোখ কেমন কথা বলতে গিয়ে ঝাপসা হয়ে গেল। গোপাল তো জানে না, একমাত্র পুত্র তাঁর সঙ্গে জাহাজে উঠে এ-ভাবেই ঠিক তার বয়সেই বন্দরে নিখোঁজ হয়ে গেছিল।

গোপাল বলল, 'কেন ভাল ঠেকছে না, কি করেছি বলুন।'

'কিছু করিসনি। কিন্তু করতে কতক্ষণ। আমার কথা না হয় বাদ দে। কিন্তু তোর বাবা মা-র কথা ভাববি না।'

গোপাল আর কি বলবে! সব কথাতেই বাবা মা-র কথা টেনে আনছেন। বার বার এক কথা বললে কার না রাগ হয়। সে বিরক্ত হয়ে বলল, 'জাহাজে উঠলে কারো কি আর বাবা মা থাকে! বলুন!'

'থাকে না বলেই তো ভয়। থাকলেও শেষ রক্ষা হয় না।' এই শেষ রক্ষা হয় না কেন বললেন গোপাল বুঝতে পারল না। তিনি কি ঘরপোড়া গরু! তিনি কি... না সে আর ভাবতে পারছে না। সন্তান স্নেহ প্রবল হলে মানুষের এই হয়। এই প্রাচীন নাবিকের মধ্যে প্রচ্ছন্ন কোনো ব্যাথাতুর পিতৃহৃদয় কি জেগে আছে! তাঁকে সব খুলে বললেও তিনি বিশ্বাস করবেন না। সে বেটসি উপসাগরের পাশে উঁচুনিচু রাস্তায় হেঁটে গেছে—গাছ অরণ্য মানুষজন দেখার মধ্যে যে আনন্দ আছে—তিনি বিশ্বাস করবেন না। কি সুন্দর জায়গা।

পাহাড়ের কোলে গাছপালার ছায়ায় ছোট ছোট হলিডে-হাউজ—সামনে দিগন্ত প্রসারিত সমুদ্র, আর ঝড়ো হাওয়া। কত পর্যটক বেড়াতে বের হয়ে পড়েছে। পাশে মারগারেট, স্টিফেনের তরুণী মেয়ে। তরুণী পাশে থাকলে কার না হাঁটতে ভাল লাগে!

সারেঙসাব কি জানেন, সে বেড়াতে গেলে মারগারেট বলে কোন নারী তার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়! তিনি কি সে-জন্য ভয়ে কাবু!

অবশ্য সে বোঝে নারী বড় কুহকিনী। সে তো কোনো অপরিচিত নারীর সঙ্গে কখনও ঘনিষ্ট হয়নি! বিশেষ করে সমবয়সী নারী যদি তার সঙ্গে হেঁটে বেড়ায় তবে তো কোনো অলৌকিক মায়া—মারগারেট যে তাকে টানছে সে টের পায়। সে কি তাকে দেখার জন্য কিংবা তার সঙ্গে বেড়াবার নেশাতেই রোজ নেমে যাচ্ছে। ছুটে যাচ্ছে। থার্ড তাকে নিয়ে না গেলেও সে কি তাকে দেখার জন্য পালিয়ে নেমে যাবে!

সারেঙসাবকে সে যে কি বলে!

তিনি তো ঘাটে নামলেনই না। যারা বিকালে কাজ শেষে স্নানটান সেরে বন্দরে নেমে যায় তাদেরকে তিনি ভাল চোখে দেখেন না। তবে তাঁরও প্রয়োজন থাকে—যেমন মাঝে মাঝে গোপালের হাতে টাকা পয়সা দিয়ে বলেন, ফলটল কিছু আনিস।

গোপাল বোঝে সারেঙসাবকে দোষ দিয়ে লাভ নেই—জাহাজিরা বন্দরে নেমেই মেয়ে ধরার তালে থাকে। গোপাল যে নেই কে বলবে! বন্দরে গেলে অনেকে পাহাড় টাহার কাছে পেলে উঠে যায়। কেউ খোঁজে—সস্তা কি জিনিস আছে। এক বন্দর থেকে কিনে অন্য বন্দরে বিক্রি। এতে বেশ লাভ থাকে। কেউ সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেট থেকে পুরনো উলেন জামা প্যান্টও কেনে। বন্দর বুঝে বিক্রি করতে পারলে বেশ লাভ থাকে। তা-ছাড়া জাহাজ যদি কোনো দ্বীপ টিপে যায়—দ্বীপবাসীরা সস্তায় পুরোনো জামা প্যান্ট, ফ্রক, গাউন জ্যাকেটের খোঁজে জাহাজেও উঠে আসে। কেউ বেশি চতুর হলে দ্বীপবাসীর গরীব যুবতীকে ফ্রক উপহার দিয়ে রাত কাটিয়েও আসে। গোপাল যে তেমন কিছু করছে না কে বলবে! আসলে রশিদ বাহার কিংবা বিকাশদার সঙ্গে বের হলে তিনি তাদের চোখ রাঙাতে পারতেন। কিন্তু জাহাজের থার্ড-মেটকে তিনি কিছুতেই চোখ রাঙাতে পারেন না! বলতে পারেন না, না সাব, আপনি যান, গোপাল যাবে না।

এই হয়েছে তাঁর জ্বালা। ফলে যত আক্রোশ গোপালের উপর। জাহাজে

কত জাহাজি এই করে দুরোরোগ্য ব্যাধির কবলে পড়ে যায়, কেউ পাগল হয়ে যায়, কেউ জাহাজ থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা পর্যন্ত করে. এ-সব ত্রাসের কথাও গোপালকে বোঝালেন।

গোপালের এক কথা, 'থার্ডকে বলুন। আমাকে বলে কি লাভ!'

স্টিফেন যে একজন ভারতীয়কে হাতের কাছে পেয়ে—নানা খোঁজখবর নেবেন, সে তো জানা কথা। কারণ তিনি প্রাচ্য বিদ্যা বিশারদ। এ-জন্যই হয়তো থার্ডকে দিয়ে গোপালকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। অবশ্য গোপাল এখনও পর্যন্ত তেমন কিছু তার সাহায্যে আসতে পারেনি। ভারতীয় তন্ত্রসাধনা সম্পর্কেও গোপালের কোনো ধারণা নেই। তবে শ্মশানে সাধু সন্ন্যাসী এবং ভৈরবী দেখেছে। ওদের দেখলে তার ভয়ই করত। তার চেয়ে বেশি কোনো কৌতূহল তার ছিল না।

গোপাল ফিরলেই সারেঙসাবের বাধা গৎ হয়ে গেছে—'কোথায় গেছিলি? এত রাত হল!'

'গ্রেট বারক্ রিভার দেখতে গেছিলাম।'

'সেখানে কি আছে?'

'নদী আছে।'

'নদী দেখতে তুই এতদূর গেছিলি! ফিরলি এত রাত করে! নদী কি আমাদের দেশে নেই! নদী কি দেখিসনি!

গোপাল কি যে বলে!

'দেখব না কেন? দেখেছি। কিন্তু এখানে এলাম, এত কাছে এলাম, এত বড় নদী না দেখে চলে যাব। সব নদী সমান হয় বলুন! কত বড় বড় পাহাড় ডিঙ্গিয়ে নেমে এসেছে নদী—তার দু-তীরে কত বৃক্ষচ্ছায়া বলুন! ওটেনিকা পাহাড়ের নাম শুনেছেন! আপনাকে নিয়ে গেলে বুঝতে পারতেন কত বড় নদী। দারুণ। দারুণ। একদিকে পাহাড়, পাশে নদী, দু-পাড়ে বালুবেলা। ছোট ছোট জালে মাছ ধরছে জুলু মেয়েরা। কালো কস্টিপাথরের রঙ জানেন। কি মজবুত গড়ন। চোখ ফেরানো যায় না!

'মেয়েরা মাছ ধরছে!' কেমন অবাক প্রশ্ন সারেঙসাবের।

'জুলু মেয়েরা মাছ ধরছে। স্টিফেন জুলু পরিবারের একটা বিয়েতেও আমাদের নিয়ে যাবে বলেছে।'

'স্টিফেন কে?'

'থার্ড-মেটের বন্ধু।'

সারেঙ-এর বিচলিত কথাবার্তা—'নিজের দেশ ফেলে, এখানে মরতে এসেছে কেন ? এই নরখাদকের দেশে !'

'আপনি কেন জাহাজে এসেছেন ! জাহাজে উঠলে ধর্ম থাকে না, নিজেই তো বলেন !'

'অঃ।' সারেঙসাব আর কোনো প্রশ্ন করার অজুহাত যেন খুঁজে পেতেন না। কেমন থম মেরে যেতেন। তারপর ভুল স্বীকার করে বলতেন, 'ঠিক আছে, আর কোথাও যাসনি তো !'

'গেছি তো।'

'সেটা কোথায় ?'

'খারাপ জায়গায় যাইনি চাচা। থার্ড মদ পর্যন্ত খায় না জানেন !'

'বলিস কি ! সাহেব মানষু মদ খায় না, হতেই পারে না। ওদের কোনো জাত আছে, ধর্ম আছে, মদ মেয়েমানুষ ছাড়া তারা কিছু বোঝে ! পাগলা হয়ে যায় জাহাজে—মেয়েছেলে পেলে ছিঁড়ে খুড়ে খায়। ওদের আবার সাফাই গাইছিস !'

'সাফাই গাইব কেন ! সবার কি এক নেশা থাকে ! থার্ড জাহাজ থেকে নেমে সোজা চলে যান স্টিফেনের বাড়িতে—তারপর সবাই মিলে গাড়িতে ঘুরতে বের হই। কই কখনও তো দেখলাম না, থার্ড বেচাল।'

'আর কি করলি !' সারেঙ সব না শুনে গোপালকে উঠতে দেবেন না।

'আর ! আর !' গোপাল ঢোক গিলল। তারপর বলল, 'আটলি গাছের নিচে বসে কফি খেলাম। দূরে নদীর লেগুন। লেগুনের পাড়ে অরণ্য। সেখানে হরিণ ঘুরে বেড়াচ্ছে। গাছ, সবুজ প্রান্তর, হরিণের ছোটাছুটি ওঃ ভাবা যায় না। জানেন রাস্তায় যেতে পাহাড়ের উপর ছোট ছোট লাল নীল কাঠের বাড়ি—মিকি মাউসের মতো। ফুলের বাগান। এত্ত বড় গোলাপ।'

সারেঙসাব খুব দিগ্গজের মতো বললেন, 'কাঠের বাড়ি-ঘর আমাকে চেনাবি। পাহাড়ী বন্দরে তো কাঠের ঘরবাড়িই বেশি থাকে। তার জন্য রাস্তায় নেমে যাবার কি আছে ? জাহাজে বসেই দেখা যায়। তুই আমাকে বাড়িঘর চেনাবি। আমি আলতাফ মিঞা তোর বয়সে সমুদ্রে সফর করি। এখনও করছি। কোথায় কি আছে থাকে আমি জানি। আমাকে তুই পাহাড় বাড়িঘর চেনাতে যাস না। আরও কিছু থাকে, বুঝলি। আছে বলেই পাগল হয়ে যায় মানুষ। বন্দরে নেমে মাথা খারাপ করে ফেলে।

'সেটা কি ?' গোপাল এমন প্রশ্ন করতে পারত !

কিন্তু গোপালের কথা বলতে আর ভাল লাগছে না। এখন শুয়ে পড়তে পারলে বাঁচে। আলতাফ মিঞাকে তার এই ঘুরে বেড়াবার আনন্দের কথা বলে লাভ নেই। সে কি দেখল, তা নিয়ে আলতাফ মিঞার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। তাঁকে সে বোঝায় কি করে সমুদ্রের ধারে, পাহাড়ের উঁচু নিচু ধাপে বাগান বাড়ি। জিনিয়া, ক্যানাস ফুলের বেড—আর সব সাদা স্কার্ট পরা কিশোরী যখন পাহাড়ের পথ ধরে ছুটে উপরে উঠে যায়—তখন তো তার সেখান থেকে নড়তেই ইচ্ছে হয় না। পিছু ধাওয়া করতে ইচ্ছে হয়। যা হয় হোক, পরিণতির কথাও ভুলে যায়, যেন সেই নারী তাকে ক্রমাগত টেনে নিয়ে যেতে চায় দূরবর্তী কোনো নীহারিকায়। স্টিফেনের মেয়ে মারগারেটের কথা তোলাই গেল না। কথা আছে সে আর থার্ড সামনের শনিবারে বের হয়ে পড়বে। পর পর দু-দিন ছুটি। মারগারেট সঙ্গে থাকবে। সে কেমন অধীর হয়ে উঠল সেই ভ্রমণের কথা ভেবে। চোখমুখ তার জ্বালা করতে থাকল। কান গরম হয়ে গেল। মাখনের মতো নরম এক সুহাসিনী। কেবল তাকে দেখলেই হাসে। তাকে দেখলেই ছুটে আসে। হাত তুলে চুমু খায়। ভাবলেই কেমন অস্থির হয়ে পড়ে। সঙ্গে দূরবীণ নেবে, জঙ্গলে তারা গণ্ডার দেখতে যাবে।

এ-বড় জ্বালা, জ্বালা তার কথা ভাবলে। গোপাল উঠে পড়ল। মারগারেটের পুষ্ট শরীর এবং সুন্দর স্তনের ভাঁজ তাকে বিছানায় নিয়ে যাচ্ছে—এবং গভীর রাতে তার কথা ভেবে অস্থির হয়ে উঠলে আর সে কিছুতেই শুয়ে থাকতে পারে না।

সামনের কটা দিন যেন অপেক্ষা করাই কঠিন। কাছে নয় যে সে একা চলে যাবে। রাস্তাও ভাল চেনে না। তার কথাও সবাই ভাল বোঝে না। থার্ড নিয়ে না গেলে সে যেতে পারে না। যে কাজের উপযোগী ভেবে তার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে স্টিফেনের, তার সে কিছুই প্রায় জানে না। তবু কেন যে সে আসার সময়, মারগারেট তার বাগান থেকে একটা তাজা গোলাপ তুলে দেয়। ওর কোটের পকেটে ফুল গুঁজে দেবার সময় মুখ কপাল বুকের কাছে নুয়ে পড়ে। ওর তখন যে কি হয়! স্থির থাকাই কঠিন। মারগারেট জানেই না, ফুলের কদর সে বোঝে না। গভীর রাতে প্রায়ই সে ফুলটি ছিঁড়ে খায়।

গোপাল একরাতে ধরা পড়েও গেল।

হারে গোপাল, 'তোকে ফুল কে দেয়?'

গোপাল পড়ে গেল মহাফাঁপড়ে। আলতাফ মিঞা ইচ্ছে করলে কিনারায় যাওয়া বন্ধ করে দিতে পারেন না ঠিক, তবে অশান্তি করতে পারেন। জাহাজে

কার কি এক্তিয়ার সারেঙ ভালই জানে। তবে এ-ও জানে, গোপাল অপবিণত অপরিনামদর্শী যুবক। এবং অভিভাবকের মতো তিনি। যদি তিনি কঠোরতা অবলম্বন করেন তবে সবাই আলতাফ মিঞার পক্ষই নেবে।

মেয়েদের সম্পর্কে আলতাফ মিঞার এত আতঙ্ক কেন সে বোঝে না। সে বলল, 'কেউ দেয় না। আমি নিজেই তুলে আনি।'

'ভাল।' তিনি আর কিছু তখন জানতে চান না।

গোপাল নিজে খারাপ হতে পারে কিন্তু মারগারেটকে ছোট করতে পাবে না। ফুলের কথা বললেই চাচা বিরক্ত হবেন। লোভে ফেলে দিচ্ছে তাকে এমন ভাবতে পারেন। তার নিজেরও সঙ্কোচ আছে—একজন অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে কোনো আগন্তুকের এই ঘনিষ্ঠতা কেমন বেমানান—খাবাপ ইচ্ছে না থাকলে কি দরকার গোপালকে ফুল দেওয়ার। ফুল তো ভালবাসার কথা বলে। স্টিফেনের বাড়িতে গেলেই সে দেখতে পায় মারগারেট বাগানে গাছ খোঁড়াখুঁড়ি করছে। সাদা ফ্রক গায়। কালো অ্যাপ্রন বাঁধা কোমরে। সে ঝাঁঝরি এগিয়ে দেয়। গোপাল ঝাঁঝরিতে জল ঢালে ফুলের বাগানে।

॥ সাত ॥

জাহাজ থেকে হেরন পাখিগুলি নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। এজেন্ট অফিস থেকে বোধ হয় চিঠির বাণ্ডিল হাজির। বাহার, জাহির, বিকাশ ছুটে যাচ্ছে উপরে। চিঠির খবর এলেই পিছিলে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। চিঠিগুলি থাকে আলতাফ মিঞার হাতে। তিনি ইনজিন সারেঙ বলে, তাঁকেই ইনজিন জাহাজিদের চিঠির বাণ্ডিল বুঝিয়ে দেওয়ার কথা। কিন্তু আশ্চর্য গোপাল। জাহির নিচে নেমে এসে বলেছে, গোপাল উপরে যা। সারেঙসাব ডাকছে।

গোপাল উপরে গেলে চিঠির বাণ্ডিল দিয়ে বললেন, বিলি করে দে।

বাদশা মিঞা কার ফোকসালে ছিল কে জানে। সেও হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে এসেছে। আর বলছে, গোপাল, আমার চিঠিটা খুঁজে দেখ না। গোপাল জানে, বাদশা বিবির খবর পাবার জন্য উতলা হয়ে আছে। বাদশার চিঠি সে লিখে দেয়—আর দেয় বলেই জানে, বাদশা জাহাজে ওঠার আগে তার বয়সী এক যুবতীকে শাদি করে সফর করতে বের হয়েছে। চিঠির নানা মুসাবিতা এবং বাদশার চিঠির বয়ান শেষ হতে চায় না। দু-লাইন লেখায়—তারপর রেখে দেয়—আর কি লেখার আছে ভাবে। তারপর আবার তার মনে হয়, বাদশার যে কত মহব্বত তার বিবির জন্য—লাইন দুটো না লিখে দিলে বোঝানো যাবে

না। এই চিঠির লেখার তড়িকা থেকে গোপাল টের পায় বাদশার কাছে বিবির চিঠি বাঁচা মরার সামিল। জাহাজে ওঠার আগে চিঠি দিয়েছে, কলম্বো বন্দরে চিঠি দিয়েছে, নির্ঘাৎ এই বন্দরে বিবিরি চিঠি পাবে আশা করে বসে আছে। কারণ গোপাল এক এক করে নাম ডাকছে, আর চিঠি বিলি করছে। জাহির, নানু, রহমত, বাহার—তারপর বিকাশদার চিঠিও আছে। তারও চিঠি আছে। সে তার চিঠি পকেটে রেখে দেখল, বাদশা তার দিকে তাকিয়ে আছে। চিঠির উপর ঝুঁকে দেখছে—বাদশার চিঠি না বে-হাত হয়ে যায়। কেবল তার এক কথা, 'কোনো গণ্ডগোল হয় নাইত গোপাল !'

বাদশার কোনো চিঠি নেই। সে কেমন গোপালের দিকে আর তাকাতে পারছে না। অন্যত্র তার চোখ।

গোপাল বলল, 'আসবে। জাহাজ তো এক্ষুনি ছাড়ছে না, মন খারাপের কি আছে ! ডাকের গণ্ডগোলও হতে পারে।'

'আমার চিঠি আসেনি গোপাল ! সবার চিঠি আসে আমার আসে না কেন ! কেউ মেরে দেয়নি তো !'

'কে মারবে। সারেঙসাব তো সবার সামনে বাণ্ডিল দিল। তুই তো সামনেই ছিলি।'

'আর কাউকে ভুল কইরা যদি দ্যাস !'

'আমাব তো আর কাম নাই, তোর চিঠি ভুল করে কাউকে দিয়ে দেব !' গোপাল ঝামটা দিতেই বাদশা কেমন কুঁকড়ে গেল। তবু তার সংশয়—চিঠি বে-হাত হয়েছে। জনে জনে বলেছে, এই মিঞা দাও তো তোমার চিঠিখানা, গোপালরে দেখাই। চোখের ভুল যদি হয়—সে এই করে প্রায় সবার চিঠি ফের এনে নাম ঠিকানা পড়িয়ে নিলে গোপাল বলল, আমারটা দেখবি না ? বলে সে পকেট থেকে নিজের চিঠিখানা বের করে জোরে জোরে নাম ঠিকানা পড়ল। বিকাশদাকে বলল, তুমি একবার পড়ে শোনাও।

গোপাল দেখছে বাদশা সিঁড়ি ধরে মাথা নিচু করে নেমে যাচ্ছে। এতটা অপ্রস্তুত করা বোধ হয় ঠিক হয়নি। সে নিচে নেমে দেখল বাংকে চুপচাপ শুয়ে আছে বাদশা। তার আজ পরি নেই, না থাকলেও সে শুয়ে থাকার মানুষ না। সে সুতো এবং জালের কাঠি সঙ্গে এনেছে। অবসর সময়ে জাল বোনে। দেশ বাড়ির গল্প করে। হাটের গল্প করে। জ্যোৎ-জমি, মাছ ধরার নানা লোমহর্ষক গল্পও বলে।

যেমন বিকাশদার স্বভাব জাহাজিদের নানা খিস্তির গল্প শোনানোর। খুব

রসিয়ে গল্প করতে পারে। পয়সা হাতে এলে ওড়াতেও জানে। কিছুটা বদমেজাজি, আবার সহবতেরও সীমানা বোঝে। বিশেষ করে খারাপ কথা বলার সময় সারেঙসাব কোথায় আছেন, জেনে নেবে।

যে যার চিঠি নিয়ে ফোকসালে নেমে গেল। কেউ মাস্তুলের নিচে বসে পড়ছে। কেউ বাংকে শুয়ে চিঠি পড়ছে। একই চিঠি বার বার পড়ছে। সবই বড় সুদূরের খবর। গোপাল চিঠি খুলে দেখল, বাবা লিখেছেন। বেশ বড় চিঠি। বাবার এই স্বভাব। সবার খবর দেবে। এমন কি খোঁড়া গরুটারও। দুধ বন্ধ করে দিয়েছে। তার মাসোহারা ঠিক মতো পাচ্ছেন। বাড়ির কুকুর বেড়ালের খবরও দিয়েছেন বাবা। সংসারে কেউ ফেলনা নয়। যে আসে, সেই বাবার অতিথি। ভাই দুটিও হয়েছে তেমন, পড়াশোনার চেয়ে মাছ ধরার আগ্রহ বেশি। মা তার ভাল আছে। পূবের জামরুল গাছটায় প্রচুর জামরুল হয়েছে লিখেছেন। তারক-মাঝির বাবা দেহ রেখেছেন—এবং এ-ভাবে বাবার চিঠিতে, তার ঘরবাড়ি, সামনের ধানের মাঠ থেকে, বাদশাহী সড়ক কিছুই বাদ যায়নি। শেষে লিখেছেন, সমুদ্রে ঝড় উঠলে, গোপাল যেন দশবার গায়িত্রী জপ করে। এতে সমুদ্রের দেবতা প্রসন্ন হবেন।

গোপাল জানে তার বাবা এরকমেরই। তাঁর ধর্মবিশ্বাস প্রবল। রোজ দশবার গায়িত্রী জপ সে ঠিক করছে কি না চিঠিতে তাও জানতে চেয়েছেন।

বাবার চিঠি গোপাল ভাঁজ করে লকারে তুলে রাখল। চিঠিটা পড়ার পরই কেমন দেশের জন্য মন খারাপ হয়ে গেল। কবে দেশে ফিরতে পারছে, সে জানে না। তার ভাঙ্গা সাইকেলটার কথাও মনে হল। বাড়িঘর, মাঠ এবং সড়কের দু-পাশে কত গাছপালা, রেল-লাইন পার হয়ে গেলে জেলখানার পাঁচিল—কিছুই বাদ গেল না। সে চুপচাপ বসে থাকল কিছুক্ষণ। তার কিছু ভাল লাগছে না।

অথচ ঘাটে জাহাজ লাগার পর তার একবারও নিজের বাড়িঘরের কথা মনে হয়নি। কতক্ষণে কিনারায় নামবে। কতক্ষণে পাহাড়ী রাস্তা ধরে হেঁটে অথবা বাসে সেখানে যাবে। পাঁচ সাত সপ্তাহ হল সে তার নিজের দেশ ছেড়েছে, শুধু নীল জলরাশি আর কাহাতক সহ্য হয়—ডাঙ্গা দেখার জন্য পাগল—অথচ তার বাড়িঘর আছে, জাম জামরুল গাছের বাগান আছে এবং বাবার দর্জির দোকান আছে ভুলেই গেছিল। চিঠিটা তাকে কিছুটা বাড়িঘরের জন্য আকুল করে তুললে, সে ফোকসাল থেকে বের হয়ে গেল।

জাহাজে এখন তাদের কাজকাম কম। পাটের গাঁট নামানো হচ্ছে। তার

কাজ আবার ফাইভারের সঙ্গে। বাহার সুস্থ হয়ে ওঠায় তাকে আবার ফাইভারের হেলপার করে দিয়েছে। ঘাটে জাহাজ এলে সবারই স্বভাব কিছুটা এলোমেলো হয়ে যায়—কাজকাম নিয়ে খুব কড়াকড়ি থাকে না। ইনজিন-রুমে স্ট্যান্ডবাই জেনারেটর খুলে টুকিটাকি মেরামতের কথা আছে। ব্যালাস্ট পাম্প খোলা হবে। কনডেনসার খুলে সাফসুতরোর কাজ আছে। তার কোথায় কাজ ফাইভারই বলতে পারবে।

সে ফাইভারকেই খুঁজতে যাচ্ছে উপরে। বোট-ডেকে উঠে এলেই বাবেতির কথা মনে হয়। বাবেতি তাকে আর তাড়া করছে না। কেবল মাঝে মাঝে সে ডাঙ্গায় নেমে যাবার সময় দেখতে পায় উইংগুসোলের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে বাবেতি। মোটা জিনসের প্যান্ট, জামা, জ্যাকেট গায়। কাসাব্লাংকার মতো যেন জাহাজ পাহারা দিচ্ছে বাবেতি। সবাই নেমে যায়, সে নামে না। তাকে কিংবা কাপ্তানকে কখনও ঘাটে নামতে দেখেনি গোপাল।

গোপালের কেন যে মনে হল, এই মাত্র সিঁড়ি ধরে দ্রুত কোথাও কেউ নেমে যাচ্ছে। সে কে ? তারপরই মনে হল, অনেকেই হতে পারে। বয় বাটলার ওদিকটায় যেতে পারে না। ওখানে বাবেতি আর তার বাবা থাকে। বোট-ডেক থেকে নিচে পর পর দুটো সিঁড়ি নেমে গেছে—শেষের সিঁড়িটা ধরেই বাবেতি নেমে যায়। চিফ-অফিসার কাপ্তান-বয়ও নেমে যেতে পারেন। তবু তার কেন যে মনে হল—বাবেতি সিঁড়ি ধরে দ্রুত নেমে গেছে। বুড়ো মানুষদের পক্ষে এত দ্রুত নেমে যাওয়া অসম্ভব। কাঠের সিঁড়িতে নামতে গেলে দুপদাপ শব্দ হয়। যেন কেউ লাফিয়ে নেমে গেল। বাড়ির কথা ভেবে তার মন খারাপ—সে বোট-ডেকে উঠে এসেছিল কিছুটা অন্যমনস্কভাবে। সে খুঁজছে, ফাইভারকে। যদি ফরোয়ার্ড-পিকে থাকে। নোঙর ফেলার উইনচে যদি কাজ থাকে। কিন্তু অবাক, ফরোয়ার্ড-পিকে নেই ফাইভার। স্টিয়ারিঙ ইনজিনের ঘরটায় যায়নি তো ! ফিরতে গিয়ে মনে হল, চিমনিতে কে যেন বড় বড় অক্ষরে কি সব লিখে রেখেছে। চক দিয়ে লিখেছে—'দিস ইজ নট প্রপার রুডি।'

প্রপার নয় কেন ? কিনারায় সে যায় বলে ! বাবেতি কি টের পেয়েছে, সে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। থার্ড কি বাবেতিকে গল্প করেছে তারা কোথায় বেড়াতে যায়—কারা তার সঙ্গে থাকে। কিন্তু যতদূর সে শুনেছে, বাবেতি কারো সঙ্গে মেশে না। কারো সঙ্গে কথা বলে না। সে নিজের মতো থাকে। কাপ্তানের পুত্র বলে কেউ তাকে ঘাটাতেও সাহস পায় না। তাকে সবাই এড়িয়ে চলে।

আর তারপর দেখল, নিচে লিখেছে বাবেতি—আই অ্যাম দ্য ওয়ান হু নিড্‌স টু বি ব্যাপটাইজড্‌ বাই ইয়ো।

বাবেতি তাকে রুডি বলে ডাকে। সে যে জাহাজে শুধু গোপাল নয়, কারো কাছে সে রুডি এটা একমাত্র সে আর বাবেতি জানে। ব্যাপটাইজড কথাটা আবার পড়ল। কি বোঝাতে চায় বাবেতি।

তা-ছাড়া তাকে এ-ভাবে সতর্ক করে দিচ্ছে কেন! তার সঙ্গে আর কথাও বলছে না! কাপ্তান শাসন করতে পারেন। বাংকারে ঢুকে গিয়ে বাবেতি যেন বাড়াবাড়িই করে ফেলেছে। শত হলেও সে কাপ্তানের পুত্র। তার মর্যাদার সঙ্গে কাপ্তানের মর্যাদা জড়িত—এ-সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে সে ফের উচ্চারণ করল, ব্যাপটাইজড্‌। ব্যাপটাইজড্‌ মানে তো ধর্মে দীক্ষিত হওয়া। সে তাকে কোন ধর্মে দীক্ষিত করবে। সেটা কোন ধর্ম! সে তো সাধু সন্ন্যাসী নয়, সন্ত নয়, তাকে এমন কথা লিখল কেন। কিংবা তার মুখে কোনো নিষ্পাপ ছবি কি কখনও কাউকে কোনো নবীন সন্ন্যাসীর কথা মনে করিয়ে দেয়। যে একমাত্র পারে কোনো দুর্গত মানুষকে উদ্ধার করতে।

শব্দগুলি গোপালের মাথার মধ্যে কেমন পেরেক পুঁতে দিল। তার ভয় করতে লাগল। কার চোখে না আবার পড়ে যায়! তবে খুবই সাংকেতিক কথাবার্তা। সে যে রুডি তার খবর কেউ রাখে না। জাহাজে রুডি বলে কেউ নেই। সে এ-জন্য এত বিচলিত হবে কেন! তা-ছাড়া বাবেতি কোনো খারাপ কথাও লেখেনি। এটা যে বাবেতির হাতের লেখা তাই বা কে বুঝবে! কিন্তু সে বাবেতিকে ব্যাপটাইজড্‌ করার কে! এটাই তার আতঙ্ক।

সাবধানের মার নেই ভেবে গোপাল চারপাশে তাকাল। দেখল তাকে কেউ লক্ষ্য করছে কি না। না সবাই নিজের কাজে ব্যস্ত। ফলগ্গা বেঁধে মাস্টে রঙ করছে ডেক জাহাজিরা। কশপ কাকে কটা হাতুড়ি বাটালি দিতে যাচ্ছে। এজেন্ট অফিস থেকে কারা এসেছেন—চিফ অফিসার তাঁদের কাপ্তানের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। ব্রিজ ফাঁকা। বোট-ড্রিল হতে পারে দু-একদিনের মধ্যে। চার নম্বর বোটের সামান নামানো হচ্ছে। ঝড়ের দরিয়ায় বিপদে পড়লে—কোনো খামতি না থাকে বোটে—সে-সব বোধ হয় দেখে নেওয়া হচ্ছে। সে যে উইণ্ডসোলের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে কারো টের পাবার কথা নয়।

এখন বয়লার-রুমে কারো নামারও কথা নয়। উঠে আসার কথা নয়। সে দ্রুত সব অক্ষরগুলি জামা দিয়ে ঘসতে শুরু করে দিল। যেন ধরা পড়ে গেলে তার রক্ষা নেই। কে রুডি! রুডিকে খুঁজে বের কর। জাহাজে উঠে কাউকে

ধর্মান্তরীত না ধর্মে দীক্ষা, কোনটা, ব্যাপটাইজড় মানেটাও ভাল করে সে জানে না।

তাড়াতাড়ি ঘসতে গিয়ে ওর হাতের ছাল চামড়াও কিছুটা উঠে গেল। দাগগুলো উঠতে চায় না। ভয়, যদি বাবেতি নিজেই উঠে এসে তার এই অপকর্ম দেখে ফেলে। সে ঝামেলা পাকাতে পারে—কোন সাহসে মুছলে! রুডি কি কেবল তুমি! রুডি বলে কি আর কেউ থাকতে পারে না!

গোপাল ঘেমে গেছে সে মুছে দিয়ে সোজা সিঁড়ি ভেঙ্গে টুইন-ডেকে নেমে এল। কেবল মনে হচ্ছে, বাবেতি তার কুকুরটাকে এই বুঝি লেলিয়ে দিল!

সে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে এল পিছিলে। গ্যালিতে ঢুকে বলল, 'চাচা এক গ্লাস জল। সে হাঁপাচ্ছে। কথা বলতে পারছে না। জাহাজের কোনো গোপন কাকতাড়ুয়ার পাল্লায় পড়ে যাবে স্বপ্নেও ভাবেনি। জাহাজে উঠলে নানা উপসর্গ দেখা দেয়—কিন্তু এমন গোপন কাকতাড়ুয়ার পাল্লায় পড়তে হবে সে জানে না। সারেঙসাব কেন, কাউকে বলার সাহস নেই—কখন সবার সামনে সেই যমদূতের মতো কুকুরটিকে লেলিয়ে দিয়ে তাকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়বে ঠিক কি!

সে জল খেয়ে গ্লাসটা মেসরুমে রেখে দিল।

যে যার কাজে বের হয়ে গেছে। পিছিল ফাঁকা। কেবল ভাণ্ডারিচাচা গ্যালিতে। ভাতের বিশাল তামার হাড়ি টেনে নামাচ্ছে। বারোটার ঘন্টা পড়লেই হুড়মুড় করে পঙ্গপালের মতো সব উঠে আসবে। হাত মুখ ধুয়ে দুপুরের নাস্তা করবে।

গোপাল লেখা মুছে দিয়ে ভাল করল কি না বুঝতে পারছে না। লেখাটা চিমনির গায়ে ভেসে থাকলে কি ক্ষতি ছিল! কোনো অশ্লীল ইঙ্গিতও নেই। তবে ব্যাপটাইজড় মানে তো তার কাছে অনেক গভীর।

বিকাশদা কখন যে হাজির।

সে বেঞ্চিতে বসে বন্দরের জাহাজ দেখছিল। কত জাহাজ, কত মানুষ, আর কত সব বিচিত্র পাখী জাহাজঘাটায়। কোনো জাহাজ নোঙর তুলছে। কোথায় কোন সমুদ্রে ভেসে যাবে জাহাজ—এ-সব নানা চিন্তায় সে যখন আকুল, বিকাশদা তার কাঁধে বিশাল এক থাবা বসিয়ে দিল। —'আরে গোপাল, চুপচাপ বসে আছিস! কি ব্যাপার। হাত ফাত দিলি!'

গোপাল বলল, 'ধুস!'

'মনে হয় কিছু করেছিস! না হলে ঈশ্বরের পুত্র, মুখ তোমার এত ব্যাজার

কেন ?'

'কি করব ? কি করলে মুখ ব্যাজার দেখাবে না বল !'

'আরে মেয়েটা তোকে ফুল দেয় এমনি এমনি ! সারেঙসাব তো ক্ষেপে লাল। ছোঁড়া মরবে। তা আমি বললাম, চাচা মরণ লেখা থাকলে আপনি খণ্ডাবেন কি করে ! পারছেন আটকাতে। মেয়েটার মা-বাবার নাকি তোকে খুব পছন্দ। কেটে পড়বি নাকি !'

'বিকাশদা ভাল হবে না।'

'আহারে আমার গোপাল, নরম তুল তুলে, মাখনের মতো। হাত দিলেই বুঝতে পারতিস। দিসনি।

গোপাল বলল, কী বাজে বকছ বলতো। আমি কিছু জানি না।

'মিছে কথা। শোন গোপাল, সুযোগ নষ্ট করবি না। সুযোগ নষ্ট করতে নেই। তবে কপালে যা লেখা আছে ফুটে বের হবেই। সেই তিন জাহাজ ডুবি নাবিকের মতো বুঝলি।'

'কাদের কথা বলছ !'

'আরে ঐ যে একবার জাহাজডুবিতে তিন নাবিক জলে ভেসে গেল !' যেন বিকাশদা নিজের চোখে দেখেছে নাবিকদের জলে ভেসে যেতে। তিন নাবিক জলে ভেসে যাচ্ছে, তিনি দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছেন। গল্প বলার ভঙ্গীতে গোপালের এমনই মনে হল।

বিকাশদা গল্প বলতে শুরু করে দিল। এই এক কু-স্বভাব তার।

গোপাল বলল, 'তোমার গল্প নিচে গিয়ে শোনাও। আমার কিছু ভাল লাগছে না।'

বিকাশ ছাড়বে না। গল্পটা শোনাবেই। 'বুঝলি জাহাজডুবি হয়েছে। তিন বন্ধু, কোনরকমে একটা দ্বীপে গিয়ে উঠে পড়েছে। দ্বীপটা মন্দ না। মিষ্টি জলের হ্রদ আছে। ফুল ফলের গাছ আছে। পাহাড় আছে। খাওয়া-পরার ভাবনা নেই। তারা পাহাড়ের মাথায় উঠে বসে থাকে—জামা প্যান্ট খুলে গাছের ডগায় ঝুলিয়ে রাখে—ঝড়ো হাওয়ায় ওড়ে। দূর থেকে কোনো জাহাজ যদি দেখে ফেলে—এই আশা আর কি !'

গোপাল পাটাতন থেকে উঠে বলল, 'আশা নিয়ে থাকুক। আমি উঠছি।' গোপাল উঠে পড়ল। সে শুনতে চায় না।

খপ করে হাত ধরে ফেলল বিকাশ। বলল, 'নো চিন্তা ! ডু ফূর্তি। গোপাল লক্ষী ছেলে আমার। শোন না। এত ক্ষেপে আছিস কেন ?'

গোপাল কিছুতেই শুনবে না। কারণ তার মন ভাল নেই। লেখাগুলি মুছে দিয়ে ভাল কাজ করেনি এখন মনে হচ্ছে। কাপ্তান-বয় তো বলেছেন, যা বলবে শুনবে। ঘাটাবে না। ঘাটালে মুসকিলে পড়বে। হয়তো খুশি হলে কাপ্তান তোমাকে রাজকন্যা এবং অর্ধেক রাজত্বও দিয়ে দিতে পারেন।

সে মুছে দিয়ে ভাল কাজ করেনি। দুশ্চিন্তায় তার মুখ কালো হয়ে গেছে।

'বুঝলি গোপাল, দেশের জন্য মন খারাপ সবারই হয়। তোরও হয়। জাহাজডুবীর সেই তিন নাবিকেরও হয়েছিল। আরে চলে যাচ্ছিস কেন! শোন না।'

গোপাল বুঝল, বিকাশদা গল্পটি তাকে না শুনিয়ে ছাড়বে না।

সে বলল, 'বল! খিস্তি করবে না কিন্তু।'

'আরে না, এটা খিস্তির গল্পই না। তারপর কি হল জানিস, দ্বীপে থাকতে থাকতে আপশোষ—একজন বলল, আর ভাল লাগছে না বৌকে দেখতে না পেলে মরে যাব। তার কাছে ফিরে যেতে না পারলে বাঁচব না। কাহাতক আর কতদিন ভাল লাগে দ্বীপে ঘুরে বেড়াতে! অন্যজন বলল, আমার সূর্যমুখী ফুলের জমিতে এখন কত না ফুল ফুটে আছে। জমিটা আর একবার না দেখলে মরেও শান্তি পাব না।

গল্প শুনতে কে না ভালবাসে। জাহাজে তো সময় কাটে না। সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিকাশ মধ্যমণি। পাশে গোপাল। গোপাল চলে না যায় তার জন্য হাত চেপে ধরে আছে বিকাশ।

একজন বলল, 'আহা বেচারা! সূর্যমুখী ফুলের খেত, ফুল, স্ত্রী-র নাকে নথ, অপেক্ষা কত কিছু যে থাকে। মানুষের মায়া বড় কঠিন ব্যাধি।'

বিকাশ বলল, 'থাম ব্যাটা। মায়া না বলে, মোহ বল।'

আসলে বাহার ফুটকরি কাটছিল। বিকাশদার তা মনঃপূত নয়। এক ধমকে চুপ।

'জানিস তৃতীয় জন কিন্তু গোপাল অন্য রকমের—সে বলল, কেন, বেশ ভাল আছি। জমি নেই জরু নেই, বিবাদও নেই। আমি এখানেই থেকে যেতে চাই। আমরা সারাজীবন এই দ্বীপে ঘুরে বেড়াব। যা পাব তাই খাব। গোটা দ্বীপটাই আমাদের। চিংড়ি মাছ পুড়িয়ে খাওয়া, কাঁকড়া, কচ্ছপের ডিম, পাখির মাংস, কি নেই! খাও আর ঘুমাও! খাও আর ঘুরে বেড়াও। ভাল ব্যবস্থা না!' বিকাশ গোপালের যেন সম্মতির অপেক্ষায় কথাটা বলল।

'ভাল ব্যবস্থা, তবে এতটা নিশ্চিত জীবন কি ভাল!'

বিকাশ বলল, 'যে যেমন বোঝে। তা যাই হোক, তৃতীয় জন কিছুতেই বাকি দু'জনকে বাগে আনতে পারছে না। দিনের বেলায় একজন পাহাড়ের মাথায় উঠে যাবেই। আর জামা ওড়াবে হাওয়ায়। যদি কোনো সমুদ্রগামী জাহাজ অথবা জেলে নৌকা দেখতে পায়। অনেক চেষ্টা করে কিছু হচ্ছে না বুঝলি ! খুবই মন খারাপ দুই নাবিকের। তৃতীয় জনের কোনো দুঃখ নেই। সে হাসে, গান গায় শিস দেয়। সমুদ্রে ডুবে বড় বড় চিংড়ি মাছ তুলে আনে। কচ্ছপের ডিম পুড়িয়ে দুই বন্ধুকে পদ্মপাতায় খেতে দেয়। জীবনে সে আর কিছু চায় না। পদ্মপাতা, কচ্ছপের ডিম, রাতের জ্যোৎস্না, বড় প্রিয় তার। কি রে গোপাল, দারুণ না। আমার তো ইচ্ছে করে—এ-ভাবে নিখোঁজ হয়ে যাই। কোনো দ্বীপে থেকে যাই।

গোপাল বলল, যাও না। কে বারণ করেছে। সে উঠতে চাইল।

বিকাশ চিৎকার করছে, অ ভাণ্ডারি চাচা, চা লাগাও। যা তো বাহার, আমার লকার থেকে চা দুধ বের করে আন।

গোপাল বলল, আমি চা খাব না।

'তোর কি হয়েছে বলত ! এই উল্লাস, এই ঘোর, এই মনখারাপ কখন যে তোর কি হয় ! এমন সুন্দর জাহাজডুবীর গল্প তোকে কে বলবে।'

গোপাল বলল, 'দ্বীপে কেউ এ-ভাবে থাকতে পারে।'

'খুব পারে। ইচ্ছে করলেই পারে। দ্বীপের গাছপালাকে ভালবাসলেই পারে। তারপর কি হল শোন, ওরা একটা রুপোর আংটি পেয়ে গেল !'

দ্বীপে তা হলে রুপোর আংটিও থাকে !'

'তা জানি না। পেল, পেতেই পারে। তবে আংটিটা কোনো মেয়েমানুষের না—এটুকু বলতে পারি।'

'তুমি কি দ্বীপে গেছিলে, না নিজেই আটকা পড়েছিলে।'

'সে জানি না, তবে আংটিটা পরিষ্কার করতে গিয়ে এক বিপদ। সেই আলাদিনের প্রদীপ। ঘসলেই দৈত্য হাজির। হাতজোড় করে দাঁড়াল—বলল, আমি আংটির ভৃত্য। বলুন কি করতে হবে !'

'দৈত্যকে দেখে তারা ঘাবড়ে গেল। তারপর দৈত্য অভয় দিতেই একজন বলল, আমি আমার স্ত্রীর কাছে ফিরে যেতে চাই। ভৃত্য বলল, তা যাবেন। তবে আপনাদের আমি মাত্র একটা ইচ্ছেই পূরণ করতে পারব। তার বেশি না। সুতরাং প্রথমজনকে দৈত্য তার স্ত্রীর কাছে দিয়ে এল।'

'দ্বিতীয় জন বলল, কতদিন আমার সূর্যমুখী খেত দেখি না। আপনি যদি

সেখানে আমাকে রেখে আসেন।'

'দৈত্য বলল, তথাস্তু।'

'তৃতীয় জন ক্ষেপে যাচ্ছে। এতদিনের সঙ্গী, তার কথা তারা একবার ভাবল না। এত স্বার্থপর! ঝড় নেই, জল নেই, শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, সে তাদের সেবা করেছে। দ্বীপটায় যে কোনো অসুবিধা নেই বুঝিয়েছে। গাছের পাতায় ঘর ছেয়েছে। লতায় চাল খুঁটি বেঁধেছে। শুকনো পাতা বিছিয়ে গরম বিছানা তৈরি করেছে—জ্বর জ্বালা হলে গাছের ছাল বাকলের রস করে খাইয়েছে—এত করার পরও তারা শুধু নিজের কথাই ভাবল। তার বন্ধুত্বের কথা, তার এত আন্তরিকতার কথা একবার ভাবল না! সে যে কি করে!

'দৈত্য বলল, সার আপনি চুপ করে আছেন, কিছু চাইছেন না। আপনার কি কিছু চাইবার নেই!'

'সে বলল, দেখ বাপু আমার দ্বীপ ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না। আমার কিছু চাইবার নেই।'

'দৈত্য বলল, 'অন্তত কিছু চান। কিছু না চাইলে আমি যে ফিরতে পারছি না।'

'তৃতীয় নাবিক বলল, তা হলে তুমি আমার সঙ্গে থেকে যাও। দু-জনে মিলেমিশে থাকি।'

'দৈত্য বেচারা পড়ে গেল মহা ফাঁপড়ে। সে বলল, সে তো হয় না। আমার তো আরও কাজ আছে। আপনি অন্য কিছু বলুন—'

'কি আর বলব। মানুষ সব পারে। শুধু একা থাকতে পারে না। তার সঙ্গী চাই। আমার দুই বন্ধু চলে গেল। মন খারাপ। একা দ্বীপটায় থাকি কি করে!'

'তারপর কি ভেবে সে বলল, তুমি তো একটা ইচ্ছেই পূরণ করবে বলছ?'

'আজ্ঞে তাই।'

'তবে ওদের দু'জনকে আবার দ্বীপে রেখে যাও।'

গোপাল হো হো করে হেসে উঠল।

বিকাশ বলল, 'হাসার কি হল! এই হল কপাল বুঝলি! যা হবার ঠিকই হবে। হাত দিলে খসে পড়বে না। জায়গারটা জায়গাতেই থাকবে বুঝলি!

না এ-ভাবে গল্পটা শেষ হবে ভাবতেই পারিনি গোপাল। গোপাল কেমন চুপ মেরে গেল। সে নেমে গেল সিঁড়ি ধরে। শিস দিল। এবং তখনই মনে হল, অন্য ফোকসালে কে রঙের টব বাজাচ্ছে। গান গাইছে, 'ফান্দে পড়িয়া

বগায় কান্দেল।'

॥আট ॥

জাহাজ থেকে নেমে গোপাল দৌড়ে যাচ্ছে। থার্ডকে সে এই সুযোগে কয়েকটা কথা বলবে। জাহাজেই বলতে পারত, কিন্তু অসুবিধা আছে। সে ইচ্ছে করলেই হুটহাট থার্ডের কেবিনে ঢুকে যেতে পারে না। থার্ড অফিসারের কাজ ডেকে। তার কাজ ইনজিন-রুমে নয়তো উইনচ মেসিনে। থার্ডের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করার সুযোগও কম। কেবিনে বেশি যাওয়া আসা করলে নোংরা কথাবার্তা হতে পারে। তা-ছাড়া যদি থার্ড জানতে চায়, কোথায় লিখেছে, চিমনিতে। চল তো দেখি, কে লিখল! এমনসব নানা আপদ সৃষ্টি হতে পারে ভেবেই নিরিবিলি সুযোগ খুঁজছে। স্টিফেন এবং তার স্ত্রী তাকে পছন্দ করে। এই বয়েসটার একটা কদর আছে সবার কাছে।

সে যেতে যেতে ডাকল, থার্ড। থার্ড দাঁড়িয়ে গেল।

'কিছু বলবে ?'

তখনই আবার কেন যে মনে হল গোপালের, বলা কি ঠিক হবে! সে বলল, 'না মানে, আচ্ছা বাবেতি বলে কাউকে তুমি চেন ?'

'না তো!'

রুডি ?'

'না তো!'

'অঃ।' গোপাল ট্যাকসির দরজায় মুখ গলিয়ে দেবার সময় বলল, 'কাপ্তানের পুত্রটির কি মাথা খারাপ আছে ?'

তিনি একটা চুরুটে অগ্নি সংযোগ করলেন। বললেন, 'কিছু একটা আছে ?'

'আগে দেখেছ ওকে ?'

'না। এ-সফরে দেখলাম।'

'কোথায় ওদের বাড়ি ?'

'কার্ডিফে শুনেছি।'

'তোমার সঙ্গে কথা বলে ?'

'কে কথা বলে ?'

'কাপ্তানের পুত্র।'

থার্ড সহসা কেমন বেশ সচকিত হয়ে উঠল—বলল, 'তোমার কি দরকার পড়ল, সে কথা বলে কি না ? জাহাজে যে যার মতো থাকে। তবে শুনেছি

ওর কি অসুখ আছে। আচ্ছন্ন অবস্থায় এমন সব কথা বলে, যে মনেই হয় না, সে এ পৃথিবীর বাসিন্দা। তাকে নিয়ে তোমার এত মাথা ব্যাথা কেন বুঝছি না।'

বোধ হয় আর বেশি বলা ঠিক হবে না। তার বাংকারে নেমে এসেছিল বাবেতি, সে খবরটাও কি জানে না। এত হৈ চৈ হল—থার্ডতো বলতে পারতো তোমার বাংকারে নেমে গেল কেন ? কিছু বলল। তুমিই তো পুত্রটি সম্পর্কে বেশি খবর দিতে পার। সে তোমাকে কি বলেছে, এমন প্রশ্ন করলে বলতে হয়, সে বলেছে, তার নাম বাবেতি। আর গোপাল, তার কাছে রুডি। গোপাল যে দর্জির ছেলে বিশ্বাসই করে না। তার বাবা না কি ঘোড়সওয়ার সৈনিক। তা-হলে বাবেতি কি আচ্ছন্ন অবস্থায় নেমে এসেছিল। সে কোনো কল্পিত জগতের নায়ক তখন।

ট্যাকসি পাহাড়ের চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে নিচের একটি কটেজের দিকে ঢুকে গেল। ওরা এসে গেছে। বাবেতি সম্পর্কে তার আর কোনো প্রশ্ন করতে সাহস হয়নি। সে চুপচাপ গাড়িতে বসেছিল। স্টিফেন একজন ভারতীয়ের আচার আচরণ, তার খাদ্যাভ্যাস, পুজো আর্চা, এবং বারোমাসের তের পার্বনের খবর খাতায় সুযোগ পেলেই টুকে নিচ্ছে। এ-সব খবর স্টিফেনের কি কাজে আসবে সে জানে না।

গোপাল গাড়ি থেকে নেমে কিছু ওয়ালনাট গাছের ছায়া পার হয়ে গেল। বাড়িটাতে ঢোকার মুখে গাছগুলি দারুণ এক শীতলতা সৃষ্টি করে রেখেছে। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। গোপালের সোয়েটার ভেদ করে ঠাণ্ডা ঢুকছে ভিতরে। যদিও তার এই সামান্য ঠাণ্ডায় কাবু হাওয়া কিশোরী মেয়েটির একদম পছন্দ না। গোপাল কেন যে এত শীতে কাবু। সুন্দরী কুসুমকলিকা—অন্তত মারগারেটকে দেখলে গোপালের তাই মনে হয়। কুসুমকলিকা বাগানে কাজ করছে। গায়ে সামান্য সুতির নীল ফ্রক। মাথায় স্কার্ফ সাদা রঙের। কোমরে কালো অ্যাপ্রন জড়ানো। মাটি খুঁচিয়ে আলগা করছে। তাকে দেখেই বলল, এই বাবা এদিকটায় এসো না। এক ঝাঁঝরি জল এনে দাও না। কি কেবল দাঁড়িয়ে আমাকে দেখ।

গোপাল অপ্রস্তুত। সত্যি সে কেমন এক আকর্ষণে পড়ে যায়। কুসুমকলিকা ছাড়া এখানে যে তার আসার আর কোনো আকর্ষণ নেই সে বোঝে। তবু চায় না, কেউ বুঝে ফেলুক, সে শুধু একজন নাবিক নয়—সে সবার সঙ্গে বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে। সে নষ্ট স্বভাবের নয়,

বেড়াতে ভালবাসে বলেই আসে। থার্ডের সঙ্গে সে যেন এ-জন্যই কিনারায় নেমে আসে। তাড়াতাড়ি এক ঝাঁঝরি জল নিয়ে এল মসৃণ ঘাসের লন পার হয়ে। কটেজের মতো লাল নীল রঙের কাঠের বাড়িটি যেন মেয়েটি থাকায় তার কাছে আরও চমকপ্রদ।

জলের কল থেকে এক ঝাঁঝরি জল এনে দেওয়ায় কুসুমকলিকা কি খুশি! আর অবাক গোপাল, কুসুমকলিকা তাকে দেখছে না। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে। বাড়ির নিচেই ধাপে ধাপে পাথরের সিঁড়ি নেমে গেছে। এত উঁচু থেকে নিচে তাকালে মাথা ঘুরে যাবার কথা। যেন একটু অন্যমনস্ক হলেই সে গড়িয়ে পড়ে যাবে নিচে। আর উঠে আসতে পারবে না। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে জোরে। কোনো জাহাজ চলে যাচ্ছে দূর সমুদ্রে। কুসুমকলিকা তার পাশে দাঁড়িয়ে কেন যে বলল, তোমার জাহাজে নিয়ে যাবে। দূরে সেই জাহাজ তখনও দৃষ্টির বাইরে নয়। কুসুম জাহাজ দেখছে।

কুসুমকে এড়িয়ে যাবার জন্য বলল, 'জাহাজে গিয়ে কি করবে? ওখানে দেখার কিছু নেই। তোমার ভাল লাগবে না। সারাদিন কাজ—এক ঘেয়ে কাজ। তারপর ছুটি, হয় ফোকসালে, নয় ডেকে বসে থাকা—দিন-রাত শুধু সমুদ্র বড় এক ঘেয়ে। জাহাজ বড় খারাপ জায়গা'।

তারপর গোপাল বলল, 'কি বিশ্বাস হচ্ছে না! সারাদিন মাল ওঠানামা হচ্ছে। ধুলো, ময়লা, গ্যাঞ্জাম, তোমার ভাল লাগবে না।হাড়িয়া হাপিজ হচ্ছে। থার্ডকে জিজ্ঞেস করে দেখ না। জাহাজে যাওয়া তোমার ঠিক হবে কি না!'

'হাড়িয়া হাপিজ কি?' কুসুম জানতে চাইল।

'ঐ আর কি—জাহাজি শব্দ। ডেরিকে মাল ওঠানো নামানোর সময় চিৎকার করতে হয়। কার মাথায় কখন পড়বে! সংকেত বলতে পার। হাড়িয়া বললেই পাটের গাঁট ক্রেন থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়।' তবু মারগারেট, মারগারেট নামটা তার পছন্দ নয়, কুসুমই পছন্দসই নাম। কুসুম হাড়িয়া শব্দটি কিছুতেই বুঝতে পারছিল না বলে—সে জাহাজি কায়দায় অঙ্গভঙ্গী করে বোঝাবার চেষ্টা করল।

আসলে কি কুসুম ইচ্ছে করেই হাড়িয়া হাপিজ বুঝতে চাইত না! তা-ছাড়া জাহাজে তার কাজটাও আহামরি কিছু নয়। আহামরি কেন, কিছুই নয়। তার কাজ সবার নিচে, সবার শেষে। জাহাজে তার ইজ্জত নেই টের পেলে কুসুম তার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠতে পারে। তা-ছাড়া জাহাজে নিয়ে গেলে সারেঙসাব যে অতিষ্ট করে মারবেন! কে রে মেয়েটা? এই কি তবে তোকে ফুল দেয়।

ভাল না।

সে বলতে পারে—নাম মারগারেট। আমি ভাবি কুসুম। থার্ড অফিসারের বন্ধু স্টিফেনের মেয়ে। স্টিফেন কে চেনেন না!

'জাহাজে মরতে এল কেন?'

'জাহাজে কি বাঘ ভাল্লুক হরিণ আছে? জাহাজ কি চিড়িয়াখানা? আর কিছু দেখার খুঁজে পেল না। তোর সঙ্গে জাহাজে মরতে এল! কোথায় থাকে! কি করে আলাপ! সাদা চামড়া দেখেই মজে গেলি। তোর মা বাবার কথা মনে পড়ল না। তোর ঘরবাড়ির কথা ভাবিস না?'

এ-সব নানা হুজ্জোতির ভয়েই গোপাল কুসুমকে বলেছিল, জাহাজ খারাপ জায়গা। যেতে হবে না। জাহাজ খারাপ জায়গা বলার কারণ আছে। কোনো কিশোরী সাদা গাউন, নীল স্কার্ট পরে যদি জাহাজে উঠে আসে, রশিদ, বাহার বিকাশদা কিংবা ইমাম অশ্লীল ইঙ্গিত করতেই পারে। গোপাল নিজেও নারী রহস্য বোঝে। সে বোঝে জানে, তবে ঘাটাঘাটি করেনি। নারী মাত্রেই তার কাছে দেবী। তাদের সম্পর্কে কেউ ইতর কথাবার্তা বললে, সে ক্ষেপে যায়। কুসুম সম্পর্কে কোনো অশ্লীল ইঙ্গিত করলে সে মারামারিও শুরু করে দিতে পারে। ওদেরও সে দোষ দিতে পারে না। এক ঘেয়ে সমুদ্র সফর বড়ই ক্লান্তিকর। ডাঙ্গা দেখার জন্য মাথা খারাপ হয়ে যায়। যেন মানসিকভাবে কতকালের ভুখা মানুষ এই জাহাজিরা। মরিয়া হয়ে কোনো নারীকে ছিন্নভিন্ন করে দিলেও দোষের না।

সারেঙসাবের আচরণে মাঝে মাঝে গোপাল বড় ধন্দে পড়ে যেত। সে বোঝে না তাকে নিয়ে তিনি এত বিচলিত কেন। সে তাঁর কে? আর সবাই নেমে যায়, উঠে আসে—কোনো খোঁজখবর নেন না—কোনো তাঁর অস্বস্তিও থাকে না। এটা ঠিক, গোপালের পয়লা সফর। এটা ঠিক, বয়েসটা খারাপ। বন্দরের ভুলভুলাইয়া গ্রাস করতেই পারে। কুসুম ধীরে ধীরে তার মধ্যে ঘোর সৃষ্টি করে ফেলেছে। ওর চুল, ওর চাউনি কিংবা চাঞ্চল্য, সবই মগজে বুড়বুড়ি কাটছে। আশ্চর্য মায়াবী চোখ, পুষ্ট স্তনের অহমিকা তাকে গ্রাস করছে।

একদিন গোপাল যাচ্ছে তফেলবার্জে। তারা ফ্রন্টাল-রুট হয়ে দ্য টিয়ট পিকেও যেতে পারে।

তফেলবার্জে খাড়া পাথরের পাহাড় আছে। অনেকে সেই খাড়া পাহাড় অতিক্রম করে এক জলাশয় আবিষ্কারের নেশায় যায়। দূরে ঘন বনাঞ্চল। সেখানে উঠে গেলে বুনো কুকুরের পাল চোখে পড়তে পারে। বেবুন কিংবা

হায়েনা দেখা যেতে পারে। কপাল ভাল থাকলে গুহার ভেতর থেকে কোনো চিতাবাঘ বের হয়ে আসছে চোখে পড়তে পারে।

ওরা যাচ্ছিল জাতীয় সড়ক ধরে। শহর ছাড়াতেই রাস্তার দু-পাশে জুলু পল্লী দেখতে পেল গোপাল। ক্রাল চোখে পড়ছে। লাল ধূধূ বালির ধূসর পৃথিবীতে যেন ঢুকে যাচ্ছে তারা। পোণ্ডো মেয়েরা মাথায় জলের কলসি নিয়ে বনজঙ্গলে ঢুকে যাচ্ছে। স্টিফেন জুলু এবং পোণ্ডো উপজাতির মধ্যে কোথায় কতটুকু তফাৎ বুঝিয়ে দিচ্ছিল। পোণ্ডো মেয়েদের কনুই অবধি বাহারি চুরি সূর্যকিরণে চক চক করছে। কোমরে সামান্য একখণ্ড বস্ত্র লজ্জা নিবারণে যেন যথেষ্ট। পা খালি এবং বেঢপ মোটা। ভারি স্তনের উপর রঙিন পাথরের মালা। স্টিফেন বেশ আস্তে গাড়ি চালাচ্ছিল। গাঁয়ের ভিতর দিয়ে যাবার সময়, স্টিফেন খুব সতর্ক। গ্রামের নারী পুরুষ সবাই গাড়ি দেখার জন্য রাস্তায় বের হয়ে এসেছে। মোরগ মুরগি উড়ে যাচ্ছে। নরনারী নির্বিশেষে প্রায় উলঙ্গই বলা চলে। স্বল্পবাস এবং মাথায় চুল নেই বলে কেউ কেউ মাথায় স্কার্ফ জড়িয়ে রেখেছে। এদের ক্রালগুলো কাঠের খুঁটি দিয়ে ঘেরা। বন্য জীবজন্তুর উৎপাত থেকে আত্মরক্ষা করার এটাই তাদের একমাত্র উপায়।

গোপাল সুবোধ বালকের মতো স্টিফেনের সব কথা আগ্রহের সঙ্গে শুনছে। কুসুমকলিকা তার পাশে, পরে ওর মা। সামনে থার্ড এবং স্টিফেন। প্রায় উলঙ্গ উপজাতি রমণী দেখলেই কুসুম মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে।

স্টিফেন বলে যাচ্ছিল, গাঁয়ের নাম, বলছিল বৃষ্টিপাতের কি গড়—এখানে কি শস্য ফলে। মেইজ নামক একরকম শস্যের চাষ হয়। পাহাড় থেকে খাল কেটে জল নিয়ে আসা হয় এবং চাষের সময় ওদের দেবতা ওটাঙ্গোকে মোষ কেটে খুশি করা হয়। আগে নরবলির প্রথা ছিল, এখন মোষ বলি দিয়ে দেবতাকে তুষ্ট করা হয়। ওটাঙ্গো শস্যের দেবতা। তখন গায়ে পোষাক রাখার নিয়ম নেই। সবাই উলঙ্গ হয়ে আগুনের সামনে নাচে। বৃষ্টিপাতের জন্যও তাদের মাঝে মাঝে দেবতাকে তুষ্ট করতে হয় এবং প্রথা আছে গাঁয়ের কোনো নতুন জাতককে সেদিন বাইরে রাখা হয় প্রকৃতির নিরাবরণ সৌন্দর্যের প্রতীক হিসাবে।

কুসুম তার পাশে বসে আছে। তার উষ্ণতা টের পাচ্ছে গোপাল। ফ্রক হাঁটুর উপর উঠে যাচ্ছে—হাতির দাঁতের মতো মসৃণ উরুর কাছাকাছি জায়গায় গোপালের চোখ চলে যাচ্ছে। সে কিছুতেই তাকাবে না ভাবছে। অসভ্যতা ভাবতে পারে। সে জানলায় যতটা পারছে চোখ রেখে গাছপালা পাখি দেখার

চেষ্টা করছে। হাতের কাছে আরও ঘন এবং গভীর বনরাজিনীলার সন্ধান রাখার যেন তার কোন আগ্রহ নেই। সঙ্গে যে খাবার প্যাকেট নেওয়া হয়েছে সেগুলি ঝুড়িতে সাজিয়ে রাখছে মারগারেট। মাঝে মাঝে কনুই দিয়ে গোপনে কেন ঠেলা দিচ্ছে গোপাল বুঝতে পারছে না।

গোপাল কোথায় যাচ্ছে তাও ঠিক বুঝতে পারছে না। টিয়ট পিক্‌সে না তাফেলবার্জে বুঝতে পারে না। সে বাচাল নয়। বরং কম কথা বলে—ভদ্র শান্ত স্বভাবের ছেলে। এই দূর দেশে তার পক্ষে সুবোধ বালক হয়ে থাকা ছাড়া উপায়ও নেই। থার্ডকে দয়ালু মনে হয়। ভারত সম্পর্কে জানার সে আর মানুষ খুঁজে পেল না! তাকেই ঠিক লোক বলে ঠাউরাল। অবশ্য সে ছাড়া আর কেই বা আছে ইংরাজি বলতে কইতে পারে। ফাইভারকে বোধ হয় থার্ড পছন্দ করে না। সে বরং স্টিফেনের বেশি কাজে লাগত। ফাইভারের কপাল খারাপ বলতেই হয়। এমন সুন্দরীদের সান্নিধ্য কে না চায়—আর যখন তারা ডাঙ্গায় নামার জন্য অধীর হয়ে আছে সবাই।

কিছুটা যাওয়ার পরই স্টিফেন বলল, তারা তাফেলবার্জে যাবে না টিয়ট পার্কে যাবে—ঠিক হবে ঘড়ির কাটা দেখে। কারণ রাত হয়ে গেলে রাস্তার নানা উৎপাতে পড়ে যেতে পারে। বৃষ্টিপাত হলে ধস নামতে পারে। কিংবা এমন ধুলোর ঝড় উঠবে যে গাড়ি থামিয়ে চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া উপায় থাকবে না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওয়াফাতে পৌঁছাতে না পারলে, শেষ পর্যন্ত কতদূর যাওয়া যাবে বলা মুশকিল।

থার্ড আবার এই শহরে কবে আসবে, কি আর আসাই হবে না, যতটা পারা যায় ঘুরিয়ে দেখানো। বন্ধুপ্রীতি কত গভীর। থার্ড না থাকলে, তারও ঘোরার সুযোগ হত না। আর যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওয়াফায় পৌঁছানো যায় তবে ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলতে হবে। দুটোই এক সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। দরকারে পাহাড়ের ফরেস্ট বাংলোতে আস্তানা পাড়তেও হতে পারে।

গাড়ি কোথাও কোনো উৎপাতে না পড়লে সোজা টিয়ট পার্কে—তারপর সেখান থেকে তফেলবার্জে—সেখান থেকে সকালে রওনা হয়ে টিয়ট-পিকে পৌঁছাতে হবে। গাড়িতে এমনই কথাবার্তা হচ্ছিল। সকালে খাড়া পাহাড়ে উঠে যাওয়া বেশি সুবিধাজনক। ওঠার জন্য নানা জিনিসপত্রও সঙ্গে নেওয়া হয়েছে।

কুসুম সঙ্গে আছে। গোপালের কাছে এটাই বড় কথা। যতই দুঃসাহসিক অভিযান হোক সে ঘাবড়ে যাবে না। কুসুমের কাছে সে খাটো হতে পারে

না। ভারতীয় বলে, ভীরু হবে কেন। তার মনে হচ্ছিল, জাহাজে না এলে জীবনেও এত বড় অভিযানের সুযোগ পেত না। পাহাড়-সমতল-খাড়াই, সা করে গাড়ি ঘুরে গেলে, সে আতঙ্কে চোখ বুজে ফেলেছে। নিচে গভীর খাদ। বুক ধুকপুক করছে। গেল বুঝি সব। গাড়ি গড়িয়ে পড়লেই নিশ্চিহ্ন। কিন্তু গোপাল খুব সাহসী। সে বোকা বনে না যায়, তার জন্য শিস দিতে থাকল। শিস দেওয়া যে কখনও কখনও অসভ্যতার পর্যায়ে পড়ে গোপালের বেচাল ভাব ভঙ্গীই তার প্রমাণ। কুসুমের কাছে ধরা পড়েও যেতে পারে। কুসুম সে-জন্যও তাকে কুনুইতে ঠেলা মেরে স্বাভাবিক থাকার নির্দেশ দিতে পারে। যাই হোক খুবই মূল্যবান সহযোগিতা মেয়েটির।

গাড়ি যেন হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে স্টিফেন। গোপালের নতুন অভিজ্ঞতা—এত জোরে গাড়ি চলতে পারে—সে জানত না। কেমন হালকা হয়ে গেছে সে। ঝাঁকুনি সামলাতে না পেরে সে কুসুমের গায়ে ঢলে পড়ছিল। কুসুম নিজেকে সোজা রাখতে পারছে না। দুমদুম করে যেন গভীর বনে বাদ্য বাজছিল। কুসুমের শরীরে আশ্চর্য সুবাস। চুলের ঘ্রাণ আরও মনোরম। চোখ নীল বলে বড় বেশি তাজা। তার যে কি হয় কেন যে আদর করতে ইচ্ছে হয়—এমন সাংঘাতিক সুযোগ সে দেশবাড়িতে আশাই করে না। মেয়েরা বড় হতে থাকলেই কেন যে সব মা মাসিরা চাপাচুপি দিয়ে রাখে! এমন খোলামেলা ব্যবহারে কুসুমকে সে ভাল না বেসে থাকে কি করে!

গাড়িটা এখন বিশাল অরণ্যের মধ্যে ঢুকে গেছে। বিশাল সব বৃক্ষ—যতদূর চোখ যায় বাওবাব গাছের ছড়াছড়ি। জঙ্গল থাকলে আদিবাসীরাও থাকবে। স্টিফেনই বলল, 'ওদিকটায় গেলে সোনারখনি দেখানো যেত। হাতে সময় কম, তা-ছাড়া পাসটাস জোগাড় করারও ঝামেলা। কারণ সব এলাকায় খুশিমতো ঢোকা যায় না।'

বেশ বেলা থাকতেই গাড়ি পিকের ঢালুতে ঢুকে গেল। লাফিয়ে বের হয়ে এল থার্ড। স্টিফেন দড়িদড়া টেনে বের করল। কারণ দ্রুত কাজ সারতে না পারলে উপরে ওঠা যাবে না। ত্রিশ চল্লিশ ফুটের মতো উঁচু খাড়া পাথরের মালভূমি। উপরে উঠে গেলেই দূরের বনজঙ্গল, এবং বুনো ফুলের সাম্রাজ্য আবিষ্কার করা যায়। রোদের আভায় বুনো ফুল প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়াতে থাকে—অন্তত পাহাড়ের উপর থেকে তাই মনে হয়। এমন এক মনোরম সৌন্দর্য উপভোগ করার সুযোগ কম মানুষের ভাগ্যেই ঘটে।

গোপালও গাড়ি থেকে নেমে গেল। কুসুম ছুটে গেল তার বাবার কাছে।

দড়িদড়া এগিয়ে দিতে থাকল। থার্ড দূরবীন চোখে লাগিয়ে চারপাশটা দেখছে। তাকেও একবার দিল। সে জঙ্গলের মধ্যে বাঘ হরিণ খুঁজল। কিছুই দেখতে পেল না। শুধু মনে হল নির্জন প্রান্তরে এক নদী তার ধারাবাহিকতা কতকাল ধরে যেন বজায় রেখে চলেছে।

পাহাড়ের ঢালুতে গাড়ি। গাড়িতে কুসুমের মা। তিনি উপরে উঠবেন না বোঝাই গেল। কুসুম ছুটে যাচ্ছে। কুসুম ছুটে গেলে গোপাল না ছুটে পারে ! কারণ ততক্ষণে দড়িদড়া ধরে পাহাড়ের খাঁজে পা রেখে তর তর করে উঠে গেল স্টিফেন। থার্ডও তর তর করে ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে ফসকে পড়ে গেল, এবং দড়িতে ঝুলতে থাকল। স্টিফেন দড়ি খুঁটির সঙ্গে আটকে রেখেছে বলে রক্ষা। খুঁজে পেতে পাহাড়ের খাঁজে পা রেখে থার্ডও উপরে উঠে গেল। সেও পারবে। দৌড়ে দড়ি ধরতে গিয়ে গড়িয়ে পড়ল। সে উঠে দাঁড়াল। আবার দৌড়াল। এবং সেও ঝুলে পড়লে, স্টিফেন আর থার্ড দু'জনে টানাটানি করে উপরে তুলে নিয়ে গেল। সে উপরে উঠে ঝুঁকে দেখল, কুসুম বড় সহজে দড়িতে ঝুলে ঝুলে উপরে উঠে আসছে। কুসুমের অভ্যাস আছে। তার নেই। তার হাঁটুর ছাল চামড়া উঠে গেছে—কুসুমের কোথাও বিন্দুমাত্র লাগেনি। তার নাস্তানাবুদ অবস্থা দেখে কুসুম নিচ থেকে চিৎকার করেছিল। হেই বাচ্চা নাবিক, নিচে তাকাবে না। উপরে তাকাও। নিচে তাকালে মাথা ঘুরে যাবে। সাহস হারিয়ে গেলে, গায়ে শক্তি পাবে না। দুশ্চিন্তায় কুসুমের মুখ কালো হয়ে গেছিল। কুসুমের বুঝতে অসুবিধা হয়নি, সে আনাড়ি, খুবই আনাড়ি। তার অবস্থা দেখে কুসুম হাসতে পারত, মজা করতে পারত—কিন্তু কিছুই করেনি। বরং বিচলিত কুসুম। কুসুমের জন্য তার কেমন মায়া জন্মে গেল। কুসুম উপরে উঠেই তার হাত পায়ে কোথায় লেগেছে দেখার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকলে, সে বলল, 'আমার লাগেনি—বলছি তো লাগেনি ! আরে তুমি কি ! আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না !'

এর পরও কি কুসুমকে ভাল না লেগে পারে !

স্টিফেন থার্ডকে নিয়ে আরও উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। আশ্চর্য গোপাল ! এমন আগুনের মতো কিশোরীকে কোনো অপরিচিত যুবকের জিম্মায় রেখে কেউ জঙ্গলে ঢুকে যেতে পারে ! আরে তুমি না কুসুমের বাবা ! মেয়েটার নিরাপত্তার কথা ভাববে না। গোপাল তো ভেবেই পায় না, সে কি করবে ! তারও কি উচিত স্টিফেনের সঙ্গে জঙ্গলে ঢুকে যাওয়া। কুসুম একা থাকলে শোভন। সে কুসুমের পাশে থাকলেই অশোভন। সারেঙসাব জানতে পারলে

চটে লাল হয়ে যাবেন। আগুন আর ঘি বলে কথা। খুবই দাহ্য পদার্থ।

গোপাল শোভনতার খাতিরে জঙ্গলের দিকে হেঁটে যেতে থাকলে দেখল কুসুম দৌড়ে আসছে। পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে পড়ছে। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে ওর হাত ধরে ফেলল। বলল, 'কোথায় যাচ্ছ!'

গোপাল বলল, 'জঙ্গলে।'

'জঙ্গলে কেন!'

'ওরা যে গেল।'

'যাক না। ওরা গেছে বলে তুমিও যাবে! আমরা ওদের সঙ্গে গিয়ে কি করব। এস।'

গোপাল বেকুফ।

কুসুম বলল, 'চল, ওদিকটা ছোট্ট হ্রদ আছে। ওর পাশে বসব।'

নির্জন জায়গায় এমন এক কিশোরী তার সামনে—চারপাশে নানা জাতের ক্যাকটাস। নানা রঙিন ফুল। সামনে হ্রদ। বিচিত্র রঙের পাথরের ছড়াছড়ি। আর দূরে ধাপে ধাপে পাহাড়শ্রেণী নেমে গেছে। বন জঙ্গলের গভীর নৈঃশব্দ শুধু বিরাজমান। এমন নির্জন এবং দিগন্ত ব্যাপ্ত আকাশ সীমানায় উঠে গিয়ে গোপাল স্থির থাকতে পারছে না। তার সাহসও নেই। অথচ যেন হাত বাড়িয়ে দিলেই কুসুম লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। এ কি ঘোর আকর্ষণে সে পড়ে যাচ্ছে! কুসুম তার হাত ধরে টানছে। এক জায়গায় বসতে দিচ্ছে না। হ্রদটা দেখতে হলে তার পাড়ে পাড়ে ঘুরে বেড়াতে হয়। হ্রদের সৌন্দর্য এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে ঠিক ধরা যায় না। শান্ত জলরাশি, লতাগুল্মে হ্রদের শোভা—নানা কীট পতঙ্গ এবং জলজ প্রাণী মিলে এমন ঘোর সৃষ্টি করতে পারে হ্রদের চারপাশে ঘুরে না বেড়ালে সে টেরই পেত না।

কুসুমকে মাঝে মাঝে খুবই তরলমতি বালিকা মনে হয়। গোপালকে একা পেয়ে কি করবে বুঝতে পারছে না। হ্রদের পাড়ে বসে থাকতে তো ভালই লাগে। কত সব পাখির ওড়াউড়ি। ফড়িং প্রজাপতির ওড়াউড়ি। সে ফ্রক টেনে বসল। আবার তার ফ্রক হাঁটুর উপর উঠেও যায়। দুই জংঘার মধ্যবর্তী কোনো সোনালি হরিণের মুখ বুঝি উঁকি দিয়ে আছে। কুসুম কি তাকে প্রলোভনে ফেলে দিচ্ছে! তার ঘনিষ্ঠ হয়ে বসা, ছুটে যাওয়া অথবা পাথরের উপর তার হাত ধরে চুপচাপ বসে থাকা—এমন সব দৃশ্য তার স্বপ্নেরও অতীত।

কুসুম ওর গালে গাল লেপ্টে দিল।

গোপাল বুঝতে পারছে না, সে কিভাবে সাড়া দেবে। যদি কোনো কেলেঙ্কারি করে ফেলে সাড়া দিতে গিয়ে। সে তো সুবোধ বালক। তার পক্ষে খারাপ কাজ করা শোভন নয়। স্টিফেন বিশ্বাস করে রেখে গেছে। বিশ্বাসের অমর্যাদাও করতে পারে না।

তবু কুসুম ছাড়ার পাত্র নয় বোধ হয়।

কুসুম বলল, চল সামনে। দেখবে আমরা কত উপরে উঠে এসেছি। এখানে বসে থাকলে টের পাওয়া যায় না। বলেই কুসুম ক্যাকটাসের জঙ্গলে ছুটে গেল। সে যাচ্ছে না। তার ভয় করছে। ভয় কুসুমকে নয়, ভয় স্টিফেন কিংবা থার্ড যদি জঙ্গলের আড়াল থেকে তাদের প্রতি নজর রাখে। কিন্তু কুসুম শোনার পাত্রই নয়। সে দৌড়ে এসে হাত টেনে তাকে তুলে নিল।

বোঝাই যায় কুসুম আরও অনেকবার এখানে এসেছে। এটা যে একটি দর্শনীয় জায়গা তাও গোপাল বুঝতে পারল। দূর দূর থেকে সব গাড়ি আসছে। গাড়িগুলি ফরেস্ট বাংলোর দিকে চলে যাচ্ছে। রাত কাটিয়ে সূর্যোদয়ের সময় তারা এই পাথরের মালভূমিতে বোধ হয় উঠে আসবে।

ক্যাকটাসের জঙ্গল পার হয়ে দেখল, অদ্ভুত সব ঠাকুর দেবতার মতো পাথরের বিশাল বিশাল সব মূর্তি। যেন পাহাড় কেটে খোদাই করে রেখে গেছে কারা। এগুলি যে প্রকৃতির অপূর্ব সৃষ্টি বোঝাই যায় না। চোখ কান নাক না থাকলেও, হাত পা'র হদিস না থাকলেও দূর থেকে এদের কোনো অজ্ঞাত কারিগরের রহস্যময় শিল্পকীর্তি মনে হয়। বড় বড় সব খয়েরি রঙের পাথর, আবার গোলাপী রঙের পাথরও আছে। সূর্য কিরণে সবই উদ্ভাসিত। সূর্য কিরণে কুসুমও উদ্ভাসিত। কুসুম বড় একটা পাথরে চুপচাপ শুয়ে আছে। আকাশ দেখছে।

কুসুম তড়াক করে উঠে বসল। তার কাছে এসে বলল, 'ভাবতীয়রা খুব বোকা হয়।'

গোপাল বলল, 'না। কখনও তারা বোকা হয় না। তারা সভ্য জাতি।' আসলে গোপালও ভাল নেই। কিভাবে সাড়া দিতে হয় এটাই সে জানে না। এটাই তার বড় প্রতিবন্ধক। সে কুসুমের টানে যে কোনো নির্জন দ্বীপে চলে যেতেও যেন রাজি। এবং কিছুটা এ কারণেই সে নির্বোধ হয়ে গেছে। কুসুম শিখিয়ে পড়িয়ে না নিলে, সে কিছুই করতে পারবে না। সে বোঝে তাকে পৃথিবীর এক অত্যন্ত গোপন জায়গায় কুসুম নিয়ে এসেছে। যেন পাথর ভাঙলেই হাতের মুঠোয় স্বর্ণপিণ্ড। কুসুম বুঝি দেখছে, সে পাথর ভাঙতে

কতটা পটু। কুসুম শেষমেশ আর না পেরে গোপালকে জড়িয়ে ধরল। চুমু খেল। গোপাল উষ্ণতায় অধীর ছিল। জড়িয়ে ধরতেই কি যে হয়ে গেল—কুসুমের আলিঙ্গনেই এত আগুন, যে তার সব গলে গেল। কুসুম বিন্দুমাত্র অবকাশই পেল না। গোপালের জাঙ্গিয়া নষ্ট। এবং সে কেমন বোবার মতো কুসুমকে দেখছে।

কুসুম খেপে গেল।

খেপে গেলেই তো হয় না। তার কোনো আর স্পৃহাও নেই। সে যে এখন কি করে! ধরা পড়ে যেতে পারে। প্যান্ট নষ্ট। তাড়াতাড়ি সে ছুটে হ্রদের জলে নেমে গেল।

সামনের জলাশয়টি না থাকলে ধরা পড়ে যেত। কুসুম চিৎকার করছে, 'বাচ্চা নাবিক তোমার কি হয়েছে! ঠাণ্ডায় জলে নেমে গেলে! কি হয়েছে তোমার!'

গোপাল জল থেকে উঠে আসছে। কুসুমের দিকে তাকাতে পারছে না। সদ্য পাথর ভাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় এমন নাজেহাল হতে হয় সে জানত না। উষ্ণতায় অধীর হয়ে ছিল, সুযোগ আর পেল না। কি যে হয়ে গেল! সে জল থেকে উঠে আসছিল। কুসুমকে বলতেও পারছে না—তার প্রথম সুযোগ সে নিজেই নষ্ট করেছে। পাথর ভেঙ্গে স্বর্ণপিণ্ডটির খোঁজ আর পেল না। তার আগেই সে কাহিল। জলাশয়ে নেমে যাওয়া ছাড়া তার আর অন্য উপায়ও ছিল না। সে যেন তবে ধরা পড়ে যেত। নিজের নষ্ট হয়ে যাওয়া আড়াল করতেই সে জলাশয়ের আশ্রয় নিয়েছে। তার কোমর পর্যন্ত জলে ভেজা। কেউ আর টের পাবে না। সারেঙসাবের কথা মনে হল তার। তিনি ঠিক জাহাজ ডেকে দাঁড়িয়ে আছেন। গোপাল ফিরছে না কেন ভাবছেন। তিনি তো জানেন না, তার গোপাল, পৃথিবীর আদিমতম রহস্যটির আকর্ষণে এখন সব কিছু অন্ধকার দেখছে। তার বাবা-মা-র কথা মনে পড়ছে না। এই অরণ্যের কোথাও সে ইচ্ছা করলে নিজের বসবাসের ঠিকানাও খুঁজে পেতে পারে। তার কিছু ভাল লাগছে না।

জল থেকে উঠে আসায় কুসুম কিছুটা আশ্বস্ত হল। কি দেখল তার চোখে গোপাল বুঝতে পারল না। বাওবাব গাছের ছায়ায় হাঁটতে হাঁটতে কুসুম বলল, 'জাহাজ কবে ছাড়ছে?'

'জানি না।' গোপাল আর কিছু বলতে পারল না। তার কেন যে কুসুমকে ছেড়ে এক দণ্ড কোথাও থাকতে কষ্ট হয়। কুসুম তাকে এ কি ঘোরে ফেলে

দিল।

কুসুম বলল, 'দুপুরে চলে এস। বাড়িতে একা থাকি। তুমি এলে ভাল লাগবে।'

এই আমন্ত্রণে মানুষের জীবন যে ওলটপালট হয়ে যায় কুসুম বোধ হয় জানে না। সে শুধু বলল, 'আসব।'

গোপাল কথা বলতে পারছিল না। তার শীত করছিল। শীতে কাঁপছে। কুসুমও কি বুঝতে পেরে বলল, চল আমরা নিচে চলে যাই। ভিজা-প্যান্টে তোমার ঠাণ্ডা লাগছে। জামা প্যান্ট পাল্টানো দরকার। সে খুঁজল তার বাবাকে। কি যে করবে! ইচ্ছে করলেই তো আর বাড়তি জামা-প্যান্ট সে পাবে না। বাচ্চা নাবিক না আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে। সে নিচে নামার সময় দেখল, তার বাবা আর থার্ড নিচে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের জন্য প্রতীক্ষা করছে।

শরীরের ক্রিয়াকলাপে এমন সব অবোধ স্পৃহা থাকে এবং কখনও নির্গত হলে সব কিছু বিস্বাদ ঠেকে গোপাল এই প্রথম টের পেল। এমন সুযোগ সে অবহেলায় নষ্ট করেছে। না তার মধ্যে এখনও শারীরিক ক্রিয়াকর্মে দুর্বলতা থেকে গেছে। বড় হতে হতে সব সে করায়ত্ত করবে—এবং আরও সুযোগ এলে, সে নিশ্চয়ই কুসুমকে খুশি করতে পারবে। এই সব ভাবতে ভাবতে নিচে নামার সময় বলল, 'আমি আবার আসব কুসুম।'

॥ নয় ॥

জাহাজে ফিরে গোপাল আর উৎসাহ পায় না। চিমনিতে আবার কে লিখে রাখছে—বেটার বি পুওর অ্যান্ড অনেস্ট দ্যান রিচ অ্যান্ড ডিজঅনেস্ট।

গোপাল ঘাবড়ে যায়। এ-সব কি হচ্ছে!

ঠিক বাবেতির কাজ। তাকে এই দায় কে দিল!

একদিন আবার গোপাল দেখতে পায় চিমনিতে লেখা, রুডি, ইট ইজ ডেনজারাস অ্যান্ড সিনফুল টু রাশ ইনটু দ্য আননোন।

বাবেতি কেন তার এত পেছনে লেগেছে বুঝতে পারে না। সে কি করছে না করছে, তার জন্য তার এত মাথা ব্যথা কেন। থার্ড কি সব বাবেতিকে বলে। থার্ড তো বলল, বাবেতি বলে জাহাজে কেন, কোথাও কেউ আছে বলে জানে না। বাবেতি কারো সঙ্গে মেশেও না। তার আচ্ছন্ন অবস্থায় কি সে দেখতে পায় সব। এমন কি কোনো অলৌকিক উপায় আছে—যার ক্ষমতা

অসীম। বাবেতি কি সেই ক্ষমতার অধিকারী ! না হলে সে লিখবে কেন, ইট ইজ ডেনজারাস অ্যান্ড সিনফুল টু রাশ ইনটু দ্য আননোন। কুসুম যে তাকে ঘোরের মধ্যে ফেলে দিয়েছে বাবেতি টের পায় কি করে ! তবু যা হয়, সে কিছুই গ্রাহ্য করে না। বাংকে শুয়ে থাকলে তার হাই ওঠে। দুপুরে যেতে বলেছে। কিছুতেই সুযোগ করে উঠতে পারছে না। যায় কি করে ! কাজ থেকে ছুটি নিতে পারছে না। অসুস্থ হলে এক কথা। দুপুরে একা বের হয়ে গেলে ধরা পড়ে যেতে পারে। ভাবতে পারে জাহাজ থেকে সে ভাগবার তালে আছে। সারেঙসাব টের পেলে তুলকালাম কাণ্ড করে ছাড়বেন। তা-ছাড়া থানা পুলিশ হতে পারে। জাহাজ থেকে ভেগে যাওয়া গুরুতর অপরাধ। সারেঙসাব যেন জাহাজে উঠেই এটা টের পেয়ে গেছিলেন। সর্বক্ষণ নজরদারি। দুপুরে মাত্র এক-ঘন্টার ছুটি। সামনে কোনো রবিবারও নেই। তার আগেই জাহাজ ছেড়ে দেবে। দুপুরে ছুটির সময় মেসরুমে বসে সবাই খায়। তাকে মেসরুমে দেখতে না পেলে সারেঙসাব খোঁজাখুঁজি শুরু করে দেবেন। জাহাজে তোলপাড় শুরু হয়ে যাবে—কোথায় গেল !

তিন নম্বর সাবের ঘরে যদি থাকে ?

না নেই।

আফটার-পিকে !

না নেই।

বাটলারের ঘরে।

না নেই।

স্টোকহোলডে, কয়লার বাংকারে, হ্যাচের ভিতর, ইনজিন-রুমে স্টিয়ারিঙ ইনজিনে—

না নেই।

ব্যস তবেই হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর হয়ে যাবে—গোপালকে জাহাজে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সারেঙসাব হন্তদন্ত হয়ে ছোটাছুটি লাগিয়ে দেবেন। কাপ্তান মাস্তার দিতে বলবেন। সবাই হাজির—কেবল বাচ্চা নাবিকের পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না।

এক হুলুস্থুল কাণ্ড। সারেঙসাব হয়তো বলবেন আমি জানতাম। আর সঙ্গে সঙ্গে থার্ডমেট ছুটবেন স্টিফেনের বাড়িতে। বাচ্চা নাবিককে পাওয়া যাচ্ছে না।

গোপাল যত ভাবছে তত মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যায় কুসুমের বাড়ি

গেলে বলে আসতে হবে, না, দুপুর বের হতে পারব না। ধরা পড়ে যাব। অসুবিধা আছে।

অথচ কুসুমের আকর্ষণে সে ভিতরে ভিতরে পাগল হয়ে যাচ্ছে। কুসুম তার কাছে কিছুতেই আর অপরিচিত নয়। এটা হতেই পারে না—ইট ইজ ডেনজারাস অ্যান্ড সিনফুল টু রাশ ইনটু দ্য আননোন। কুসুম তার যেন জন্ম জন্মান্তরের সঙ্গী। কুসুমের রহস্যময় শরীর নরম স্তন এবং নাভিমূলের সৌন্দর্য নিখোঁজ জাহাজের বাতিঘরের সামিল। গোপাল ক্রমে অস্থির হয়ে পড়ছে। কুসুমের জন্য এক আশ্চর্য টান গড়ে উঠেছে। সব রসাতলে গেলেও কুসুমকে ছাড়তে রাজি না।

কুসুম সারাদিন তার জন্য অপেক্ষা করে। গেলেই সে এটা টের পেত। স্কুলে হয়তো সে তার বাচ্চা নাবিক বন্ধুটির গল্পও করে থাকে। সে হয়তো সুন্দর সুন্দর গল্প তৈরি করে ফেলেছে তাকে নিয়ে।

রাতে যায়। হৈ হুল্লুর হয়। সবাই মিলে বেড়াতে বের হয়। অথচ কুসুম বলছে না কেন, কই তুমি দুপুরে এলে না। দুপুরে একা থাকি--

এও হতে পারে সারা দুপুর সে একা। স্কুলে ছুটি চলছে। দুপুরে তার সময় কাটে না। সে জন্যও বলতে পারে। নানা সংশয়ে সে ভুগছে।

দুপুরে না গেলে গোপাল বুঝতে পারছে না, আসলে কুসুম কি চায়। অথচ এত সংকোচ যে দেখা হলে বলতেও পারে না, দুপুরে কেন আসতে বলছ! দুপুরে আসা খুব মুশকিল।

এক সাঁজবেলায় কথাটা বলতেই কুসুম মুখ ব্যাজার করে ফেলল। গোপালের দিকে তাকিয়ে থাকল বড় বড় চোখে। কিছু বলল না। যেন আভাসে ইঙ্গিতে বলা, অসুবিধা থাকলে আসবে না। কুসুম কি তাকে পরীক্ষা করতে চায়। সে তার জন্য জীবনের আর সব কিছু তছনছ করে দিতে শিখুক।

আবার চিমনিতে লেখা ভেসে উঠল। সার্চ ফর হিম অ্যান্ড ফর হিজ টেনডারনেস অ্যান্ড সার্চিং। সে যত চিমনির লেখা মুছে দিচ্ছে, তত অদ্ভুত সব কথা বার বার লিখে রাখছে বাবেতি। তার এমন কি কোমল রহস্য আছে যা আবিষ্কারের জন্য তাকে ক্রমাগত চেষ্টা করে যেতে বলছে। সেটা কি!

এ কি পাগলের পাল্লায় পড়ে গেল সে। অথচ পাগলের মাথায় এত সুন্দর সুন্দর কথা জন্ম নেয় কি করে! বাবেতিকে দেখা যায় বোট-ডেকে। দেখা যায় টুইন-ডেকে। কুকুরটা সঙ্গে থাকে। কুকুরটা তাকে ছেড়ে কোথাও যায় না।

সে ইচ্ছে করলেই বলতে পারে না—বাবেতি তুমি কি বলত, কেন তুমি রুডিকে এত উপদেশ ঝারছ। রুডি আসলে কে, আমি না অন্য কেউ। সে কি কোনো নিখোঁজ রাজপুত্র না নিখোঁজ রাজকন্যা! যে তোমার জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়ায় কঠিন ব্যধিতে আক্রান্ত। যার জন্য তুমি এত আচ্ছন্ন থাক। যার জন্য রুডিকে আমার ভিতর মাঝে মাঝে আবিষ্কার করে ফেল! আমি সামান্য নাবিক। এ-সব কথা কাউকে বলাও যায় না। কেমন এক লৌহ যবনিকার অন্তরাল থেকে তুমি মুক্তি পেতে চাইছ। মুক্তি না পেয়ে ছটফট করছ। কুসুমকে তুমি চেন না। সে খুব ভাল মেয়ে। সে চায় সব কিছু তার জন্য অবহেলা করি। তুমি বুঝবে না বাবেতি, আমার কি কষ্ট। বুঝলে চিমনিতে এত সব উপদেশের কথা লিখে রাখতে না। কুসুম চায় তার দাম দিতে হলে, আমার কি হবে না হবে ভাবলে তাকে ছোট করা হবে। সে কোনো কৈফিয়তই শুনতে রাজি হবে না।

কি যে হবে!

ভিতরে ভিতরে এত কাতর হয়ে পড়ছে গোপাল যে সারেঙসাব ভয় পেয়ে গিয়ে একদিন বললেন, 'কি রে তোর কি হয়েছে। চোখ বসে গেছে! রাতে ঘুমাস না। ঠিক মতো খাস না। কেমন মনমরা হয়ে গেছিস!'

বোধ হয় সারেঙসাবের সেই এক আতঙ্ক—মানসিক অবসাদ। জাহাজিদের চিরকালের রোগ। শেষে আত্মহত্যা। তিনি কি জাহাজে ওঠার সময়ই বুঝে ছিলেন, এ ছেলে পারবে না।

কুসুম দুপুরে একা থাকে। একজন কাফ্রি মেয়ে থাকে বাড়িতে। বাড়ির কাজকর্ম করে। কুসুম তাকে নানা কাজে এখানে সেখানে ইচ্ছে করলেই পাঠিয়ে দিতে পারে। নানাভাবে কেবল ভাবছে, কুসুম আসলে তাকে কাছে পাবার জন্যই দুপুরে যেতে বলেছে। দুপুরে না গেলে তাকে একা পাওয়ার আর সুযোগ কোথায়।

তাদের বাড়ির নিচে কিছুটা হেঁটে গেলে সমুদ্র। অ্যাকাসিয়া গাছের ছায়ায় তারা গল্প করতে করতে বালিয়াড়িতে নেমে গেছে কতদিন। সে তার দেশবাড়ির গল্প করত। নদীর নাম বলত। বাবা তার দর্জি বলত—বাড়ির সামনে ধানের মাঠ, কোজাগরি লক্ষ্মীপূজা জ্যোৎস্নায় ফসলের খেত কিছুই বাদ যেত না। বড় অকপট কথাবার্তা। কুসুম অপলক চেয়ে থাকত। তার মুখে কি আছে কে জানে—সে তাকিয়ে থেকে বলত, আমি বড় হলে গোপাল তোমার দেশে যাব। বাবাও সুযোগ পেলে যাবেন বলেছেন।

কখনও কুসুম, এলিফ্যান্টা নদীর মোহানার গল্প করত। জলহস্তীর গল্প বলত, কুমীরের গল্পও বাদ যেত না। কুসুম অরণ্যের গল্প কেন এত ভালবাসে গোপাল বোঝে না। অরণ্য এক গভীর—তার সর্বত্র বিচরণ—এ-কারণে এই বালিকা কি বার বার গভীর অরণ্যে প্রবেশ করতে চায়—সবুজ চ্যামেলিয়ান এবং উটপাখির গল্পও তার প্রিয়। যেন প্রাণীজগতেরই এই স্বভাব—জোড়ায় জোড়ায় থাকার স্বভাব। আর সব অর্থহীন—সে তার বাবা মার কথা ভাই বোনের কথা বললে কুসুম কেমন গুম মেরে যেত। কুসুম তার বাবার সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে বড় হয়ে উঠেছে। গোপালের চেয়ে জীবন সম্পর্কে তার যেন অনেক বেশি অভিজ্ঞতা। বড় হওয়ার বয়সে স্বপ্নও থাকে নানা বর্ণের। তার সঙ্গে কথা বলার সময় কুসুমের চোখ মুখ দীপ্ত হয়ে উঠত। সে যখন হাসে গালে রহস্যময় টোল দেখা যায়।

গোপালের মনে হয়, কোনো মরুভূমি কিংবা যত দুর্গম অরণ্যই হোক সে আর কুসুম—কোনোও কুটীর—পাশে ঝর্না, পাতার ঘর এবং আদম ইভের মতো ফলমূল খেয়ে বেঁচে থাকা। এমন সব ছবি মাথার ভিতর ক্রিয়া করলে মাথা ঠিক রাখতে পারে না গোপাল। পাগল পাগল লাগে।

আবার চিমনিতে সে দেখল, হিজ টেনডারনেস কেটে বন্ধনীর ভিতর লিখেছে, হার টেনডারনেস। না আর কিছু না। সে কি ভুল দেখছে। হার টেনডারনেস—অর্থাৎ কি কুসুমের কোমল শরীরের কথা বলতে চায়। কি ইচ্ছে বাবেতির। হিজ টেনডারনেস কেটে হার টেনডারনেস কেন লিখল। কার টেনডারনেসের কথা বলতে চায়। বাবেতির না কুসুমের। বাবেতি কাপ্তানের পুত্র! সে কেন 'হার' হতে যাবে! সে ক্রমে অস্থির হয়ে পড়ছে। বাবেতি কি তার সঙ্গে এ-ভাবেই শয়তানি শুরু করতে চায়। সে কিছুটা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছে। কুসুমের এত খবর কি করে পায়। কুসুমের জন্য সে পাগল, এত বোঝে কি করে!

যত জাহাজ ছাড়ার সময় হয়ে আসছে তত ভেঙে পড়ছে গোপাল। জাহাজ ছেড়ে দিলে, কুসুমের সঙ্গে ইহজীবনে আর দেখা হবে না। সাঁজবেলায় তারা গোল হয়ে বসে থাকে। গল্পগুজব হয়। মাঝে মাঝে খাতায় নোট নেন, স্টিফেন। তাদের পূজা পার্বণ, কোন মাসে কি হয়—ফুল ফল বেলপাতা, তিল তুলসি কত কিছু লাগে। আহ্নিকের কিছু মন্ত্র তিনি নোট করেন। পারলৌকিক ক্রিয়ার কথাও তিনি জানতে চান। দাহ করা হয়, এবং অগ্নি ও হোম সম্পর্কিত তথ্য গোপাল যতটুকু জানে বলে। গায়িত্রী মন্ত্র সম্পর্কে জানতে চায়।

গোপাল হিন্দু ধর্মের এই গুহ্য কথা ভাঙে না। কারণ নিয়ম নেই। কারণ আর যাই পারুক নিজের ধর্মকে সে গুহ্য কথা প্রকাশ করে দিয়ে অশুচি করতে চায় না। গোপাল তখন চুপ করে থাকে।

ফলে গোপাল ভাবে, দুপুরের সেই নির্জন আবিষ্কার বোধ হয় আর তার হল না। সে কুসুমকে ছাড়া আর কিছু ভাবতেও পারে না। মাঝে মাঝে টের পায় কুসুম তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। সে অস্বস্তিতে ভোগে।

না পেরে একদিন কুসুম আড়ালে ডেকে বলেই ফেলল, 'এলে না তো! দুপুরে এস। তোমার ভাল লাগবে।'

এ-ভাবে সোজা সরল ইঙ্গিতে গোপালের গায়ে আগুন জমা হয়। চোখ জ্বালা করে। শরীরের উত্তাপে সে অস্থির হয়ে ওঠে। জাহাজে ফিরে এসে বাংকে চুপচাপ শুয়ে থাকে। তার কিছু ভাল লাগে না।

আর সেদিন বোধ হয় সত্যি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল গোপাল। জাহাজ ছেড়ে দেবে রাতে। ফল্কার কাঠ তোলা হয়ে গেছে। ডেরিক সব নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। দড়িদড়া জড় করে ফেলা হচ্ছে। মাস্তুলে চব্বিশ ঘন্টার ফ্ল্যাগ উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। জাহাজ ছেড়ে দেবার সঙ্কেত। জাহাজ থেকে কেউ আর নামতে পারবে না। গোপাল আড়ালে গ্যাঙওয়ে ধরে নেমে যাচ্ছে। কেউ বুঝতেই পারছে না। গ্যাঙওয়েতে কোয়ার্টার মাস্টার পাহারায়। তাকে অসময়ে জাহাজ থেকে নেমে যেতে দেখে তিনি ভ্রূ কোচকালেন। গোপাল অগত্যা কি করে। সে বলল, 'জেটিতে জামা উড়ে গেছে। তুলতে যাচ্ছি।' সে চতুর হয়ে গেল। সরল বিশ্বাসে কোয়ার্টার-মাস্টার টুলে বসে ঝিমোতে থাকলেন।

সে ছুটছে। জেটি পার হয়ে বন্দরের মুখে বাস ধরে ফেলল। কিছুটা হেঁটে সে যেন কোনো এক অতিকায় তাণ্ডবের মধ্যে পড়ে যাবার আগে দরদর করে ঘামছিল। ঠাণ্ডা হাওয়া নেই। চারপাশ উত্তপ্ত হয়ে আছে আজ। লন পার হয়ে ছুটে গেল। কুসুম ছুটে আসছে। কুসুম জানে, জাহাজ আজ রাতে ছেড়ে দেবে। সে কি তার জন্য বসে কাঁদছিল!

কুসুমেরও এক দণ্ড সবুর সইছে না। সে গোপালকে টেনে নিয়ে গেল ঘরের মধ্যে। নির্জন এই কাঠের বাংলো বাড়িতে কিছু অ্যাকাসিয়া গাছ, কিছু জিনিয়া ক্যানাস ফুল, কিছু গোলাপ ফুলের পাপড়ি শুধু ওড়াওড়ি করছে। হাওয়ায় অ্যাকাসিয়া গাছের পাতা ঝরে যায়। সমুদ্র থেকে পাখিরা উড়ে

আসে। হাওয়ায় কক কক করে ডাকে। তখন জাহাজে তোলপাড়—গোপালকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

আর দূরে তখন কে ডাকে—তোর ঘরবাড়ির কথা মনে পড়ে না! দেশে কি তোর নদী নেই! কারা লন পার হয়ে ভিতরে ঢুকে যায়।

সমুদ্রে সূর্যাস্ত হচ্ছে।

গেট থেকেই থার্ডমেট ছুটে আসে। স্টিফেন ফেরেনি—তার স্ত্রীও না। অবিন্যস্ত অবস্থায় মারগারেট দরজা খুলে দেয়।

'গোপাল, গোপাল এখানে এসেছে!' সারেঙের আর্ত জিজ্ঞাসা।

বাবেতি লনে দাঁড়িয়ে আছে। সে এই কটেজের সৌন্দর্য যেন উপভোগ করছে। সে বিচলিত নয়। তার আসাটাও কাম্য ছিল না। কারণ থার্ড জানে, কাপ্তানের পুত্রটি আবার কি না ঝামেলা পাকায়। সে, চিফ-অফিসার, সারেঙসাব জেটিতে নেমে এলেই কাপ্তানের পুত্র ছুটে নেমে আসছিল। কুকুরটি সঙ্গে। রুডি পালিয়ে যাবে—সে যেন দৃঢ়তাব সঙ্গে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। আশ্চর্য কাপ্তানও বাধা দেননি। তিনি বোট-ডেক থেকেই ইশারায় জানিয়ে দিয়েছেন যেতে চায় যখন নিয়ে যাও।

মারগারেট বলল, সেতো চলে গেছে।

ফোন সঙ্গে সঙ্গে। না জাহাজে ফিরে যায়নি। জাহাজ মধ্যরাতে ছেড়ে দেবে। গোপাল তবে গেল কোথায়!

স্টিফেন ফিরে এসে সব শুনে হতবাক। জাহাজে নেই—যাবে কোথায়!

মারগারেট কাপ্তানের পুত্রকে দেখে অবাক। লম্বা ছিমছাম এক তরুণ। ঢোলা গেঞ্জি গায়। ঢোলা প্যান্ট পরনে। এবং ঢোলা এত যে তাকে কিছুটা বেঢপই দেখাচ্ছিল। মারগারেট কেন যে ফুঁসছে বাবেতিকে দেখে!

মারগারেট বলল, 'সে এসেছিল। চলেও গেছে!'

কোথায় তবে গেল!

নিচে সমুদ্র গর্জন এবং সমুদ্রপাখিরা তেমনি ওড়াওড়ি করছে। আশেপাশে যদি লুকিয়ে থাকে। গোপাল কি পাগল হয়ে গেছে!

আর তখন পাহাড়ের নিচে সমুদ্রের বালিয়াড়িতে কাপ্তানের পুত্র ছুটে যাচ্ছে। কুকুরটা লাফিয়ে ছুটছে।

পাহাড়ের মাথায়, সারেঙসাবের আর্ত গলা—তুই কোথায় বাপজান! তোর ঘরবাড়ির কথা মনে পড়ে না। তোর বাবা মা-র কথা মনে পড়ে না। তোর

দেশে কি নদী নেই। নদীর খোঁজে বের হয়ে পড়লি কাফ্রিদের দেশে এসে। ডাকতে ডাকতে গলা ভেঙে গেছে সারেঙসাবের।

গোপাল চুপচাপ বসেছিল একটা পাথরের উপরে। ঘরবাড়ির কথা তার মনে নেই। বাবা মা-র কথা মনে নেই। নদীর কথা মনে নেই। পাহাড়ের মাথায় আছে কুসুম। তার নিচে সে পাথরে বসে আছে। জীবনে সে আর যেন কিছু চায় না। সমুদ্রের হাওয়ায় তার চুল উড়ছিল। আকাশে ভাসমান নক্ষত্রমালা।

হঠাৎ সামনে দেখল গোপাল, বাবেতি আর তার কুকুরটা দাঁড়িয়ে আছে। বাবেতি শুধু বলল, রুডি ইফ ইয়োর আই ইজ পিওর, দেয়ার উইল বি সানসাইন ইন ইয়োর সোল। জাহাজে চল। প্লিজ।

॥ দশ ॥

গোপাল বুঝত না, সারেঙসাব তার কে, বাবেতি তার কে। তবে এটাও ঠিক তারা না থাকলে জাহাজ তার ফেরা হত না। কাপ্তানের দায় শুধু লগ বুকে লিখে রাখা, গোপালকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। মিসিং। কলকাতা বন্দরে শিপিং অফিসে রিপোর্ট আর তার দেশের বাড়িতে তারবার্তা। গোপাল নিখোঁজ হয়ে গেছে। তবে কুসুমকে ছেড়ে এসে গোপাল ভাল নেই। সে খুবই মনমরা। আবার জাহাজ সমুদ্রে পড়তেই গোপাালের মনে হল—বাবেতি না থাকলে তাকে কেউ খুঁজে পেত না। সারেঙসাব না থাকলে তাকে খুঁজতেও কেউ যেত না। সে ঘোরে পড়ে গেছিল এটাও বোঝে। ড্যাং ড্যাং করে জাহাজ এখন নীল জলে ভেসে চলেছে।

গোপাল জানে সে গুরুতর অপরাধ করেছে। কখন বোর্ডে নোটিশ পড়বে এই এক আতঙ্ক। কাপ্তান খুশি মতো শাস্তি দেবেন। জাহাজের আইন কাননু, শৃঙ্খলা না হলে থাকে কি করে! তার কি শাস্তি হয় সেই নিয়ে নানা গুজব। জাহাজে কাপ্তানই সব। তিনিই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। বেচারা সারেঙসাবের মুখ কালো। গোপালের সঙ্গে তিনি কথাই বলছেন না। বেইমান—দেশের কথা ভাবল না। নদীর কথা ভাবল না। নেমে গেল। মর এবার। দ্যাখ তর কি হয় !জাহাজ থেকে ভেগে পড়ার শাস্তি কি হয় দ্যাখ।

জাহাজ যাবে বুয়েনস এয়ার্স। রাস্তায় স্যান্টোস বন্দরে রসদ নেওয়া হবে। প্রায় মাসখানেক লেগে যাবে। দক্ষিণ আমেরিকার কুল বরাবর কত দীর্ঘ দিন জাহাজ চলবে কেউ জানে না। আবার সেই অনন্ত জলরাশি, নীল আকাশ

এবং ক্ষ্যাপা সমুদ্রের মাতলামি।

সারেঙসাব সকালেই খবরটা আনলেন। 'হয়ে গেল। যাও এবার। এক হপ্তা জেল হাজত খাটো। আমার কি! আমি তোর কে? আর আমার কথা তুই শুনবি কেন। হিন্দুর পোলা বেইমানি করবি বেশি কি!'

'কী হল সারেঙসাব। গজ গজ করছ কেন! আরে মিঞাসাব, নিজের পোলা না, পরের পোলা। নিজের পোলা তো কাচকলা দেখাল, পরের পোলারে নিয়া কেন যে পড়লা বুঝি না! তোমার কথায় মাথা নাই পাততে পারে। বড় বেশি নিজের ভাবতে গ্যাছিলা গোপালরে। এখন বোঝ!' বড় টিণ্ডাল সুযোগ বুঝে দু' কথা শুনিয়ে দিল। সারেঙসাব ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। তবু তাঁর মাথা বিগড়ে গেল। বললেন, 'মিঞা নিজের কাম কর। আমারে নিয়া তোমার ভাবতে হবে না। তিনি দ্রুত নামছিলেন সিঁড়ি ধরে। কি খবর— সবাই খবরটা জানতে চায়। গোপালের কাজ কাম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। হয়তো দু দিন লেগে গেল—বিচার পর্ব শেষ করতে। রায়টা কি সবাই জানতে চায়।

গোপাল একদম পাত্তা দিচ্ছে না কাউকে। বিচারে দ্বীপান্তর হলেও যেন তার কিছু আসে যায় না। জাহাজে সে এখন হোমরা চোমড়া নাবিক। সবাই তাকে চেনে। সবাই নাম জানে। ঐ তো গোপাল যাচ্ছে—মেসরুম বয়রা আঙুল তুলে দেখাবে। ঐ তো গোপাল—চিফ কুক আঙুল তুলে বলবে। সব অফিসার ইনজিনিয়াররা সহসা গোপালের নিখোঁজের খবর পেয়ে গ্যাঙওয়েতে ভিড় করেছিল। সে উঠে এসেছিল ঠিক বাবেতির পেছনে পেছনে। বাবেতি তার কেবিনে চলে গেছিল। সারেঙের সঙ্গে সে তার ফোকসালে।

গোপাল আসলে বেশি ঘাবড়ে গেলেই এমন করে থাকে। শিস দিয়ে সিঁড়ি ভাঙে। লাফিয়ে সিঁড়িতে উঠে যায়। হা হা করে হাসে। সে যেন কিছুই গ্রাহ্য করছে না—ডেকে দাঁড়িয়ে রঙের টব বাজায়। দু দিন কাম না থাকায়, তার অবসর মেলা। সে পড়ে পড়ে ঘুমায়। জাহির ফোকসালে ফিরলে চা করে আনে। নিজের চা দুধ খরচ করে সবাইকে চা খাওয়ায়।

'তুই কি রে! ভয় ডর নাই!'

সে হাসে। হাসে এ-জন্য, বাবেতি নিজে গেছিল। সোজা কথা! কাপ্তানের পুত্র। বাবেতি কি রুডির নিখোঁজ হওয়ার খবরে অস্থির হয়ে উঠেছিল! কেউ তাকে আটকাতে পারেনি। স্বয়ং কাপ্তান হার মেনেছেন। সুতরাং সেই রুডির ভয় থাকার কথা না। ভয় করলে যেন বাবেতিকে ছোট

করা হবে।

সারেঙসাব বললেন, 'হয়ে গেল। সাতদিনের কারাবাস।'

ফোকসালে সবাই ভিড় করেছে।

'ও গোপাল, যা দণ্ড খালাস করে আয়।'

কারাবাসটা কি, কেমন গোপাল জানে না। সাত দিন তাকে কোথায় রাখা হবে জানে না। সাত দিন কি সে কারো সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে!

সারেঙসাবকে দেখে মনে হল রায় শুনে মাথার বোঝা তাঁর অনেকটা নেমে গেছে। লগ বুকেও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। ছেলেমানুষ। চিফ অফিসার তাঁকে ডেকে সব বুঝিয়ে দিলে সারেঙসাব খুশিই হয়েছেন। 'নলি' খারাপ করে দিলে বেচারা আর জীবনে জাহাজ পেত না। কাপ্তান খুবই দয়ালু বলতে হবে।

তবু কারাবাস যে নিতান্ত সামান্য শাস্তি নয় গোপাল এটা হাড়ে হাড়ে শেষে টের পেল।

ফরোয়ার্ড-পিকে নির্জন পরিত্যক্ত একটি কেবিনে তাকে নিয়ে যাওয়া হল। কেবিনটি যেন কতকাল ব্যবহার করা হয়নি! ঝুলকালিতে মাখামাখি। এবং এই কেবিনেই থাকে মৃত জাহাজির জন্য কফিন ইটপাথর, সাদা থানকাপড়। বাইবেল, কোরাণ—যার যা ধর্ম, মৃতকে সলিল সমাধি দিতে হলে প্রয়োজনীয় যা কিছু কেবিনটাতে এক কোণায় জমা করা আছে। চটের বস্তা। কফিনের ঢাকনা খুলে সারেঙসাব কি দেখলেন! তিনিই সঙ্গে আসতে পারেন। আর কেউ নয়। কফিনের ভেতর যে কিছু নেই ঢাকনা খুলে যেন দেখানো হল গোপালকে—'গোপাল ভয় পাস না।' কটা আড়শোলা ফর ফর করে বের হয়ে এল। একটা বাংক। বাংকে মেট্রেস পাতা। কম্বল এবং চাদর সারেঙসাব নিয়ে এসেছেন। চাদর পেতে বললেন, 'সাতটা দিন বাপজান, দেখতে দেখেত কেটে যাবে। এখানে পানি থাকল। গোসলের পানি রোজ দিয়ে যাবে বাহার। ভাণ্ডারি খানা পাঠিয়ে দেবে। দরজা বন্ধ করে দিলাম।'

গোপাল বলল, 'পেশ্চাপ করব কোথায়!'

সারেঙসাব আবার ভেতরে ঢুকলেন। কাঠের যে একটি পার্টিশান আছে, সংলগ্ন একটি বাথরুমও আছে দেখিয়ে দিলেন। আর দেখালেন, গোসল করার পানিরও বন্দোবস্ত আছে। সারেঙ বললেন, 'সাতটা দিন বাপজান, ভাবিস না দেখতে দেখতে কেটে যাবে। গুরু পাপে লঘু দণ্ড, কাপ্তানের মেহেরবাণীতে

বেঁচে গেলি।'

গোপাল বলল, 'আপনি যান তো। কেবল বকর বকর করছে।'

সাঁজবেলায় শুরু কারাবাসের। ভিতরে কোনো আলোর ব্যবস্থা রাখা হয়নি। নিয়ম নেই। দরজা বন্ধ করে দিলে গাঢ় অন্ধকার। মাথার উপর পোর্ট-হোল ছাড়া আলো আসার কোনো রাস্তা নেই। সে বাংকে উঠে পোর্ট-হোলে মুখ রেখে দেখল, সামনে সমুদ্র। সমুদ্র ছাড়া কিছু দেখা যায় না। ডেকমুখি কেবিন, ডেক ধরে দরজা খুলতে হয়। এবং কেবিনে কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধও সে পেল। পেতেই পারে—যদি মৃতদেহ বন্দর পর্যন্ত নিয়ে যেতে হয়, তবে এই ঘরটাতেই বরফ দিয়ে রাখা হয়। যদি কেউ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, তবে এই কেবিনেই তাকে ফেলে রাখা হয়। কারাবাসের উপযুক্ত জায়গাই বটে। সবচেয়ে আশ্চর্য, সে জাহাজে আছে না, কোনো গুহার মধ্যে ঢুকে গেছে এখন বুঝতে পারছে না। তার কেমন গলা শুকিয়ে উঠছে। খুবই নিষ্ঠুর ব্যবস্থা। ঘোর অন্ধকারে হাত দিয়ে বুঝতে হচ্ছে—বাংক কোন দিকে। বাংকে বসে মনে হল, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। হাত পা টাল হয়ে যাচ্ছে।

অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে কিছু খুঁজতেও ভয় পাচ্ছে—যে সে কফিন ছুঁয়ে দিলে আর ঘুমাতেই পারবে না। কয়েদিদের জন্য কি কোনো আলোর ব্যবস্থা থাকে না! সে তো জেল পলাতক নয়—জানবে কি করে! জাহাজ দক্ষিণ মেরুর দিকে যাচ্ছে—ক্রমে আরও ঠাণ্ডা বাড়বে। সে এই ঠাণ্ডায় রাত কাটাবে কি করে বুঝতে পারছে না। জড়সড় হয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আছে। ঘুম আসবে না সে জানে। তার ঘুমের দরকারও নেই। দিনের বেলায় ঘুমিয়ে পুষিয়ে নেবে। কিন্তু সারারাত জেগে থাকাও কষ্ট।

আড়শোলার উৎপাতে কেবিন কেমন ফর ফর করে পাখা মেলে দিচ্ছে। এত আড়শোলা! আড়শোলার দাপট থেকেই আত্মরক্ষা করা কঠিন। জাহাজে আড়শোলার উপদ্রব থাকে। বন্দরে জাহাজ এলে স্প্রে করা হয়—অন্তত কোনো ফোকসালেই সে আড়শোলা দেখেনি। ইচ্ছে করেই হয়তো এই কেবিনে স্প্রে করা হয় না। রাজ্যের আড়শোলা এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। মনে হচ্ছিল, আড়শোলায় তাকে ঢেকে দিচ্ছে। হাত দিলেই মুঠো মুঠো আড়শোলা। কোনোটা নাকে সুরসুরি পর্যন্ত দিল। সে অগত্যা অন্ধকারে উঠে দাঁড়াল। কম্বলটা ঝাড়ল। এবং সে এলোপাথারি কম্বলটা আছাড় মেরে আড়শোলা তাড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

এতে তার একটা লাভ হয়েছে, শীতে হাত-পা টাল হয়ে যাচ্ছে না। সে কিছুটা স্বস্তিবোধ করছে। এবং অন্ধকার সমুদ্র থেকে সো সো গর্জন ছুটে আসছে, কান পাতলে প্রপেলারের শব্দও শোনা যায়—সে ভাবল, এ-সময় কুসুমের কথা ভেবে যদি সময় কাটানো যায়। কুসুমের কথা ভাবলেই সে উত্তপ্ত হয়। উষ্ণতা জমা হয় শরীরে। বাবা-মার কথাও ভাবল, গভীর সমুদ্রে নানা অতিকায় জীব ঘোরাফেরা করছে—ভাবল। জাহাজ কবে যে দেশে ফিরবে! কবে সফর শুরু। আর তখনই মনে হল পোর্ট-হোলে কে হাত গলিয়ে দিয়েছে। একটা টর্চবাতি।

'কে কে!'

'রুডি ভয় পেও না। আমি বাবেতি!'

বাবেতি! আরে বলে কি! এত রাতে একা এদিকটায়। সত্যি মাথার গোলমাল আছে। কত রাত হবে! জাহাজে কি এখন মিড-নাইট ওয়াচ চলছে। এখানে সে আসতেই পারে। খুব দূর নয়। সে গোপনে চলে আসতেই পারে। ভয়ে রাতের বেলায় এদিকটায় কেউ আসে না। বাবেতির কি সাহস! কেবিনের মাথায় উঠে যাবার একটা লোহার সিঁড়িও আছে। ঠিক ছাদে ঝুঁকে প্রাণ সংশয় করে বাবেতি তাকে একটা টর্চবাতি পৌঁছে দিল। বাবেতিকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবে। বাবেতি তারপর এক প্যাকেট ক্যান্ডেল দিল, দেশলাই দিল। একটা আপেল, এক প্যাকেট স্যাণ্ডউইচ—এক ফ্লাক্স চা পোর্ট-হোলে গলিয়ে দিল। তারপর বলল, ও মাই গড, রিমেমবার দিস গুড অ্যান্ড ডু নট ফরগেট অল দ্যাট হ্যাভ ডান ফর ইয়ো।

বাবেতির এই সব উচ্চমার্গের কথা সে বুঝতে পারে না। তাকে ঈশ্বরই বা বলছে কেন। সে তো ঈশ্বরের পুত্র। বিকাশদা মাঝে মাঝে তাকে বিদ্রূপ করতে হলে ঈশ্বরের পুত্র বলে থাকে। বাবেতির কাছে কি সে তারচেয়ে বেশি। তা-ছাড়া বাবেতি কেন যে বলছে, মনে রেখ তোমার জন্যই আমি যা কিছু ভাল কাজ করে যাচ্ছি। যেন তার জন্য বাবেতি কোনো খারাপ কাজ করতে পারছে না। তাই বাবেতি এ-সফরে কারো কোনো অনিষ্ট করছে না। শুধু জাহাজে রুডি আছে বলে সে ভাল ছেলে হয়ে গেছে। গোপাল কেমন সব গোলমাল করে ফেলছে। সে অন্তত জাহাজে ওঠার সময় যে-ভাবে বাবেতি সম্পর্কে ত্রাসের উদ্রেক করেছিলেন সারেঙসাব, জাহাজে উঠে তার কিছুই চোখে পড়ল না। কুকুরটা লেলিয়ে দিয়েছিল ঠিক, তবে তার কোনো ক্ষতি করেনি।

বাবেতি বলল, 'তুমি ভয় পাচ্ছ না তো!'

গোপাল নিচ থেকে শুনতে পাচ্ছে। বাবেতি যে তার মাথার উপর ছাদে বসে আছে তাও বুঝতে পারছে। বাবেতি পা ঝুলিয়ে বসেছে। পোর্ট-হোলে পা দেখা যাচ্ছে। বাবেতি সমুদ্র দেখতে দেখতে কথা বলছে গোপালের সঙ্গে। গোপাল মোমবাতি জ্বালল—পাশে কফিন। কফিনটা ছুঁয়ে দেখল একবার। অন্তত ছুঁয়ে দিয়ে যেন প্রমাণ করতে চায়, সে কফিনটাকে ভয় পায় না। এটাই কেবিনে তার এক নম্বর দুষমন—কফিনটাকে সাজা দেবার জন্যই যেন সে মোমবাতি জ্বালিয়ে কফিনের উপর বসিয়ে দিল—যদি ভৌতিক কিছু ব্যাপার থাকে। অশুভ আত্মারা কফিনে সহজেই লুকিয়ে থাকতে পারে। এবং কফিনে যাদের কোনো সময়ে রাখা হয়েছিল, রাখা হতেই পারে—তাদের অশুভ আত্মারা যে এর ভিতর লুকিয়ে নেই কে বলবে! অবশ্য সারেঙসাব ঢাকনা খুলে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, কিছু আড়শোলা ছাড়া এর মধ্যে আর কিছু নেই। অশুভ আত্মা মাত্রই আগুনকে ভয় পায়।

বাবেতি বেশ জোরে কথা বলছে, 'রুডি শুনতে পাচ্ছ আমি কি বলছি!'

'শুনতে পাচ্ছি।'

'ভয় পাচ্ছ না তো?'

'না।'

'আমি আছি। ভয় পাবে না। আমি উপরেই আছি। কথা না বললে বুঝবে কি করে আমি আছি! আমি কি বলছি শুনতে পাচ্ছতো।'

'পাচ্ছি। কথা না বললে বুঝবে কি করে আমি আছি, বলছ! কি ঠিক বলিনি! ঠিক শুনতে পাইনি?'

'রুডি কি করতো জান?'

'না।'

'তুমি সব ভুলে গেলে রুডি! রুডি খুবই তাজা এবং আমুদে। সে স্বাস্থ্যকর হালকা পাহাড়ী বাতাসে হেঁটে বেড়াতো। সে পাহাড়ী পথে তার বন্ধুদের সঙ্গে খোদাই করা পাথরের বাড়ি বেচত। পর্যটকরা রুডির শেষ বাড়িটিও কিনে নিত। তার জিনিসের চাকচিক্যই ছিল আলাদা। সে বড় হয়ে একদিন সেই রাস্তাও পার হয়ে গেল।'

গোপাল বেশ জোরেই বলল, কারণ সমুদ্রে বাতাস এবং ঢেউ মিলে যে গর্জন তৈরি করে তার চেয়ে প্রবল গলার স্বর। কারণ তা না হলে ছাদের উপর থেকে বাবেতি শুনতে পাবে না। সে বলল, 'কার মতো বড় হয়ে রাস্তা পার হয়ে গেল?'

'তোমার মতো। তোমার মতো বড় হয়ে সে বেরিয়ে পড়েছে। রবিবারের পোশাক পরা ন্যাপস্যাক পিঠে, কাঁধে বন্দুক ও শিকারের থলে—রুডি সোজা পথ ধরে পাহাড়ে উঠতে লাগল। তা সত্ত্বেও পথটা ছিল বেশ লম্বা। কিন্তু গুলি ছোঁড়া প্রতিযোগিতা সেদিন সবে শুরু। চলবে এক সপ্তাহ কিংবা তারও বেশি। রুডি রাস্তাতেই খবর পেয়েছে মিল মালিক ও তার মেয়ে তাদের পরিবারের বন্ধুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার মেলায় তাঁবুতে দিন যাপন করবে।'

গোপাল বলল, 'মিল মালিকের মেয়ের আবার সেখানে যাওয়ার কি হল !'

'বারে মেলায় সবে বেড়াতে যায় না। সেরা বন্দুকবাজকে কে না দেখতে চায়।'

'মেলায় কি জিলাপি পাওয়া যায় ! জিলাপি কি ভাজা হয়।'

'না না সে-সব কিছু নেই। জিলাপি কি আবার—তা আবার ভাজাই বা হবে কেন।'

'আরে জিলাপি ভাজার গন্ধ কি মনোরম বুঝবে না। আমাদের দেশে মেলায় জিলাপি ভাজার গন্ধ না উঠলে তাকে মেলা বলেই স্বীকার করা হয় না।'

'সেটা হতে পারে। তা যাই হোক, রুডি দ্রুত ঘোড়ায় চড়ে ছুটছে। সে অখ্যাত—কারণ সেতো পাহাড়ে থেকে হাতের টিপ ঠিক করেছে। একটা ছোট কাঠবিড়ালী তার গায়ে পিঠে সব সময় ঘুরে বেড়ায়। বাতাসে তার চুল উড়ছে। সে যাচ্ছে মেলায় একজন অজ্ঞাত বন্দুকবাজ হিসাবে।

'সে কেন যাচ্ছে !'

'আ ! তুমি রুডি জান না, কেন যাচ্ছে। তুমি নিজে সব করলে, আর ভুলে গেলে।'

গোপাল কি বুঝে বলল, 'ভুলে গেছি।'

'তাই বল ! লক্ষ্যভেদ, যে করতে পারবে মিল-মালিকের মেয়ে তো তাকেই ভালবাসবে।'

'অঃ।'

গোপাল আপেল কামড়ে খাচ্ছে। সে সারাদিন কিছুই খেতে পারেনি। খেতে গেলেই বমি পেয়েছে। ত্রাস থেকে এটা হয়েছে সে বুঝতে দিতে চায়নি। তার খেতে ইচ্ছে নেই শুধু বলেছে। খেতে গেলেই কেন বমি পায়, কেউ বুঝতে চায়নি। আপেল এবং স্যান্ডউইচ দুই বড় সুস্বাদু। সাধারণ জাহাজিদের রেশনে এর নামগন্ধও থাকে না। সে যে ক্ষুধায় কাতর বাবেতি

বুঝল কি করে ! যাই হোক বাবেতিকে বলা যায়, 'আচ্ছা, তুমি তো বড় বড় করে কেবল রুডি, বন্দুকবাজ, মিল-মালিক, ইন্টারল্যাকেন—কত কিছু বলছ ! কিন্তু তুমি কি জাহাজে কোনো নারীকে দেখেছ। যে খুবই সুন্দরী এবং যার মাথায় দামি পাথরের টুপি, গলায় পাথরের মালা এবং প্রায় আমাদের ভাষায় দেবী প্রতিমা—যিনি দেখা দিয়েই অন্তর্ধান করলেন। তিনি কি কখনও বাবেতি তোমার সামনে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। তুমি কি জাহাজে তাকে কখনও দেখেছ ?'

বাবেতি আর সাড়া দিচ্ছে না।

'বাবেতি।'

না সাড়া নেই।

বাবেতি কি নেমে গেল !

সে বাংকে উঠে পোর্ট-হোলে উঁকি দিল। আকাশ বেশ ফর্সা হয়ে উঠছে পুব-সমুদ্রে। বাবেতি আর থাকতে নাই পারে। সারা রাত বাবেতিই কি তার সঙ্গে কথা বলছে, না অন্য কেউ। তারপর মনে হল, অযথা সংশয়। বাবেতি তাকে টর্চবাতি, আপেল এবং মোমবাতি দিয়ে গেছে।

পরদিন রাতে ফের টের পেল গোপাল, কেউ সিঁড়ি ধরে উঠে আসছে। ঠিক মিড-নাইট-ওয়াচ—কারণ ফরোয়ার্ড-পিকে ঘন্টা পড়ার শব্দ থেকেই এখন সে সব ঠিক ঠিক অনুমান করতে পারে। সকালে দরজা খুলে বাহার চর্বিভাজা রুটি আর আলুভাজা দিয়ে গেছে। দুপুরে মাংস ভাত সবজি, এবং সাঁজবেলায়ও সেই এক খাবার। সে কাউকে বুঝতে দেয়নি, ঘরে তার টর্চ বাতি এবং এক প্যাকেট মোমবাতি আছে। সে সকাল বেলাতেই মেট্রেসের তলায় লুকিয়ে রেখেছে সব। সারেঙসাব খুব সকালেই একবার খোঁজ নিয়ে গেছিল—অবশ্য দরজা খুলে ঢোকেননি। বাইরে থেকে তালা দেওয়া—তিনি কেন যে তালা খুলে ভিতরে ঢুকলেন না, সে তা বুঝল না। তাঁর কাছেই তো চাবি—তিনি ইচ্ছা করলেই দরজা খুলতে পারতেন, তা না করে দরজায় টোকা মেরে বলেছেন, গোপাল ভয় পাসনি তো। ভয়ের কিছু নেই জাহাজে। আর তুই তো বামুনের ছেলে। তোর আবার ভয় কি। গলায় তোর পৈতা আছে। পৈতা থাকলে অপদেবতারা কাছে ভিড়তে সাহস পায় না তুই ভালই জানিস। তোর বাবা যে লিখল চিঠিতে, দশবার অন্তত গায়িত্রী জপ করতে, তা কি করছিস।'

গোপাল জানে সারেঙসাবকে বুঝিয়ে লাভ নেই। কারণ তার কেন জানি

দিন দিন মনে হচ্ছে, তার ব্যাপারে মানুষটা সত্যি অবুঝ। সে সারেঙসাবকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলেছে, সে খুব ভক্তি সহকারে দশবার গায়িত্রী জপ করছে। রাতে তার ভাল ঘুমও হয়েছে। তার জন্য অহেতুক চিন্তা করে যেন মন খারাপ করে তিনি বসে না থাকেন। সারেঙসাব বলেছেন, আর মাত্র ছ'দিন। দেখতে দেখতে কেটে যাবে। দুপুরের দিকে একটা দ্বীপ দেখা যেতে পারে—সে যেন পোর্ট-হোলে চোখ রাখে তখন। ডাঙ্গা জাহাজিদের কাছে কত প্রিয় জানেন বলেই দ্বীপের খবরটা না দিয়ে থাকতে পারেননি।

গোপাল বলেছে, 'ঠিক আছে। দেখব।' সারেঙসাব তাতেই খুশি। গোপাল যে রাতে ভয় পায়নি, কথাবার্তাতেই তিনি তা টের পেয়ে আরও খুশি।

বাবেতির কণ্ঠস্বর।

'রুডি ধরো।'

পোর্টহোলে নুয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বাবেতি। খুব ঝুঁকে হাত বাড়িয়েছে বোঝাই যায়। বেশি ঝুঁকে হাত বাড়ালে বিপদের কারণ হতে পারে। উল্টে সমুদ্রে পড়ে যেতে পারে। বাবেতির জন্য তার খারাপও লাগে। আসলে সে খুবই একা। সে কারও সঙ্গে মেশে না, অথবা মিশতে দেওয়া হয় না। বাবেতি যদি ধরা পড়ে যায় তবে আর এক কেলেঙ্কারি—কোন সাহসে যে আসে—তার বাবাও যদি জানতে পারেন, তবে গোপালের দুর্ভোগ মারাত্মক হতে পারে। তার চেয়েও কেন যে গোপাল মনে করে, বাবেতি যে ভাবে ক্ষেপে থাকে রাতে এদিকটায় পালিয়ে আসার জন্য এবং যে ভাবে জীবন তুচ্ছ করে কেবিনের ছাদে গা ঢাকা দিয়ে বসে থাকে—তারপর সে সাড়া না দিয়ে থাকে কি করে!

বাবেতি আজ দুটো কমলা দিল। একটা কম্বল গলিয়ে দিল। তার জন্য আজ সে চিকেন রোস্ট করে এনেছে। এনেছে বললে ভুল হবে, কাপ্তান বয়কে বললেই সে যা চায় তাই পায়। সে দুপুরে কি খাবে, তাও হয়তো জানিয়ে দেয়। রাতে কি খাবে তাও। চিফ কুক মেনু মাফিক লাঞ্চ কিংবা ডিনারের ব্যবস্থা করে ঠিক—তবে কাপ্তানের পুত্রটির মর্জিও জেনে নিতে হয়। সে কি জানে, তার রুডি বিফ পছন্দ করে না, শূয়রের মাংসও না—টার্কি কিংবা মুরগি তার পছন্দ।

গোপাল হাত বাড়িয়ে এক এক করে সব নামিয়ে রাখল। তখনই বাবেতি বলল, জান লক্ষ্যভেদকারী দল, লক্ষ্যভেদ করার জন্য লক্ষ্যের কাছে জটলা করতে থাকল। রুডি তাদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। এবং প্রমাণ করল সে

তাদের মধ্যে সবার চেয়ে দক্ষ ও ভাগ্যবান। প্রত্যেক বারই তার বুলেট লক্ষ্যের গায়ে কালো চিহ্নটি বিদ্ধ করল। কি শুনতে পাচ্ছ রুডি।'

'শুনতে পাচ্ছি।' গোপাল দেয়ালে হেলান দিয়ে কমলালেবুর খোসা ছাড়াতে থাকল।

বাবেতি অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। আর গোপাল কমলালেবুর খোসা ছাড়িয়ে টপাটপ কোয়া মুখে ফেলছে।

দর্শকদের কেউ কেউ জিজ্ঞেস করল, ঐ বিদেশী তরুণ লক্ষ্যভেদকারী কে হতে পারে ? ওয়ালিস অঞ্চলের হতে পারে। ফরাসী ভাষার মতো মনে হচ্ছে কথাবার্তা। কেউ বলল, ও জারমান ভাষায় কথা বলছে, তাই বুঝতে অসুবিধা।'

বাবেতি অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। গোপালের কিছুই শোনার দরকার হচ্ছে না। টার্কির রোস্ট করা মাংস দাঁতে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

'রুডি ছিল প্রাণশক্তিতে ভরা। তার চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছিল। তার দৃষ্টি ও বাহু স্থির। আর সে জন্যই সে অমন ভালভাবে লক্ষ্যভেদ করেছে। সমৃদ্ধি সাহস দেয় কিন্তু রুডির নিজেরও যথেষ্ট সাহস ছিল। মেলাতে গানবাজনা হচ্ছে। বাজছে ব্যারেল অরগান ও ছোট ঢাক। হচ্ছে ঠেলাঠেলি ও গোলমাল। রুডিকে দেখার জন্য মেলা ভেঙ্গে পড়েছে।'

গোপালের দাঁতে মাংস ঢুকে গেছে। কি ঝামেলা! তারপরই মনে হল একটা দেশলাই আছে। সে মোমবাতি জ্বেলে রাখতে পেরেছে দেশলাই আছে বলে। একটি কাঠি বের করে দাঁত খোঁচাতে থাকল।

'রুডি, আমি কি বলছি শুনতে পাচ্ছ।'

'পাচ্ছি। সব শুনতে পাচ্ছি। তুমি বলে যাও। মনে মনে গোপাল বলল, সত্যি কোনো আচ্ছন্ন অবস্থায় আছে বলেই তাকে রুডি ভেবে পুনুরুজ্জীবনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কাপ্তান-বয় ছানাউল বলেছে, যা বলবে, শুনে হাঁ হাঁ করে যাবে। তবেই খুশি। তোমাকে যখন ধরেছে, তখন যে সহজে ছাড়ছে না বোঝার চেষ্টা কর। ছানাউলের কথামতো সে কাজ করে যাচ্ছে। সে কখনও বলছে না, প্রলাপ কাহাতক শুনতে ভাল লাগে। তবু বোঝে গোপাল, একটি সুন্দর স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে আছে বাবেতি। যে কোনো কারণেই হোক, বাবেতি রূপকথার জগত থেকে উঠে আসতে চায় না।

'জানো রুডি, মিল-মালিকের মেয়েকে খুশি করার জন্যই সে এসেছিল মেলায়। আসার পথে একজন তাকে একটা পাহাড়ী গোলাপ দিল। সে ওটা

হাতে নিয়ে ভেবেছে—খুবই শুভ লক্ষণ। সে ফুলটি কিনে ফেলল।

গোপাল বাথরুমে ঢুকে হাতমুখ ধুল। গামছা দিয়ে মুখ মুছল। জমপেশ করে খাওয়া গেল। বাথরুম থেকে বাবেত্তির কথা সে আদৌ বুঝতে পারছে না। তবু জোরে জোরে চিৎকার করে বলছে, 'তারপর!'

'রুডি মেলায় আসার আগে লুচাইনের ব্রিজটিও পার হয়ে এসেছিল। সেখানে বেশ ঘন বন—ওয়ালনাট গাছগুলোর ঠাণ্ডা ছায়া পার হয়ে পপলার অরণ্যে ঢুকে গেছে। আসলে সে পার হয়ে আসছে, পাহাড়, উপত্যকা, বন, নগর, মাঠ, ওয়ালনাট, চেস্টনাটের বাগান। তার ভিতর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়েছে। এখানে সেখানে সাইপ্রাসের ডাল ঝুলে আছে। নদীর পাড়ে ডালিম গাছ। সে মিল-মালিকের কন্যার জন্য থলের মধ্যে কিছু ডালিম ফুলও ভরে ফেলল। কি আশ্চর্য না রুডি। মিল-মালিকের মেয়ের জন্য সে যা কিছু সুন্দর ব্যাগে ভরে নিয়ে যাচ্ছে। ভালবাসা বিষয়টি এমনই নির্বিকল্প হওয়া উচিত নয় কি।

'নিশ্চয় নিশ্চয়।' গোপাল খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বাবেত্তিকে সমর্থন জানাল।

'কিন্তু কি মুসকিল জান?'

গোপাল বলল, 'মুসকিলের কথা বলছ কেন? রুডি কিছুই তো পরোয়া করে না। ডেকে দেখলে না, ক্ষেপা সমুদ্র হার মানল, সমুদ্র যদৃচ্ছ চেষ্টা করেও ভাসিয়ে নিতে পারল না!'

'তা অবশ্য ঠিক। তার সুস্বাস্থ্য দেখার মতো। তরুণীরা তাকে দেখলে চোখ ফেরাতে পারত না। সমৃদ্ধি সাহস দেয়, তার নিজেরও ছিল যথেষ্ট সাহস। তবে কি জান, ঐ তুষারকুমারী যে আগেই নজর দিয়ে রেখেছে। দু দু-বার তাকে তুষার জলে ডুবিয়ে মারতে চেয়েছিল। কারণ তুষারকুমারী জানে, তবেই সে অনন্তকাল তুষারকুমারীর বুকে জেগে থাকবে। কেউ তাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। বাল্যসঙ্গীকে কে ছাড়তে চায় বল!'

'আচ্ছা বাবেত্তি, কাল যখন আসবে সামান্য পরিজ এন। আচ্ছা গ্রীনপিজ মাখনে সিদ্ধ করে খেতে নাকি খুবই সুস্বাদু। যদি পাও তাও এন।'

গোপাল সুযোগ পেয়ে আর কি খাবে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছে না।

বাবেত্তিই ধরিয়ে দিল, 'বাদাম প্যাস্ট্রি মেশানো আইসক্রিম আনা যেত। কিন্তু যা ঠাণ্ডা পড়েছে। আমার শরীর হিম হয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের বাতাসে। ঠাণ্ডায় খেতে পারবে তো।'

'হ্যাঁ পারব। কম্বলে মুড়ি দিয়ে খাব। নিশ্চয় তত ঠাণ্ডা লাগবে না কি

বল !'

'তোমার দারুণ বুদ্ধি। আমার কিন্তু মনেই হয়নি তোমার কেবিনে গরম কম্বলের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আচ্ছা খুব ঠাণ্ডা ভিতরে ! হিম হয়ে আছে সব কি ? আর একটা কম্বল লাগলে আনতে পারি।'

'ধরা পড়ে যাবে না তো !'

'ধরা পড়ব কেন ! আমার কেবিনের মুখেই তো সিঁড়িটা। বাবা দশটায় কেবিনে ঢুকে যান, একবার দরজায় নক করে শুধু বলেন, শুভ রাত্রি। তারপর কে কার খোঁজ রাখে বল। আমি তো চুপি চুপি দরজা লক করে ডাইনিং হলের পাশ দিয়ে স্টারবোর্ডে উঠে যাই। ওদিকটায় কেউ থাকে না জানই তো।'

গোপাল বলল, 'তা অবশ্য ঠিক।'

সারারাত বাবেতি ছাদে বসে রুডির নানা অভিযানের গল্প করত। শ্যাময় শিকারের গল্প বলত। আর বলত, রুডি বড় হয়ে মিল-মালিকের মেয়ের হাতে নতজানু হয়ে শুধু একটা চুমু খাবে। জীবনে তার আর কোনো বাসনাই ছিল না। মিল-মালিকের মেয়েটিকে সে দেখেছিল একদিন বরফের উপত্যকায় দাঁড়িয়ে আছে। বালিকা। সাদা ফ্রক গায়। চুল সোনালী—সে যে কি সুন্দর ফ্রক না পরলে বোঝা যায় না। রুডি নানা জায়গা ঘুরে মিল-মালিকের বাড়িতে হাজির হতে চেয়েছে। পারেনি। কেন পারেনি বলত ! পাহাড়টার কাছে গেলেই মনে হত একটা বরফের নদী তার রাস্তা রুখে দাঁড়িয়ে আছে। ছুটন্ত জলের উপর নুয়ে পড়েছে উইলো আর লেবু গাছগুলো। বড় বড় বরফের চাঁই ভেসে যাচ্ছে। একবার সাহস দেখাতে গিয়ে সে নিজেও জখম হল—ঘোড়াটাও। তুষারকুমারী তাকে বরফের তলায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল। পারেনি।'

'আহা রে বেচারা !' গোপাল কৃত্রিম গলায় শোক প্রকাশের চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। কেমন আন্তরিক শোনালো তার কথাগুলি।

'কিন্তু রুডি ছাড়বার পাত্র নয়। গ্রীষ্মের নদীতে জল বেশি থাকে, তবে তুষারপাতের ভয় থাকে না। সে নদী সাঁতরে পাহাড়ের উপর উঠে গেল। দেখল, কেউ নেই। গেটে একটা বেড়াল বসে আছে। সেই পাহারা দিচ্ছে। রুডি বলল, বাবেতি আছে ? বিড়ালটা বলল ম্যাও। রুডি তো বড় হয়ে গেছে। বড় হয়ে বিড়ালের ভাষা বুঝবে কেন ? থাক ত ছোট্ট শিশু—ঠিক বুঝতে পারত, আসলে বিড়ালটা বলছে মিল-মালিক গেছে ইন্টারলেকনে। মালিকের মেয়ে বাবেতিও গেছে তার সঙ্গে। সেখানে একটা খুব বড়

লক্ষ্যভেদের প্রতিযোগিতা আছে। সেটা চলবে পুরো এক সপ্তাহ। সমস্ত জার্মানি অঞ্চল থেকে সেখানে লোকেরা যাবে। পরে অবশ্য শহরে নেমে এসে রুডি সবই জানতে পেরেছিল। তারপরই ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছিল।'

গোপাল কেমন সচকিত হয়ে উঠল। বাবেতি, মিল মালিকের মেয়ে—বাবেতি, জাহাজ, কাপ্তানের পুত্র সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সে বলল, 'বাবেতি তবে মিল মালিকের মেয়ে!'

'তাই তো। মিল-মালিক খুবই বড়লোক। রুডি খুবই গরীব তাও ভুলে গেলে।'

ভাবল, আচ্ছা ছেলের পাল্লায় পড়া গেল। নিজেকে মেয়ে ভেবে খুশি। জাহাজের দোষ। যৌন বিকৃতি। তার আর কেন জানি বাবেতির সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা হল না। একজন ষণ্ডা-গুণ্ডা না হোক ধেড়ে ইঁদুর যদি নিজেকে মেয়ে বলে চালায় তবে আর কথা বলার আগ্রহ থাকে কি করে।

সে বলল, 'বাবেতি, তুমি যাও আমার ঘুম পাচ্ছে। আমার খুবই শীত করছে। ধরা পড়লে তোমারও বিপদ, আমার তো কথাই নেই।'

বাবেতি বলল, রুডির কাকার বাড়ির গল্পটা শুনবে না?'

সে বলল, না আমার কিছুই আর শুনতে ভাল লাগছে না। রুডিকে দয়া করে ঘুমাতে দাও। সে সত্যি ক্লান্ত। ভ্যাপসা গন্ধে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত।

বাবেতি বলল, 'শোনই না। তার কাকা বলেছেন, একজন সুদক্ষ শ্যাময় শিকারী হয়ে উঠতে রুডির বেশিদিন লাগবে না। রুডির মধ্যে গুণটা আছে। তাকে রাইফেল ধরতে, টিপ করতে ও গুলি চালাতে শেখালেন। শিকারের মরশুমে তিনি তাকে সঙ্গে করে পাহাড়গুলোর মধ্যে নিয়ে গেলেন এবং তাকে শিকারের কলা-কৌশল শিখিয়ে দিলেন। আর সতর্ক করে দিয়ে বললেন, শ্যাময়গুলো খুব চালাক। কিন্তু শিকারীকে আরও চালাক হতে হবে—যাতে গন্ধে টের পায় শিকারের লক্ষ্যবস্তু কি হওয়া উচিত।

বাবেতি তাকে ইঙ্গিতে কি বলতে চায় বুঝল না। শিকারীকে আরও চালাক হতে হবে কেন সে বলল! তার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। সে জীবনে শ্যাময় দেখেনি। কোনো শিকারও করেনি। এ-সব শোনাবার অর্থ কি! অবশ্য ছানাউল বলেছে, যা বলবে তাই মেনে নেবে। ঘাটাবে না।

সে আর কোনো প্রশ্ন করে বাবেতিকে ঘাটাতে সাহস পেল না। সে সাড়া না দিলেই হল। ভাবতে পারে রুডি সত্যি ক্লান্ত। রুডি সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু কেন যে চিমনিতে লিখল, আই অ্যাম দ্য ওয়ান হু নিডস টু বি

ব্যাপটাইজড্ বাই ইয়ো। সেটা বাবেতি নিজে, না অন্য আর কেউ। তার মাথায় কিছু ঢুকছে না। না সেটাই তার যৌন বিকার।

॥ এগার ॥

বুয়েনস এয়ার্সের ঘাটে বাদশা মিঞা ফের গোপালের ফোকসালে ঢুকে চিঠির বাণ্ডিল হাতে তুলে দিল। সারেঙসাবের কাছ থেকে বাণ্ডিলটা নিয়ে সোজা গোপালের ফোকসালে ঢুকে সে জানতে চায় বিবি তার খতের জবাব দিয়েছে কি না। তারটা পেয়ে গেলে সে বাকি চিঠি সারেঙকে দিয়ে দেবে। গোপাল ছাড়া তার আর কোনো বিশ্বাসভাজন কেউ আছে বলে মনে করে না। সে খুবই কাতর মুখে তাকিয়ে আছে। গোপাল চিঠিগুলো দেখে বলল, না নেই। তোর কোনো খত আসেনি।

বাদশা বলল, 'গোপাল তুই বেইমানি করিসনিতো ?'

'বেইমানি কেন করব ? আমার কি লাভ।'

'না, তুই যদি অন্য কথা লিখা দেস। বিবির গোঁসা হতে কতক্ষণ !'

গোপাল ক্ষেপে গেল। বলল, 'আর কখনও খত লিখে দিতে বলবি না। এত অবিশ্বাস।'

'গোপাল রাগ করিস না। আমার সোনাভাই গোপাল, আমার ধনভাই, তুই রাগ করস ক্যান। আমি ক অক্ষর গোমাংস কিছু জানি না। তুই খত না লিখা দিলে কারে দিয়া লেখামু। বিবিত আমার খত না লেখনের মাইয়া না। তবে কি কথা জানস, নিজে ত লিখতে পারে না—মানুষজন কি আর তার দুঃখ বোঝে ! বাড়ি বাড়ি ফ্যা ফ্যা কইরা ঘুইরা বেড়াইছে, খসমের খত, বোঝস না—কত গোপন কথা থাকে ! কারে দিয়া ল্যাখায় ! আমার মাথা ঠিক নাই গোপাল। তর হাত দুইটা ধরতাছি—'

গোপাল দেখল বাদশা মিঞার মুখ বড় করুণ দেখাচ্ছে। বিবির জন্য তা যে বয়সেরই হোক মন তো খারাপ করবেই। চিন্তা হবারই কথা। সে একবার বলেও ফেলেছিল—তোদের দোষ, পান নাই গুয়া নাই, বিবিজান ঠিক আছে। বললে বাদশার অপরাধী মুখ আরও করুণ দেখাবে। সে কিছুই বলল না। সে জানে, আরও সবাই আসবে, খত লেখাতে, না হয় খত পড়াতে—জাহাজে এটা তার একটা বড় কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাউকে সে নাও করতে পারে না। ঘ্যানর ঘ্যানর শুরু হলো বলে। গোপাল, আমারটা, দে ভাই, দু-চার লাইন লিখা। দে ভাই। এ-জন্য জাহাজে তার সুনামও আছে—গোপাল যে সে

ছেলে না—রীতিমত পড়াশোনায়ালা ছেলে। একটা পাসও দিছে।

গোপাল জানে ফোকসালে বসে থাকলেই খত লেখাবার জন্য ভিড় বাড়তে শুরু করবে। সে তাড়াতাড়ি উপরে উঠেই বুঝল পিছিলের ডেকে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। কনকনে হিমেল ঠাণ্ডা বাতাস উঠে আসছে। কুয়াশায় প্রায় কিছু দেখা যাচ্ছে না। সামনে ছোট্ট পার্কের মতো। কিছু অচেনা গাছ। বেশ বড় পাতা। শীতের উত্তুরে হাওয়ায় তার শরীর টাল মেরে যাচ্ছিল। বন্দরে ঢুকে বুঝেছে—সে এই শীতে সত্যি কাবু। ভাল একটা কোট নেই, গায়ে দিয়ে যে বের হবে।

কোম্পানির সোয়েটার গায়ে সে হি হি করে শীতে কাঁপছিল। গরম কম্বলের প্যান্ট পরেছে। সামনে এত সুন্দর শহর আর ঘরবাড়ি, রাস্তার দু-পাশে বড় বড় দেবদারু গাছ আর মানুষজন, আশ্চর্য জেটি। নামলেই শহর। সারেঙসাব যা করে থাকেন। এই বন্দরেও নামা যে ঠিক হবে না বলে দিয়েছেন। কেউ কোনো ভাষা বোঝে না। ভাষাটা যে কি এ-দেশের গোপাল জানে। বিকাশদাই বলেছে, স্প্যানিশ ভাষা। তুই তো কেপটাউনে স্প্যানিশ ছোকরার হাবভাব করে কাটালি—যাক এবার তোর চিন্তা নেই, স্বভূমিতে পদার্পণ করলি। যা এবার নিজের জন্মভূমি ঘুরে দ্যাখ।

সারেঙসাব উঠে এসেছেন ফোকসাল থেকে। রবিবার বলে কাজের কোনো তাড়া নেই। ছুটির আমেজ—কিন্তু গোপালকে দেখলেন গ্যালিতে আগুন পোহাচ্ছে। শীতে হি হি করে কাঁপছে গোপাল। যে যার ফোকসালে, কম্বল মুড়ি দিয়ে, শুয়েছিল, চিঠির খবর পেয়ে উপরে ছুটে এসেছে—কিন্তু কুয়াশা ঘন আর হাড়কাঁপানো শীতে উপরে কেউ তিষ্ঠোতে পারেনি। গোপাল মগে জল গরম করে নিয়ে যাচ্ছে।

আসলে গোপাল সকালে কেন যে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকতে পারে না। যে কোনো ডাঙ্গাই বড় জীবনের কথা বলে। সে সবার সঙ্গে কোম্পানির ঘর থেকে টাকাও তুলেছে। বিকেলে কেনাকাটা করবে, শহর ঘুরতে বের হবে—তাকে দু-বার তাগাদা দিয়ে গেছে বিকাশদা, 'কি রে কিনারায় যাচ্ছিস তো, সামনে কিছুটা হেঁটে গেলেই কার্নিভেল। বের হলি যখন দেখে নে। জুয়া মদ নারী সব পাবি। এক রাতে সব ফতুর করে দিস না। সব ডানা কাটা পরী, পেলেই তুলে নিয়ে যাবে তোকে। সারেঙসাব কি বলে!'

'কিছু বলে না।'

'বলবে। কিনারায় নাম, বুঝতে পারবি।'

আর ঠিক তখনই সে দেখল, বাবেতি তার কুকুরটা নিয়ে ডাঙ্গায় নেমে যাচ্ছে। সামনে পার্ক—কুকুরটাকে নিয়ে বেড়াবার সুন্দর জায়গা। ধূসর রঙের প্যান্ট-কোট পরে নেমে যাচ্ছে। বাবেতিকে একা ছেড়ে দিল ! কেউ তো সঙ্গে নেই—বাবেতি কি সুস্থ হয়ে উঠছে ! না কি বাবেতি ইচ্ছে করলেই একা নেমে যেতে পারে। বাবেতি চুপ মেরে গেছে। খেলছে না। যা করল বাবেতি ! এরপর আর খেলা যায়। জাহাজ তখন গভীর সমুদ্রে। এক জোড়া অ্যালবাট্রস পাখিও উড়ে আসছিল জাহাটার পিছু পিছু আর তখনই কি না সে বোটডেক ধরে উঠে গেলে কোথা থেকে বাবেতি হাজির। সে টের পায়, কেউ ছোট্ট ঢিল ছুঁড়ছে। সে পিছন ফিরে দেখেছিল বাবেতি কাগজের মণ্ডটি ছুঁড়েই উইন্ডসহোলের পেছনে লুকিয়ে পড়েছে।

সে আগের মতো আর বাবেতিকে ভয় পায় না। কুকুরটাকেও না। কুকুরটা যাই করুক, তার যে অনিষ্ট করবে না সে বোঝে। কুকুরটা বুঝেছে বাবেতি তাকে পছন্দ করে। কিন্তু একজন তরুণ যদি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তবে নানা অনাসৃষ্টি ঘটতে কতক্ষণ। জাহাজি-রোগটার কথা সে জানে বোঝে। নির্মল বন্ধুত্ব হলে যেন ক্ষতি ছিল না। তাকে রুডি ভাবে বলেই সে কিছুটা ক্ষুব্ধ। বাবেতি মিল-মালিকের মেয়ে—একজন তরুণ নিজেকে নারী ভাবলে খুব যে সুবিধের ব্যাপার হবে না বুঝতে তার কষ্ট হয় না। কাগজের মণ্ড ছুঁড়ে দেখছিল সে কি করে !

গোপাল বলেছিল, কে রে ? যেন সে বাবেতিকে দেখতে পায়নি। দু পা সিঁড়ির ধাপে নেমে গেল। আসলে বাবেতিকে অগ্রাহ্য করতে চায়। কিন্তু বাবেতি সুযোগ বুঝে বোট-ডেকে উঠে এসেছে। পকেটে সে কাগজের মণ্ড তৈরি করে এনেছে, তাকে আকৃষ্ট করার জন্য।

দু পা নেমে যেতেই আবার কাগজের মণ্ড এসে তার কাঁধে লাগল।

সে বলল, 'বাবেতি ভাল হচ্ছে না।'

বাবেতি আড়াল থেকে বের হয়ে এলে, সেও মণ্ডটা ছুঁড়ে মারল—আর বাবেতি তাতেই যেন আরও প্রাণ পেয়ে গেছে।

ডেকে ঘন কুয়াশা। কুয়াশায় ভাল করে কিছু দেখাও যায় না। বাবেতি চায়, রুডি তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলায় মেতে উঠকু। ঠাণ্ডায় সে দুটো সুয়েটার পরেও পার পাচ্ছে না। বাবেতির গায়ে হলুদ রঙের জ্যাকেট। গলায় স্কার্ফ। পরনে ফানেলের ঢোলা পাজামার মতো কিছু। তার সুন্দর পা বের হয়ে আছে। মাছরাঙা পাখির মতো দেখতে পা দুটো। কি সুন্দর পা। হাত দুটো

আরও নরম—লাল টকটকে—এমন একজন তরুণের কি ইচ্ছে সে বোঝে না। তবে বাবেত্তি যে ছাড়ার পাত্র নয়, সে সিঁড়ির আরও দু-ধাপ নামতে গিয়ে টের পেল। তার কাজ ডেরিকে। কপিকল আলাদা করে দিতে হবে। ফাইভার বের হয়ে এলেই তাকে ফরোয়ার্ড-ডেকের মাস্তুলের নিচে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। জাহাজ ঘাটে ভেড়ার আগে দড়ি দড়া, লোহার মোটা তারে গ্রিজ মেখে রাখতে হয়। এগুলো তারই কাজ। কেবল ফাইভার দেখবে সে ঠিকমতো কাজ পারছে কিন না। আর তখন যদি বাবেত্তি তাকে আকৃষ্ট করার জন্য নানা ফন্দি মাথায় নিয়ে ঘোরে, তখন বিরক্ত না হয়ে উপায় কি।

খারাপ লাগল কুকুরটা তার প্যান্ট এসে কামড়ে ধরতেই। সে ধমক দিল টমি ভাল হচ্ছে না। ছাড় বলছি। আমার কত কাজ।

টমি তার ধমক খেয়ে উঠে গেল লাফিয়ে। বাবেত্তি টমির এই আচরণে বোধ হয় আহত। বিশ্বাসঘাতক! ধরে আনেত বলা হল, আর ধমক খেয়ে তিনি লাফাতে লাফাতে উঠে এলেন!

বাবেত্তিও ততোধিক শাসনের গলায় বলেছিল, টমি যাও। যাও বলছি। যেন টমি গিয়ে তার প্যান্ট কামড়ে ধরে এবং টেনে তুলে আনে। কিন্তু গোপাল নিজের মধ্যে কেন যে আজকাল, আশ্চর্য পৌরুষ অনুভব করে থাকে। সেও বলল, টমি সাবধান, একদম দুষ্টুমি করবে না। দুষ্টুমি করলে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেব। টমি কি যে করে। একবার বাবেত্তির পায়ের কাছে, আর একবার গোপালের পায়ের কাছে ছোটাছুটি লাগিয়েছে। এতেই বোধ হয় বাবেত্তির ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। সে ছুটে সিঁড়ির কাছে এসে গোপালের হাত চেপে ধরেছিল। আর গোপালের কেন যে মনে হল এ-সব সাংঘাতিক জাহাজি অসুখ—কেউ নেই—ঘন কুয়াশার মধ্যে তাকে জাপটে ধরে বুকে মুখ গুঁজে দিতে পারে। হাত ধরতেই এক হ্যাচকায় সে হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিল।

বাবেত্তির চোখ এত ছল ছল করছে কেন সে বুঝছে না। কেবল বলছে 'রুডি প্লিজ।'

প্লিজ তো সে করবেটা কি।

বাবেত্তি তার হাত ফের জোরে চেপে ধরেছে। এবার সে বাবেত্তিকে ধিক্কার না জানিয়ে পারল না—ছিঃ বাবেত্তি তুমি এত খারাপ! তুমি কি বাবেত্তি তোমার এ-সব শোভা পায়! তুমি একজন এত বড় কাপ্তানের ছেলে, তোমার এ-সব শোভা পায়!

বাবেত্তি তখনও বলছে, 'রুডি প্লিজ। রাগ কর না।' সে চারপাশে

চাকাচ্ছে। জায়গাটা ব্রিজের তলায়। ব্রিজ থেকে কিছু দেখা যায় না। ফরোয়ার্ড-পিকে কেউ না উঠে গেলে তাদের দু'জনকে কেউ দেখতে পাবে না। বাবেতি সত্যি সুযোগের অপেক্ষায় আছে! সে বাবেতির হাত ছাড়াতে চাইল, বাবেতি কিছুতেই ছাড়বে না। সে এবার হাত মুচড়ে দিল। বাবেতিও ছাড়বার পাত্র নয়—সে পকেটে যে কেক নিয়ে ঘুরছে গোপাল জানবে কি করে। সে আসলে তাকে কেকটি দিয়ে বলবে ভেবেছিল—খাও রুডি, আমি দেখি। এ-জন্য তার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছে। ঢিল ছুঁড়ে মজা করার চেষ্টা করেছে। গোপালকে নিয়ে বোট-ডেকে বোটের আড়ালে বসতে চেয়েছে। বাবেতি সোজাসুজি বলতে চায়নি রুডি তার সঙ্গে মগু নিয়ে খেলায় মেতে যাবে, বোট-ডেকে এই খেলা কত প্রিয় গোপাল টেরই পেল না। উল্টে গোপাল তার হাত মুচড়ে দিচ্ছে। সে যত বলছে, লাগছে, তত গোপাল কেমন অমানুষ হয়ে উঠেছিল, আর তারপর বাবেতিও রাগে ক্ষোভে মুখ হাত আঁচড়ে দিয়েছিল তার লম্বা নখে। যত গোপাল হাত মুচড়ে দিচ্ছে তত বাবেতি গোপালের গালে জোরে চিমটি কাটছে—আর কার চোখে পড়ে যেতেই—দৌড় দৌড়। সোজা পিছিলে এসে নালিশ, সারেঙসাব শিগগির যান, ব্রিজের নিচে কাপ্তানের পুত্রের সঙ্গে গোপাল মারামারি করছে। সারেঙসাব চোখ কপালে তুলে ছুটছেন। আরও যারা ছিল তারাও ছুটছে। আর গিয়ে অবাক, দু'জনের কেউ নেই। মানুষের সাড়াশব্দ পেয়ে দু'জন দু-দিকে একেবারে অদৃশ্য। কোথায় গোপাল, কোথায় কাপ্তানের পুত্র!

সারেঙসাব নিজের মনে গজ গজ করছেন। আর জাহাজের আগাপাশতলা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন গোপালকে। নেই। কেউ নেই। যেন সম্পূর্ণ মিছে কথা। সারেঙসাব বললেন, কোথায় ওরা? তুমি মিঞা কোথায় দেখলে! কোথাও তো ওদের দেখছি না। জাহির পড়ে গেল ফ্যাসাদে! সে কি বলে! সে স্পষ্ট দেখেছে, গোপাল আর কাপ্তানের পুত্র মারামারি করছে, এমন নয় যে কুহকে পড়ে দেখেছে। মরীচিকাও নয়—কারণ জাহাজ টালমাটাল ছিল না, সূর্য সমুদ্রে সোনালি রঙের রোদের বাহার সৃষ্টি করেছিল। সাদা রঙের জাহাজ নীল জলে তর তর করে এগিয়ে যাচ্ছে। জাহাজের খুবই সুসময়, তবু ধস্তাধস্তি মারামারি যেন দেখেছে। পলকে গোপাল আর কাপ্তানের পুত্রটিকে আবিষ্কার করেই সে ছুটেছিল, সারেঙসাবকে খবর দিতে। গোপাল মরবে—যান দেখুন সে কি শুরু করেছে!

তারপর আলতাফ ফোকসালে ফিরে অবাক। গোপাল সুবোধ বালকের

মতো বসে আছে বাংকে। বিকাশ পাশে বসে আছে। আর বলছে, 'কিরে তুই মারামারি করতে পারলি!'

'কখনও না। কে বলেছে মারামারি করেছি।'

সারেঙসাবও ঢুকে বললেন, 'গোপাল তোর জন্য কি আমি শেষে ডুবব। তুই কি আরম্ভ করলি বলত! এত উৎপাত তোর কে সহ্য করবে।'

গোপাল বলেছিল, 'কি হয়েছে! কার সঙ্গে মারামারি করলাম। আপনাকে কে খবর দিল। মিছে কথা!'

আর তখই সারেঙসাব দেখেছিলেন, ওর গালে গলায় নখের আঁচড়। ফালা ফালা দাগ। এবং বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দাগগুলি।

'গোপাল।' খুবই ঠাণ্ডা গলা সারেঙসাবের।

গোপাল সারেঙসাবের দিকে তাকালে, তিনি বলেছিলেন, 'এদিকে আয়। আয় বলছি। উঠে আয়।'

গোপাল উঠে দাঁড়িয়েছিল। সারেঙসাবের এত ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বর সে যেন কোনোদিন শুনতে পায়নি। কিছুটা সে বিব্রত বোধ করছিল। সারেঙসাব তার মিছে কথা ধরে ফেলেছেন। সে যে আবার গোলমাল পাকাবে না কে জানে। সে উঠে গেলে তিনি বললেন, 'আয়নায় দাঁড়া।'

সে দাঁড়ালে দেখল, মুখে অজস্র উল্কি—নখের দাগ উল্কি সৃষ্টি করেছে। তার জ্বালাবোধ হচ্ছিল।

সারেঙসাব বললেন 'এগুলি কি!'

সে বলল, 'কি করে বলব, কি এগুলি! জালিতে নামতে গিয়ে হয়তো আঁচড় লেগেছে।'

সারেঙসাব বললেন, 'গোপাল তুই আমাকে জ্বালাস না। তুই আমাকে কি পাগল করে দিবি! তুই আমাকে বোকা ভাবিস! আমি কিছু বুঝি না ভাবিস!

সারেঙসাব কেমন বিপদের গন্ধ শুঁকে মুখ গোমড়া করে বের হয়ে গেছিলেন, দু-দিন আর কথা বললেন না, এই বুঝি শমন এসে হাজির। সারেঙসাবকে ডেকে পাঠাতে কতক্ষণ! গোপাল সারেঙসাবকে খুশি করার জন্য খানাপিনা এনে সাজিয়ে রাখত ফোকসালে। তামাক সাজিয়ে দিত। তিনি খান, তামাক টানেন, কিন্তু গোপালের সঙ্গে কথা বলেন না। ডেকে মাদুর, আর উজুর পানিও সে রেখে দেয়। তিনি উজু করেন, নামাজ পড়েন—কিন্তু গোপালের সঙ্গে কথা বলেন না। গোপালের সত্যি ভয় ধরে গেছিল, সত্যি যদি আবার তাকে ঐ নিষ্ঠুর কেবিনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। গোপাল আতঙ্কে পড়ে

াল বলা চলে—সারেঙসাবও ভাল নেই। কি হয়, কি হয়! আর আশ্চর্য াপাল দেখেছিল, কিছুই হয়নি। গোপাল দেখেছিল, বাবেতি আবার াট-ডেকে উঠে গেছে। গোপাল দেখেছিল বাবেতির কব্জিতে ব্যান্ডেজ। বেতির কব্জি গলায় ঝোলানো। বাবেতির হাতে জোর লেগেছে—এত ঙ্গারে হাত মুচড়ে দেওয়া তার ঠিক হয়নি।

সারেঙসাব গোপালকে ফোকসালে ডেকে বলেছিলেন, 'তুই মানুষ াপাল! কচি ছেলেটার হাত ভেঙ্গে দিলি!'

গোপাল বলল, 'আপনারা যে বলেন, ও শয়তান!'

সারেঙসাব বললেন, 'দ্যাখ, গোপাল, জাহাজ হলগে আজব জায়গা—কে াথা থেকে উঠে আসে কেউ জানে না। কেউ বলে পুত্রটির মাথা খারাপ, কউ বলে শয়তান, কেউ বলে ওর মা নেই, মা না থাকলে কি হয় আমি জানি, াকে কেউ রাখে না, রাখতে ভরসা পায় না, আচ্ছন্ন অবস্থায় পালিয়ে যায় মাঝে াঝে। কাকে খুঁজে বেড়ায়। সে কে কেউ জানে না?'

হঠাৎ সামান্য থেমে গোপালকে বলেছিলেন, 'তুই কি জানিস সে কে? তার সঙ্গে তো কথাবার্তা হয়।'

সে কে—গোপাল জানে। একজন লক্ষ্যভেদকারীকে সে খুঁজে বেড়ায়। ষারকুমারী তাকে বরফের নিচে লুকিয়ে রেখেছে—তাকে খুঁজে বের করতে য়। সে তার কাছে ব্যাপটাইজড হতে চায়। সে তাকে সতর্ক করে দেয়, ইট জ ডেনজারাস অ্যান্ড সিনফুল টু রান ইনটু দ্য আননোন। কেউ যেন তাকে লে, সার্চ ফর হিম অ্যান্ড ফর হিজ টেন্ডারনেস অ্যান্ড কিপ অন সার্চিং। াহাজে বাবেতির কি সেই অনুসন্ধান চলছে। তবে সে তো আর ক্ষ্যভেদকারী নয়, সে তো তুষার পর্বত পার হয়ে যাবার সময় দু-বার গড়িয়ে ড়তে পড়তে একটা পাহাড়ী ইঁদুরের মতো কাঁটা গাছের নিচে লুকিয়ে ড়েনি—কিংবা সে কখনও চিলনে যায়নি—তুষার জলে সাঁতারও াটেনি—অথচ কেন সে তার কাছে রুডি হয়ে গেছে বোঝে না। তার বাবা র্জি, সে অশ্বারোহীর পুত্র নয়—অথচ কেন যে বাবেতি তাকে একজন ক্ষ্যভেদকারী ভেবে থাকে—সে কিছুই বোঝে না!

সারেঙসাব বলেছিলেন, 'তুই চুপ করে আছিস, কিছু বলছিস না?'

'কি বলব! কাকে খুঁজে বেড়ায় জানব কি করে।'

'না জানাই ভাল। জাহাজে উঠেছিস, নিজের কাজকর্ম ছাড়া বেশি বুঝে াভও নেই। যা।'

তারপরই তার কেন যে মনে হয়েছিল, বাবেতি সম্পর্কে তার চিন্তাভাবনাও খুব স্বচ্ছ নয়। তার ক্ষতি করতে চাইলে বাবেতি বলতেই পারত, রুডি তার হাত মুচড়ে দিয়েছে। এটা যে কত বড় আস্পর্ধা এবং গোপালকে যে তার জন্য কত বড় ক্ষতি স্বীকার করতে হবে বাবেতি ঠিক জানে। সে জানে বলেই তার কোনো ক্ষতি করেনি। অথচ এতটা গায়ে পড়া বিষয়টা নানা কারণে তাকে সংশয়ের মধ্যে ফেলে দেয়।

সেই বাবেতি আজ প্রথম জাহাজ থেকে নেমে গেছে। সঙ্গে কুকুরটা। তাকে একবার শুধু আফ্রিকার বন্দরে নামতে দেখেছে। তাকে খুঁজে আনতে গেছিল। কুকুরটা না থাকলে তাকে খুঁজে পাওয়া যেত না। এ-সব কারণেও কৃতজ্ঞতা এবং ওর চুল আশ্চর্যভাবে বড় হয়ে যাওয়ায়—বাবেতির মধ্যে যে মেয়েলি স্বভাব আছে তা আরও উদ্ভাসিত। কিন্তু একজন পুরুষ মানুষ তো পুরুষের মতোই আচরণ করে। তার গায়ে বাবেতি হাত দিলে কেমন যেন মনে হয় পোকা মাকড় গায়ে হাঁটছে। আর এ-কারণেই সে ধস্তাধস্তি করেছে। এবং ঠেলে ফেলে দিয়েছে। হাত মুচড়ে দিয়েছে।

একা একা বাবেতি গাছগুলির ভিতর হারিয়ে গেল। তাদের জাহাজটা বন্দরের একেবারে নিচের দিকে ভিড়েছে। সামনের সমুদ্র জুড়ে জেটির পর জেটি—তাদের জেটিতে নামলে শহরের পার্ক, ঘরবাড়ি সব চেয়ে বেশি এবং সমুদ্র নিরিবিল, অথচ কেন যে মনে হয় বড় ঢেউ উঠলে এই শহরের ভিতরও সমুদ্র ঢুকে যেতে পারে। সে তখনই দেখল কুয়াশা কেটে গেছে। জাহির গরম জল এবং চা-পাতা ভিজিয়ে গ্যালি থেকে বের হয়ে আসছে। তার দেরি দেখেই জাহির উপরে উঠে এসেছিল। কিন্তু সে যে গ্যালি থেকে বাবেতি কতদূর যায় এবং কি করে, দেখার জন্য দাঁড়িয়ে আছে, নিচে চা নিয়ে যাবার কথা ভুলেই গেছে, জাহির উঠে না এলে যেন মনে করতে পারত না।

সে বলল, 'জাহির উপরে চা পাঠিয়ে দিস। আসলে বাবেতিকে ছেড়ে সে এখন যেতে চাইছে না। কোথায় যায়, কি করে দেখার ইচ্ছে। কারণ কুয়াশা কেটে গেছে এবং শীতের রোদ এই শহরের মাথায়, গাছপালার শাখাপ্রশাখায়। এক আশ্চর্য গভীর মমতা সৃষ্টি করছে যেন।

অবাক হয়ে সে দেখছে, বাবেতি, গাছপালার এবং পাখির ছবি তুলছে। তার হাতে ক্যামেরা। তার বড় বড় চুল উড়ছে হাওয়ায়। মাঝে মাঝে জাহাজের পিছিলে সে কি খুঁজছে। কাকে যেন খুঁজছে। গ্যালির ভিতরে সামান্য অন্ধকার—রোদ থেকে, গাছপালার ছায়া থেকে তাকে না দেখারই কথা। এবং

বাবেতি হাঁটু মুড়ে বসে ছবি তুলছে। ঘাসের উপর শুয়ে ছবি তুলছে। আর গোপাল দেখছে, বাবেতি পিছিলে কাউকে দেখার আগ্রহে বার বার পেছনে তাকাচ্ছে।

জাহির চা রেখে গেলে সে মেসরুমে ঢুকে গেল। সেখানে বসেও জানালায় দেখা যায় বাবেতি আর তার কুকুর ডাঙ্গা পেয়ে কেমন আত্মহারা। সেও এই ডাঙ্গায় নামার জন্য কম আত্মহারা নয়। আজ সে বিকাশদার সঙ্গে কার্নিভালে যাবে। যে যার বেতনের একটা আংশিক টাকা তুলতে পারে। ফূর্তি ফার্তা করলে এক রাতেই শেষ। কার্নিভেলে জুয়ার আড্ডায় জমে গেলে এক রাতেই ফতুর। সে এতসব যখন ভাবছিল, তখনই দেখল বাবেতি দৌড়ে আসছে। পিছিলের দিকে আসছে। সে তাড়াতাড়ি গা ঢাকা দেবার জন্য নিচে নেমে যাবে ভাবল—কিন্তু তখনই ঠিক জেটির কিনারে বাবেতি হাজির। বাবেতি ডাকছে, 'রুডি, রুডি।'

গোপালের কেন জানি মনে হল, বাবেতি তার কোনো ক্ষতিই করতে পারে না। তা না হলে, সে কখনও জীবন তুচ্ছ করে রাতে সেই কারাগার কক্ষের ছাদে বসে থেকে রুডি নামক এক কল্পিত যুবার গল্প শোনাত না। তার কষ্ট জাহাজে যেন দু'জনই বোঝে। আলতাফ মিঞা আর বাবেতি। সে বের হয়ে জাহাজের রেলিঙে ঝুঁকে হাত তুলে বলল, হাই।

বাবেতি ঠিক নিচ থেকেই চোখ রেখে সাটার টিপে দিল—তারপর ইশারায় তাকে জাহাজ থেকে নেমে আসার জন্য কাতর অনুরোধ জানাল।

সে কেন যে বাবেতির অনুরোধ অগ্রাহ্য করতে পারে না। রোদ উঠে যাওয়ায় কন কনে ঠাণ্ডা বাতাস আর তেমন তীব্র নয়। সে দৌড়ে গ্যাঙওয়ে ধরে সিঁড়ি ভেঙ্গে জেটিতে নেমে গেল। বাবেতিও ছুটে আসছে। দু'জনেই সেই গাছপালার মধ্যে হারিয়ে গেলে দেখল, ব্রিজে কাপ্তান দাঁড়িয়ে আছেন। দূর থেকে ব্রিজের কাছে কাপ্তানকে দেখাচ্ছিল কোনো মর্মস্পর্শী ছবির মতো। তিনি কি দেখছেন কে জানে—অবশ্য গোপাল কেমন কিছুটা সংকোচের মধ্যে পড়ে গেল। তিনি যদি রুষ্ট হন। তবে সে বলতে পারবে বাবেতি তাকে ডেকে পাঠিয়েছে—সে ইচ্ছে করে জাহাজ থেকে নেমে আসেনি, বরং বাবেতিকে অগ্রাহ্য করে সে কাপ্তানের পুত্রকে যে অসম্মান করতে চায় না তা অন্তত বোঝাতে পারবে।

আর বাবেতি এখন গোপালকে নিয়ে যে কি করবে! পার্কটা খুব বড় নয়। ঠিক পার্কও বলা যায় না—কয়েকটা বড় বড় গাছ ছাড়া আর কিছু নেই।

লোহার বেড়াও নেই। খালি মাঠে কোনো গাছপালার সাম্রাজ্য ছাড়া এই পার্কটাকে তেমন সুন্দর কিছু মনে করার কারণ নেই—তবু ডাঙ্গায় হেঁটে বেড়াতে পারলেই যে কত প্রসন্ন হওয়া যায় দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর তা টের পেতে কষ্ট হয় না। বাবেত্তি তাঁকে নিয়ে গেল গাছের পাশে। সে গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বাবেত্তি ছবি তুলছে। তাকে নিয়ে গেল সমুদ্রের কিনারায়। সমুদ্র এবং পাখির উড়াউড়ির মধ্যেও ছবি তুলল তারা—কিছুটা সামনে হেঁটে গেলে বালিয়াড়ি—এবং সমুদ্র। তার ভিতর জলে ডাঙ্গায় সে হেঁটে যাচ্ছে। বাবেত্তি হেঁটে যাচ্ছে। বড় বড় ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে পায়ের কাছে—বাবেত্তি সব রকমের ছবিই তুলে রাখছে। তবে শহরটায় কোনো উঁচু ঢিবি নেই যে উঠে যাবে—যেমন কেপটাউনে সে দেখেছে নানা পাহাড়শ্রেণী, এখানটায় শুধু সমতল ভূভাগে আশ্চর্য এক শহর। নর নারীরা বেড়াতে বের হয়ে পড়েছে। বালিয়াড়িতে রঙিন ছাতার নিচে প্রায় উলঙ্গ হয়ে শুয়ে বসে আছে নরনারীরা। নারীর শরীরে সাঁতারের পোষাক—খুবই আংশিক বলে, সে লজ্জায় তাদের দিকে তাকাতেও পারছিল না। সে চুরি করে তাদের দেখার চেষ্টা কবছে। ঘুরতে ঘুরতে তার মনে হল, সত্যি পরী হুবীর দেশ এটা। নর নারীরা সবাই দেখতে দেবদেবীর মতো। অথচ এমন আংশিক বুকঢাকা কোমরঢাকা পোষাকে কি করে সবার সামনে মেয়েরা বের হতে পারে গোপাল বুঝতে পারে না। এদের শরীরে শীতের ঝলকানিও লাগে না। তার তো এখনও বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। হাঁটছে বলে ততটা ঠাণ্ডা লাগছে না ঠিক তবুও এ-ভাবে খালি গায়ে বালিয়াড়িতে শুয়ে বসে থাকলে সে কেমন হোঁচট খায়। বাবেত্তি ডাকল, হাই।

গোপাল বুঝল, বাবেত্তি তার হা করে দেখার ব্যাপারটা একদম পছন্দ করছে না।

তারপর ওরা ফের ফিরে আসার সময় শহর হয়ে ফিরল। গোপালকে বলল, রুডি দাঁড়াও। একটা দোকানে ঢুকে ছবির রোলটা দিয়ে দিল। ইশারায় বুঝিয়ে দিল, কবে সে ছবিগুলি নেবে। ছবি তোলার জন্য আরও কিছু কি যেন কেনাকাটা করল বাবেত্তি। জীবনে একবার মাত্র তার ছবি তোলা হয়েছে, তা জাহাজে ওঠার আগে। 'নলিতে' পার্সপোর্ট-সাইজের ছবিটা সাটা আছে। জীবনে আর কখনও কোথাও সে ছবি তোলার সুযোগ পায়নি—এটা তার কাছে খুবই বড় খবর। জাহাজে গিয়ে বলতে হবে। এবং মনে হল বাবেত্তিকে বলবে, সে যেন সব জাহাজিদের একটা গ্রুপ তুলে দেয়। এ-সব ভাবার সময়

বাবেতি বলল, ধরো। সে দেখল একটা প্যাকেট। প্যাকেটে কি আছে জানে না। তাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে বড় একটা ঝলমলে দোকানে ঢুকে গেছিল বাবেতি। বেশ বড় প্যাকেট এবং বেশ ভারি। প্যাকেট তার হাতে দেবার সময় মিষ্টি করে হাসল বাবেতি। প্রথমে হাসিটুকু তার ঠোঁটে ঝুলেছিল, গোপাল প্যাকেট হাতে নিলে হাসিটুকু সারা মুখে উদ্ভাসিত হল। কি আশ্চর্য চোখ বাবেতির! সে কেমন কিছুটা বোকার মতো বলে ফেলল, 'এটা কার?'

বাবেতি বলল, 'তোমার।'

'কি আছে!'

'জাহাজে ফিরে দেখ কি আছে।'

আরে আবার ঘুষ! এটা তার আজকাল মনে হয়—বাবেতি তাকে আকৃষ্ট করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করছে। আদৌ পছন্দ করে না বাবেতি ঘুষের সুযোগ নিয়ে আড়ালে তাকে জড়িয়ে ধরুক। পেছন থেকে জাপটে ধরুক। হাত টানাটানি করুক। কিংবা গালের নরম উলের মতো দাড়িতে হাত বুলিয়ে উষ্ণতা খোঁজার চেষ্টাও বড় বিরক্তিকর। এই মেয়েলি স্বভাবটাকেই সে ঘৃণা করে। না হলে বাবেতির মতো ছেলে হয় না। তার রুচিবোধ প্রখর। বিকালে সে যখন ডেক-চেয়ারে বসে থাকে—সুন্দর সুন্দর ছবিয়ালা বইএ নিমগ্ন হয়ে যায়—কিংবা কাপ্তানবয় ট্রেতে কফি নিয়ে এলে সে হাতের ইশারায় রেখে যেতে বলে তখন কে বলবে এই ছেলে মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক আচরণ করতে পারে।

তাকে যে ভালমন্দ খেতে দেয়, এটাও যে একই কারণে—যেমন সে গঙ্গাবাজু ধরে ফরোয়ার্ড-পিকে গেলে পোর্টহোলে ঠিক সেই পরিচিত হাতটি বের হয়ে আসবে। বাবেতির হাত। হাতে হয় আপেল, নয় কমলা, কখনও কেক, কখনও আইসক্রিম—যখন সে যায় তারও চোখ থাকে বাবেতির পোর্টহোলে—তাকে বেশ লোভে ফেলে দিয়েছে এই করে।

জাহাজের একঘেয়ে খাওয়া খুবই বিরক্তিকর। মাঝে মাঝে খেতেই ইচ্ছে করে না—তখন তার এ-হেন সুযোগ বাবেতি জাহাজে না থাকলে সম্ভব হত না বোঝে। খাওয়ার লোভ তার আছে। একটু বেশি পরিমাণেই আছে। নতুবা সেই বা যখন তখন গঙ্গাবাজু ধরে কাজ না থাকলেও ফরোয়ার্ড-ডেকে যাবে কেন। পোর্টহোলে শুধু হাতটাই দেখা যায়। রোগা হাতটিতে ধরা আছে আপেল। বাবেতি টের পায় কি করে—সে যাচ্ছে ফরোয়ার্ড-পিকে। বাবেতি কি সর্বক্ষণ তার প্রতি নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু এ-জায়গাটায় সে

বাবেতির প্রতি দুর্বল। চুরি করে যে দেয় তাও বোঝে গোপাল—ঠিক চুরি নয়। নিজে না খেয়েও তাকে দিতে পারে। জাহাজের ভালমন্দ খাবার হলে বাবেতি বোধহয় তাকে না খাইয়ে তৃপ্তি পায় না।

এ-সব ভাবলে বাবেতির উপর তার আর ক্ষোভ থাকে না। সে চুপচাপ হাঁটছিল। বাবেতি পাশে। প্যাকেটের ভিতর কি আছে টিপে বোঝার চেষ্টা করল। এমন সুন্দর করে প্যাকেটি তৈরি যে বোঝার উপায় নেই ভিতরে কি আছে। তবে খাবার নয়। খাবারের প্যাকেট নয়। খাবারের প্যাকেট হলে সে হয়তো প্রশ্নই করত না। এ-ব্যাপারে গোপালকে কিছুটা লোভীই বলা যায়। এত ভারি যখন, অন্য কিছু।

সে ফের বলল, 'কি আছে না বললে নিচ্ছি না।'

বাবেতি গোপালের পাশে গা লাগিয়ে হাঁটছে। গোপালের হাত ধরতে চেয়েছিল, গোপাল হাত সরিয়ে নিয়েছে। এত ঘনিষ্ঠ হয়ে হাঁটাও যেন তার পছন্দ নয়। সে বাবেতির সঙ্গে সবসময় কিছুটা দূরত্ব রাখার চেষ্টা করছে—কারণ জাহাজি-রোগটার প্রকোপেই যে বাবেতি এত ঘনিষ্ঠ হয়ে হাঁটার চেষ্টা করছে না কে বলবে! যদি বাহার কিংবা বিকাশদা হাত ধরে হাঁটতে চাইত সে কিছু বলত না। এ-ভাবেই তো একজন সঙ্গীর দরকার হয় জাহাজে।

'কেন নেবে না। একটা কোট আছে। তোমাকে খুব মানাবে। কিনলাম। শীতে কষ্ট পাচ্ছ দেখে খারাপ লাগছিল।'

শীত না অন্য কিছু! এমন ভাবল গোপাল, তারপর বলল, 'নিতে পারি। তুমি কিন্তু সুযোগ পেলেই আমাকে আর জড়িয়ে ধরবে না। গালে হাত দিয়ে বলবে না—তুমি আমার যীশু।'

'ঠিক আছে বলব না।'

'কখনও বাংকারে নামবে না।'

'নামব না।'

'কখনও কুকুর লেলিয়ে দেবে না।'

'দেব না।'

কিন্তু এ কি, বাবেতি আর হাঁটছে না। বাবেতি কি প্রকাশ্য রাস্তায় নাটক করতে চায়। বাবেতি ফুঁপিয়ে কাঁদছে কেন? সে বলল, 'আরে কি হল তোমার? এস।'

বাবেতিও কাছে এসে বলল, 'তুমি নষ্ট হবে না কথা দাও।'

'আমি নষ্ট হয়ে না যাই মানে!' গোপাল বিস্ময়ের গলায় প্রশ্ন করল।

'জাহাজ তো ভাল জায়গা নয়। তুমি স্টিফেনের বাড়িতে যেতে কেন?'

'বা যাব না। কুসুম কত সুন্দর তুমি জান। কুসুমের কথা ভাবলে আমার এখনও মন খারাপ হয়ে যায়।'

আর যায় কোথায়! গোপাল দেখল, এক হ্যাচকায় প্যাকেটটা বাবেতি কেড়ে নিয়েছে। তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জাহাজের দিকে ছুটছে। গোপাল ডাকছে, 'বাবেতি, প্লিজ—কি হল তোমার! আরে আমি কি খারাপ কথা বলেছি—তুমি বোঝ না কেন, আমার মন খারাপ হতেই পারে। তোমারও হত।' সে দৌড়ে গিয়ে প্যাকেটা তুলে নিল। তারপর আরও দ্রুত ছুটে গিয়ে বাবেতির হাত চেপে ধরল।

আশ্চর্য দেখল, বাবেতির আর কোনো রাগ নেই ক্ষোভ নেই! কেমন শান্ত স্বভাবের হয়ে গেছে। বাবেতি হাঁটছে না। দাঁড়িয়ে আছে। গোপালের দিকে তাকাচ্ছে না। যেন সে গোপালকে চেনেই না। ওরা পার্কটায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক পার্ক নয়—কিছু বড় গাছপালা—এবং তারপরই জাহাজ। জাহাজ থেকে কেউ না দেখে ফেলে—কাপ্তানের পুত্র তার ইয়ার বন্ধু নয়, যে সে ইচ্ছে করলেই হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। তার এ-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকাও উচিত নয়। জাহাজে খবর রটে যেতেই পারে, কাপ্তানের পুত্র গোপালকে নিয়ে ছবি তুলতে বের হয়ে আর ফিরছে না। এত দেরি কেন—কোথায় গেল! খোঁজখবর শুধু যে কাপ্তানই করবেন, কারণ পুত্রকে নিয়ে তো তিনি সবসময় ত্রাসে থাকেন—তিনি করতেই পারেন—সারেঙসাব না আবার খোঁজাখুঁজি শুরু করে দেন। গোপাল কোথায়! গোপালকে দেখছি না! এবং যা হয়, সে দূর থেকেই দেখল, আলতাফ মিঞা বোট-ডেক থেকে তাকে ঠিক দেখে ফেলেছে। তিনি যথার্থই তার জন্য পায়চারি শুরু করে দিয়েছেন।

গোপাল এতে খুশি না। মাঝে মাঝে যেমন মনে হয়, আলতাফ মিঞার এটা বাড়াবাড়ি—তার সঙ্গে আলতাফ মিঞার কোনো রক্তের সম্পর্কও নেই, আলতাফ মিঞা এ-ভাবে তাকে জাহাজে না দেখলে জলে পড়ে যান—সেটাও স্বাভাবিক আচরণের পর্যায়ে পড়ে না। আড়াই তিন মাসে, একজন জাহাজির সঙ্গে এমন কি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে যে তিনি এতটা বিচলিত বোধ করতে পারেন। আলতাফ মিঞার এই বাড়াবাড়িতে সে মাঝে মাঝে এত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে যে—তিনি যা অপছন্দ করেন—তাই সে বেশি করে করতে চায়। আরে মিঞা কোথাকার কে তুমি, দেশের লোক—দেশের লোক কে না, জাহির

বাহার মাধব বিকাশদা কে নয়। আমাকে নিয়ে পড়েছ! জাহাজ থেকে নেমে গেলেই তোমার মাথায় বাজ পড়ে। তুমি কি মিঞা আমার বাপ জ্যাঠা, না আমি তোমার বংশের বাতি—নিভে গেলে তোমার সব অন্ধকার, সে খেপে গিয়েই বাবেতির হাত আরও জোরে চেপে ধরল। কারণ সে বুঝেছে এতে আলতাফ মিঞার মাথায় ক্যাড়া উঠে যাবে—কিন্তু কাপ্তান খুশি হতে পারেন। কারণ কাপ্তানের মনে হতে পারে তার পুত্রটি গোপালের সান্নিধ্য চায়। তার পুত্রটি হয়তো এ-ভাবে নিরাময় হয়ে উঠবে। বাবেতির মধ্যে এই একটা কু-স্বভাব ছাড়া আর কি আছে যা অস্বাভাবিক সে বুঝতে পারে না। বাবেতি কথা দিয়েছে, সে কখনও আর সুযোগ পেলেই তাকে জাপটে ধরে আদর খাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করবে না। এতে গোপাল খুশি।

সে ফিরে এসে আজ ইচ্ছে করেই প্যাকেটটা খুলে সবাইকে দেখাল, কাপ্তানের পুত্র তাকে একটা দামি কোট উপহার দিয়েছে। সারেঙসাবকেও দেখাল। সারেঙসাব খুশি না। ক্ষেপে লাল—'দিল আর নিলি! তোর ইজ্জত নেই। বড়লোকের বেটারা জানিস বান্দর হয়। ঘাড়ে চেপে বসলে নামাতে পারবি! কোথায় কোন আঘাটায় কুঘাটায় নিয়ে যাবে ভেবে দেখেছিস!'

গোপাল যেন সারেঙসাব চটে যাওয়ায় খুব খুশি। আঘাটায় কুঘাটায় নিয়ে যাবে! নিয়ে যায় তো বেশ করবে। একদম মুরুব্বি করবে না! আমার ভাল মন্দ বোঝার বয়স যথেষ্ট হয়েছে, মিঞা তোমার আর খবরদারি করতে হবে না। তোমার কাজ কাম তুলে দেওয়া ছাড়া আর কি সম্পর্ক!

সে অবশ্য মুখে কিছু বলল না। চটিয়ে দিতে পেরেছে, এতেই সে খুশি। বিকালে সেজেগুজে কিনারায় বের হয়ে গেল। বিকাশদা, সে, জাফর বাহার—তারা প্রায় সবাই সমবয়সী জাহাজে। রাস্তায় নেমে গেলে তারা টের পায়—তারা যে জাহাজি, স্থানীয় লোকজন ঠিক বুঝতে পারে। নষ্ট মেয়েরা আরও বেশি বোঝে। এবং কার্নিভালের দরজার ক্ল্যারিওনেট বাজছে। ধামসা বাজছে। চোঙ মুখে বাহারি একজন মানুষ অনবরত কি বলে যাচ্ছে। টিকিট কেটে তারা ভিতরে ঢুকে গেল। নারী আর মাতাল মানুষের ভিড়। আবছা অন্ধকারে নাবিকেরা নারী সংসর্গ করছে। যেন এই কার্নিভাল আর বন্দর একসঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। জুয়া মদ এবং নানা কণ্ঠস্বর। লাল নীল বল নিয়ে খেলা। দোকানে নানা পসরা—উজ্জ্বল আলো কোথাও—আবার কোথাও ঘন নিবিড় অন্ধকার গাছপালার মধ্যে অরণ্য সৃষ্টি হয়ে আছে। যে যার মতো টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে বেবুশ্যে মেয়েদের। তাদের কাছেও হাজির—হাতের

ইশারায় বোঝাতে চায় কত পেসু তাদের দর। গোপাল কেমন কিছুটা উত্তেজিত—সে বিকাশদার সঙ্গে যুবতীর দোকানে ভিড়ে গেল—লাল নীল বল নিয়ে খেলতে থাকল এবং এক রাতেই সে ফতুর হয়ে যেত।

অবশ্য ফতুর হতে পারল না—কারণ মা-র মুখ তাকে সহসা বিচলিত করল। বাবা লণ্ঠন নিয়ে যেন বড় রাস্তায় অপেক্ষা করছেন মনে হল—সে বলল, 'আমি যাব।' বিকাশদা বললেন, 'কোথায় ?' সে বলল, 'মা-র জন্য একটা কম্বল কিনব।' গোপাল জানে এখানে সস্তায় বেশ গরম কম্বল কেনা যায়। সে জানে বলেই বিকাশদার হাত ধরে টানতে টানতে কার্নিভালের বাইরে চলে আসতে পারল।

জায়গাটার নাম, লেস্ত্রোঅ্যালেন। মানুষজনের ভিড়। ফুলের বাহারি সব সো-কেস। রাস্তায় উজ্জ্বল 'আলো। যেন একটা ছবির মতো পরিচ্ছন্ন পৃথিবী। সে তার মা-র জন্য কম্বল কিনে জাহাজে ফিরে দেখল, বাদশা তার অপেক্ষায় বসে আছে। হাতে একটা খাম। বাদশার চিঠিটা আজ লিখে না দিলে সে যে নড়বে না টের পেয়েই বলল, বোস দিচ্ছি। সারেঙসাব কোথায় !

বাদশা বলল, 'শুয়ে আছেন। এতক্ষণ তো উপরেই আছিল।'

'আমায় খোঁজাখুঁজি করেছেন ?

'তা তো জানি না। তবে উপরে শীতের মধ্যে বইসা ছিলেন। ঠাণ্ডা লাগতে কতক্ষণ।

এই হল বিপদ গোপালের। আসলে বসেছিলেন তার অপেক্ষাতে। এই কন কনে ঠাণ্ডায় কান গলা বরফ হয়ে যাবার জোগাড়। হাত পা অসাড় হয়ে যায়। রাত যত বাড়ে তত হিমেল ঠাণ্ডা—সারেঙসাব সব উপেক্ষা করে ঠিক তার ফেরার অপেক্ষাতে বসেছিলেন। জাহাজে উঠে এলে হয় তো চুপি চুপি ফোকসালে ঢুকে গেছেন। শুয়ে পড়েছেন।

সে শুধু বলল, যা খুশি করুক ! আমার কি। কৈ দেখি। কি লিখবি বল।

কে বলবে এখন, বাদশা তার ওপরয়ালা ! খত লিখে দেবার সময় বাদশা প্রায় করজোড়ে বসে থাকে। বাদশার এত সব গোপন খবর খতে লিখে না দিলে জানতেও পারত না। বাদশা যে এত রসিক তাও টের পেত না। ওর ছোট বিবিকে নিয়ে গোপাল কম ইয়ার্কি ফাতরামিও করেনি। সেই থেকে ভাব। সেই থেকে তুই তুকারি।

এই বাদশা মিঞাই আবার স্টকহোলডে বাঘের মতো তেড়ে আসত তাকে। সেই আবার ফোকসালে গোপালকে বাঘের মতো ভয় পায়। কাজকামে

সামান্য ত্রুটি থাকলেই সে তেড়ে আসত। চিৎকার করে বলত, ক্যাডা কইছিল তরে জাহাজে আইতে! কয়লার সুট খালি। চিত হইয়া পইড়া আছস, ভরব ক্যাডা শুনি! আর ফোকসালে ফিরে এলে সেই বাদশা দরজায় টোকা মেরে বলবে, অ গোপাল তর মেহেরবানি হইব? আর একখান কথা যে আছে।

ইনজিনরুমের রাগটা তার দমন হয়নি—সে ক্ষেপে গিয়ে বাদশাকে বলত, না হবে না। পারব না আমি এখন ঘুমাব। তখন সে হা হা করে হেসে উঠত। 'অরে গোপাল, জাহাজ হইল গিয়া ইবলিশ। বোঝলি কিছু! বুঝলি না? ইবলিশ হলগা শয়তান। শয়তানের প্যাটে আমরা ঢুইকা গেছি। গরমে মাথা ঠিক রাখতে পারি না। হাড্ডাহাড্ডি লাইগাই থাকে। কাজে কামে গাফিলাতি হইলে কসুর হয়রে গোপাল। বোঝস না ক্যান! কথাখানা যোগ কইরা দ্যা গোপাল।'

নিরক্ষর মানুষটির জন্য তখন গোপালের মায়া হত। দেশে বিস্তর জমাজমি, পুকুর, তিন বিবি। দেশের খবর গোপাল জানে চিঠি লেখার দৌলতে। তিন বিবি কেন? এমন বললেই বাদশার মুখ ব্যাজার।—তোর লজ্জা করে না বুড়া বয়সে শাদি করতে। একটা নাবালিকার জীবন নষ্ট করে দিলি? তুই মানষু!

তখন বাদশার এক কথা—পরাণডা বড় কান্দেরে। কবে যে দেশে ফিরুম! ছোটবিবি আমারে পাগল কইরা দিছে! লিখ দে আমরা বুনোসাইরিসে আছি। তারপরে যামু দূর সাগরে—দখিন দরিয়ায় যাওয়ার কথা আছে।

পরবর্তী বন্দরের নাম ঠিক বাদশা বলতে পারে না। সে গোপালের দিকে তাকিয়ে থাকে।

গোপাল লেখে, জাহাজ যাবে ভিকটোরিয়া পোর্টে। তা মাসখানেক লেগে যাবে।

লিখ দে গোপাল, দিল আমার আনচান করে। পুকুরঘাটে তুই বইসা থাকস, চক্ষে তর কান্দন ঝরে—আমি ফিরা গেলে দুনিয়া উপুর কইরা দিমু তর কইলজার মধ্যে।

এই নিয়ে পর পর তিনিখানা খত। কলম্বোর ঘাটে, কেপটাউনের ঘাটে। গোপাল কলম তুলে বসে আছে—তারপর! তারপর কি লিখতে হবে বাদশা যেন জানে না। বাদশা কেপটাউনের ঘাটে নিজে বন্দরে নেমে ডাকবাকসে চিঠি ফেলে এসেছে। কারও হাতে দিত না। বাদশার এই কুকীর্তির কথা শুধু গোপালই জানে, গোপাল এও মনে করে বিশ্বাস ভঙ্গের চেয়ে বড় পাপ নেই—বড় হতে হতে এটা সে পারিবারিক সুবাদে বুঝেছে। বাদশা তাকে

দু'হাতে জড়িয়ে বলেছে, কাউরে কইস না। দু' কান হইলে আমার ইজ্জত থাকব না। নসিব আমার—বুঝলি না। শেষ বয়সে মাইয়াখানের মিষ্টিমুখ দেইখা দিলে কী যে হইলরে ভাই! জমিজমা লিখা দিছি। দেনমোহরের টাকা দিছি। অর বাপের ভিটায় ঘর তুইলা দিছি। কি করি নাই ক! বাদশা এক একটা বাক্য শেষ করে থম মেরে বসে থাকত।

'কি হল ?'

'না আর একখানা কথা আছে। লিখা দে, দ্যাশে ফিরা গিয়াই আব্বুর শাদি দিমু।'

'আব্বুটা আবার কে ?'

'আমায় ছোট পোলা। শেষ কাম। পোলার শাদি দিলে আল্লার কাছে মোনাজাত ছাড়া আমার আর অন্য কাম থাকব না।'

চিঠিটা লিখে গোপাল হাতে দিতে গেল, কিন্তু বাদশা নিল না। বলল, সবটা পড় শুনি। সবটা পড়ার পর সে কি ভাবল কে জানে, বলল, 'গোপাল, আর একখানা কথা বাকি আছে।'

'তোমার মুণ্ডু আছে।' গোপাল লাফ দিয়ে বাংক থেকে নেমে পড়ল। চিঠিটা বাদশার মুখে ছুঁড়ে দিল। 'থাকল তোর চিঠি। বের হ। ঘর থেকে বের হ! এ কি রে, শেষ হয় না। আর একখানা কথা বাকি আছে। বাদশা তোর কথা আর ইহজীবনে শেষ হবে না। কে তোকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল, বুড়া বয়সে শাদি করে জাহাজে উঠতে। বালিকার মাথা চিবাতে বিবেকে বাঁধল না।'

'অরে গোপাল মাথা গরম করিস না। চুলের বাঁস কে বা না নেয়রে গোপাল! আমার ইজ্জত নিয়া টানাটানি করিস না। দোহাই আল্লার—শুনতে পাইব কেউ!'

বাদশা গোপালের বাংকের পাশে মাথা নিচু করে বসে আছে। বাদশা জানে, এই গোপন খবর ফাঁস হয়ে গেলে তার ইজ্জত থাকবে না—তাকে কেউ আর ইমানদার মানুষ ভাববে না। ছোকরা জাহাজিরা তার পেছনেও লাগতে পারে।

বাদশার সরল সাদাসিদা মুখ দেখে গোপালের সত্যি কষ্ট হল। বাদশা যেন সত্যি ভারি বিপাকে পড়ে গেছে। বাদশার কাছ থেকে খামটা নিয়ে বলল, 'বল আর কি লিখতে হবে।'

সে বলল, 'ল্যাখ, কথা মোতাবেক দেনমোহরের টাকা তর বাপের কাছে

গচ্ছিত আছে। কথা মোতাবেক তিন কানি জমি তর নামে লিখা দিছি। কথা মোতাবেক আর অ-তিন পদ গহনা দিমু। তারপর গোপালের দিকে তাকিয়ে বলল, বাদশা কথার খেলাপ জানে না বুঝলি !

গোপাল না বলে পারল না—'তোর কি মায়া দয়া নেই বাদশা। কথার খেলাপ বড় কথা হল। তার কাছে তোর কথার দাম কি ! সে তো শেষ হয়ে গেছে।'

॥ বারো ॥

জাহাজ ভিক্টোরিয়া পোর্টে ঢুকছে। বুয়েনস এয়ার্স থেকে জাহাজিরা খালি জাহাজ নিয়ে রওনা হয়েছিল। প্রায় মাসখানেক লেগে গেল। খালি জাহাজ নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দেওয়া খুবই বিরক্তিকর। সমুদ্র শান্ত থাকলেও জাহাজ এদিক ওদিক টাল খায়। গাছের গুঁড়ির মতো লাগে জাহাজটাকে। যেন সবাই বিশাল গাছের গুঁড়ির উপর বসে আছে। ভেসে যাচ্ছে নিরন্তর। সামান্য ঝড় বৃষ্টিতে টালমাটাল। জীবন অতিষ্ঠ।

সেই খালি জাহাজ নিয়ে জাহাজিরা ঢুকছে বন্দরে। সামনেই বন্দর, বলে থার্ডমেট কোথায় যে হাওয়া হয়ে গেল। বন্দর কোথায় ! কেবল দু-পাশে সব আজগুবি দৃশ্য—শূন্য মাঠের মতো নির্জন পাহাড় দু-পাশে—কিংবা বনভূমিও বলা যায়। খাঁড়ির ভিতর ঢুকে এতটা পথ, যেন শেষ হতে চায় না।—সমুদ্রের খাঁড়ি এত দীর্ঘপথ অতিক্রম করে ডাঙ্গার এতটা ভিতরে ঢুকে যেতে পারে বিকাশ অন্তত অনুমান করতে পারেনি। সে ক্ষেপে লাল। নানা বন্দরে গেছে জাহাজ নিয়ে—পাঁচ সাত সফরের অভিজ্ঞতা অথচ তাজ্জব বনে গেছিল বন্দরে ঢোকার পথে। যেন জাহাজ ক্রমেই দু-পাহাড়ের ফাঁকে ঢুকে নিজেকে অদৃশ্য করে দেবার তালে আছে।

সারাটা দিন লেগে গেল অথচ খাঁড়ি পথ শেষ হচ্ছে না। খাঁড়ির জল নীল কখনও সবুজ অথবা খয়েরি—পাহাড় এবং পাথরের রঙ জলে নানা প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করছে। কেউ বলতে পারছে না ঠিক কটায় জাহাজ বন্দর পাবে। সবাই বন্দরের আশায় রেলিঙে ঝুঁকে আছে।

জাহাজিদের আরও ক্ষোভ, পাহাড়ের মাথায় বেশ বনজঙ্গল, গভীর বনভূমি সবই আছে—মানুষের বসতিও থাকতে পারে—অথচ দু-পাশে নিরেট পাথর ছাড়া আর কিছুই দৃশ্যমান নয়। কতদূর আর। এতো হারামির বাচ্চারা আর এক গ্যাড়াকলে ফেলে দিল—বিকাশ অধৈর্য্য হয়ে শুধু এ-সবই ভাবছে।

গোপালকে তাতিয়ে দিচ্ছে, কিরে তোর পুত্রটি কি হাপিজ হয়ে গেল। বলল, সামনে বন্দর, এখন আর তার পাত্তা নেই! থার্ড মেট গেল কোথায়!

আসলে সকালে দু-পাহাড়ের ফাঁকে ঢোকার সময় থার্ড অফিসার এমন হাবভাব দেখাল, যেন রেডি হয়ে থাক, বন্দরে ঢুকছি। বন্দরে ঢুকতে কি সারাদিন লেগে যায়! বন্দরে ঢোকার নামে জাহাজিরা টান টান হয়ে থাকে। টান টান হতে পারার মজাই আলাদা। সমুদ্রের একঘেয়ে নীল জল, নীল আকাশ অথবা জ্যোৎস্না রাতে অনন্ত মহাকাশের অদৃশ্য রহস্য—স্টিয়ারিং ইঞ্জিনের কক্ কক্ শব্দ এবং দূরাগত কোনো নক্ষত্রের ইশারা জাহাজিদের ডাঙ্গার জন্য বিহ্বল করে রাখে। ডাঙ্গায় নামলেই জাহাজিদের পরমায়ু বেড়ে যায়। তারা শুধু হাঁটে আর হাঁটে। শিস দিতে দিতে জেটি পার হয়ে দু-হাত তুলে দেয়। দু-পাশের বাড়িঘর, দোকানপাট আর আছে নারী রহস্যময়ী, যেন হাতের মুঠোয় গোপন করে রেখেছে জাহাজি মানুষের পরমায়ু। এত ভাল মানুষ থার্ড অফিসার, এতটা খচরামি না করলেই পারত। দেখতে দেখতে দিন শেষ হয়ে গেল। আকাশে তারা ফুটে উঠল। লজঝরে জাহাজ কি চলছে না! যতদূর চোখ যায় শুধু গভীর অন্ধকার। মাস্তুলের আলো আর জাহাজের গোঙানি ছাড়া সব কিছুই যেন বিস্ময়করভাবে অবাস্তব।

গোপালের মনে হয়েছিল, তারা হয়তো ভুলে আমাজান নদীর মোহনায় ঢুকে যাচ্ছে, কারণ জাহাজটাতো নিজের মর্জি মতো চলে—কিছুই যখন দেখা যাচ্ছে না, কেবল জাহাজের সার্চ-লাইটের আলো ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না, সামনে লেগুনের জল ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না, তখন তারা আমাজান নদীর ভিতরে ঢুকে গেলেও আপত্তির কিছু থাকতে পারে না।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই গোপাল টের পেল প্রপেলার ঘুরছে না। জাহাজ থেমে আছে। খাড়া পাহাড়ের নিচে নোঙর ফেলা। জেটি নেই। শহর কিংবা বন্দরের কোনো চিহ্ন নেই। দূরে নদীর উপর ব্রিজ। দু-পাহাড়ের যোগাযোগের জায়গা। গোপাল উপরে উঠে ঘুম চোখে সব দেখছিল।

বেশ গরম পড়ে গেছে। গায়ে জামা রাখা যাচ্ছে না। বিকাশ হাতে কেতলি নিয়ে উপরে উঠে দেখল গোপাল চুপচাপ বসে আছে। কিনারা দেখছে। না, কিছুই দেখছে না। গোপালের মনমেজাজ ভাল থাকতে নাও পারে। পয়লা সফর। বাবা-মাকে ছেড়ে বেশিদিন বোধহয় কোথাও থাকার অভ্যাস নেই। আর এই নীরস সমুদ্রযাত্রা তাকে কাহিল করে দেবে বেশি কি। বিকাশ বলল, কিরে চা খেয়েছিস? গোপাল তাকাল—কিছু বলল না। বাদশা

মিঞা ফের ওকে ধরবে। বাদশার বালিকা বধূর কথাও তার মনে হল।

গোপাল বলল, হলে দিও। আর কিছু বলল না।

বিকাশ নেমে গেল কেতলি হাতে। ফোকসালে ঢুকে বলল, মাইরি কিচ্ছু নেইরে। মালপত্তর কিছুই চোখে পড়ল না। ক্রেন নেই জেটি নেই—দু-পাশে উঁচু পাহাড় বনজঙ্গল ছাড়া কিছু চোখে পড়ল না।

একটা কাপ বের করে বিকাশ চা ঢালল। বাহারকে বলল, যা তো উপরে দিয়ে আয়। গোপাল চুপচাপ বসে আছে। বাড়ির জন্য বোধ হয় মন খারাপ। কতদিন হয়ে গেল। আমাদেরই ভাল লাগছে না। ওর আর দোষ কি!

বাহার গোপালকে চা দিয়ে নেমে এল। এসেই দুঃসংবাদ জারি করে দিল, হয়ে গেল। বন্দরে কাজকর্ম নেই। ধর্মঘট। এখন পচে মরতে হবে। কিনারায় নামা যাবে না।

বিকাশ বলল, হয়ে গেল, ধুস ধর্মঘট! ধর্মঘট না হলেই কি হত! জেটি কোথায়। সারা ডেক ঘুরে দেখলাম নামার কোনো রাস্তা নেই। কোনো বোটও নেই নিচে। খাড়া পাহাড়। উঠবি কি করে? জাহাজ বয়াতে বেধে রেখে হারামির বাচ্চারা তামাসা করছে। আমরা মানুষ না!

বাহার বলল, বুঝলে না দাদা, যে খায় চিনি, যোগায় চিন্তামণি। যে নামার, ঠিকই নেমে যাবে।

তারপর কি ভেবে বলল, গোপালকে ডাকি। একা থাকা ভাল না। ওর কিছু একটা মনে হয় হয়েছে।

বিকাশেরও মনে হয়েছিল কিছু একটা হয়েছে। কি হয়েছে জানে না। তবে কোট নিয়ে যা নাটক হল, তাতে বেচারা ঘাবড়ে যেতেই পাবে। সারেঙসাবও একটা কোট এনে বলেছিলেন, গোপাল শোন। গোপাল সারেঙসাবের ফোকসালে ঢুকলে তিনি বলেছিলেন, দেখতো কোটটা তোর গায়ে লাগে কি না। যা শীত!

'কার কোট?' গোপাল প্রশ্ন না করে পারেনি।

'আমার ছেলের কোট। গায়ে দিয়ে দেখ না।'

'আপনার ছেলের কোট, আমি গায়ে দিয়ে দেখলে হবে?'

'দেখ না পরে। না হলে কিনব কেন?'

গোপালের বোধ হয় কিঞ্চিত সংশয় ছিল। তবু সে কোটটা পরেছে। বলেছে, খুব সুন্দর ফিট করেছে। বলে কোটটা খুলে সারেঙের হাতে দিলে

তিনি বলেছিলেন, নিয়ে যা। রেখে দে। দরকারে চেয়ে নেব।

গোপাল কেমন ক্ষেপে গেছিল। সে কি ভিখারী—বাবেতি তাকে কোট দেয়, বাবেতির দেখাদেখি সারেঙসাব তাকে কোট দেয়—এ তো আচ্ছা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল জাহাজে। সে স্রেফ বলেছিল, না আমার লাগবে না। আর তারপর থেকেই কথা বন্ধ গোপালের সঙ্গে। গোপালও কেমন জেদি এবং একগুঁয়ে হয়ে উঠেছে। তা জাহাজের যিনি তার বলতে গেলে মাথার উপর আছেন, তার সঙ্গে কথা বন্ধ থাকলে মনতো খারাপ হবেই। এমন কি এ-বন্দরে গোপাল নেমে যায় যদি, তাতেও যেন তিনি আদৌ চিন্তিত নন। জাহান্নামে গেলেও না।

গোপাল ঢুকে দেখল—বেশ গ্যানজাম চলছে। চা চপাটি খাওয়া হচ্ছে। নামতে পারছে না বন্দরে—এ জন্যও আক্ষেপ। বাহার বলছে, 'বিকাশদা তুমি খালি চোখে কত কিছু দেখতে পাও। রশিদ মিঞার দূরবীনটা চোখে দিলে আরও কি না দেখতে! রশিদ মিঞা তো জাহাজ থেকে না নেমেই সব দেখতে পায়।'

রশিদ জাহাজের আগয়ালা। একই ফোকসালে থাকে। রশিদের দূরবীন সম্পর্কে জাহাজে একটা গুজব আছে ঠিক, তবে দূরবীনটা কেউ আজ পর্যন্ত দেখতে পায়নি। রশিদ চা খাচ্ছিল, সে কোনো মন্তব্য করছে না। মিচকি হাসছে।

বাহার বলল, 'কি মিঞা ঠিক বলিনি! তুমি তো জাহাজ থেকে না নেমেই সব দেখতে পাও। নারী, গাছের ছায়া, শহরের বাড়িঘরে রমনের ছবি, পার্কের বেঞ্চিতে নারীর উলঙ্গ হয়ে শুয়ে থাকা—উপরে সাদা পায়রার ঝাঁক, নীল-সবুজ নক্ষত্ররা পর্যন্ত টুপটাপ ঝরে পড়তে থাকে তোমার দূরবীনে। একবার দেখাও না, চোখে দিয়ে সবাই দেখি। নামতে না পারলেও আসল কাজ হয়ে যাবে। কিনারায় না গেলেও চলবে।'

'খুব ভাল, খুব ভাল।' সবাই চিৎকার করে উঠল। রশিদ মিঞার দূরবীন পেলে কিনারায় না নামলেও চলবে। যার যেমন খুশি ডেকে বসেই দেখতে পাবে। যে যেমন চায় দেখবে। কিন্তু গোপাল 'খুব ভাল খুব ভাল' বলতে পারল না। কারণ জাহাজ এ বন্দর থেকে কবে নোঙর তুলবে কেউ বলতে পারে না। কাপ্তান নিজেও না। ব্যাংক লাইনের কাজ কারবার আলাদা। যাত্রাপথের কোনো মাথামুণ্ডু নেই। যেখানে খুশি ঢুকে মাল তুলে নাও। জাহাজের খোল খালি রেখ না। খালি জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে ঘুরে বেড়ালে

এমনিতেই কোম্পানির লোকসান—তার উপর ব্যাংক লাইনের জাহাজগুলি সমুদ্র চষে বেড়ায় মালের খোঁজে।

ডেক জাহাজি ইন্দ্রনাথও হাজির। বিকাশদার ফোকসালটায় ছুটি থাকলে সারাদিনই গ্যানজাম চলে। টোবাকো কাগজে মুড়ে সিগারেট পাকাতে পাকাতে বিকাশদা বলল, 'ইন্দ্রনাথ রশিদের দূরবীনটা কব্জা করতে হয়। রশিদ তো মাথা পাতছে না। জাহাজের যা অবস্থা।' রশিদ বলল, 'দিতে পারি, তবে কিছু হলে আমি জানি না।'

ইন্দ্রনাথ বলল, 'সাপ না বাঘ। কিছু হলে আমি জানি না বলছ।'

রশিদ বাংকে শুয়ে তাস মেলাচ্ছিল—সে চায়, কাজকর্ম যখন নেই এক হাত তাস খেলা হয়ে যাক—তা না, দূরবীন নিয়ে পড়েছে। বাহারই একমাত্র দূরবীনটার কথা জানে। এই বেটারই কাজ, দূরবীনের গুজব ছড়িয়ে দেওয়া। এটা অবশ্য ঠিক দূরবীনটা চোখে দিলে সে নানা কিছু দেখতে পায়, আর কেউ পায় না। কার্ডিফের পুরানো বাজার থেকে সে কিনেছিল। দোকানি বলেছিল আছে। দূরবীনও আছে। নাওতো বের করে দেখাতে পারি। তবে না নেওয়াই ভাল। তুমি ইন্ডিয়ান আমিও ইন্ডিয়ান—তোমার কোনো ক্ষতি হয় চাই না। এটা কিনে নেয়, ঠিক আবার কেন যে এটা তারা ফেরতও দিয়ে যায়। কি রহস্য আছে ভেতরে আমিতো জানি না।

ইন্দ্রনাথ জোরাজুরি শুরু করে দিয়েছে—'বের কর রশিদ। চল উপরে গিয়ে বসি। যখন আছে তোর কাছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা যাক। গাছপালার ফাঁকে পেলেও পেয়ে যেতে পারি মানিক রতন।'

মানিক রতন যে মেয়ে মানুষ সবাই বোঝে। জাহাজ ঘাটে ভিড়লেই এই এক নেশা। রশিদ বলল, কোথায় রেখেছি, মনে নেই। আসলে সে বের করতে চায় না। কারণ দূরবীনে সে যা দেখতে পায় আর কেউ তা দেখতে পায় না। সে একবার সমুদ্রে আগুন জ্বলতে দেখেছিল দূরবীনে। জাহাজ ঘাটে লাগলে খবর এল দেশ থেকে তার ঘরবাড়ি পুড়ে গেছে। একবার সমুদ্রের ঢেউ-এ জলকন্যারা নাচানাচি করে বেড়াচ্ছিল—পরে খবর পেল চাচাত ভাইয়ের সঙ্গে বিবি তার ফস্টিনস্টি করছে। তার অতি সত্বর দেশে ফেরা দরকার। গত সফরের দুই জলকন্যার কথা ভাবলে এখনও তার হৃদকম্প উপস্থিত হয়। সে যে বেঁচে গেছে তা আল্লার মেহেরবানি। ঢেউ-এর ঝাপটায় তার উড়ে যাবারই কথা ছিল। আসলে দূরবীনটা এমন সব অলৌকিক জগৎ তৈরি করে ফেলে যে রশিদ সেখানে এক নিরুপায় মানুষ। যেন এটা স-

দুর্ঘটনার আগাম সঙ্কেত পাঠিয়ে দেয়। দূরবীনটা, কে তার মালিক তাও যেন বোঝে। অন্যরা দূরবীন চোখে দিলে কিছুই দেখতে পায় না। সে ভেবেছে, কার্ডিফে গেলে দোকানিকে দূরবীনটা ফিরিয়ে দেবে। ফেলে দিতেও পারে না, তাতে তার আরও বড় ক্ষতি হতে পারে। ঘর-বাড়ির উপর দিয়ে গেছে—বিবির উপর দিয়ে গেছে। দেশে ফিরে সে সব শুনে বিবিকে তালাক না দিয়ে পারেনি।

সেই দূরবীনটা কব্জা করার জন্য তারা উঠে পড়ে লেগেছে। রশিদ গোপালের হাতে গোপনে চাবি পাচার করে দিল। গোপালকে উঠে যেতে বলল, কারণ যে-ভাবে সবাই উঠে পড়ে লেগেছে, তার কাছ থেকে চাবি না কেড়ে নেয়। পেটি খুলে না দেখে। চাবি না থাকলে, সে কি করবে! গোপাল ভাল মানুষের মতো উঠে নিজের ফোকসালে চলে গেল। দূরবীন সম্পর্কে তার কোনো কৌতূহল নেই—কবে জাহাজ দেশে ফিরবে তার উপর সারেঙসাবের শরীর ভাল যাচ্ছে না। ঠাণ্ডা লাগিয়ে এখন সর্দিজ্বর কাশি লেগেই থাকছে। এ-জন্য সেই দায়ি। তার ফিরতে দেরি দেখলে তিনি কেন যে এত ঘাবড়ে যান সে বোঝে না।

আশ্চর্য গোপাল দেখছে এ বন্দরে না সারেঙসাব, না বাবেতি—কেউ তাকে নিয়ে উৎকণ্ঠায় নেই। বন্দরটা যেন খুবই নিরাপদ তাদের কাছে। কারণ জেটি নেই, শহর নেই, মেয়েমানুষও নেই। বয়াতে বাঁধা জাহাজ। কোনো বোটও ভিড়ছে না নিচে। বোটে দড়ির সিঁড়িতে নেমে যাওয়া যায়। বন্দর এলাকা একেবারে সুনসান। বাবেতি আর তার উপর সুযোগ পেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে না। তবে বাবেতি চায় গোপাল, বিকেলে তার পাশে বসে থাকুক। সে নানা রকম গল্প তখন গোপালকে শোনায়। চকমকি বাক্সের গল্পও তাকে বলেছে। ঠাকুরমার কাছে শোনা একই রকম সব রূপকথা। বাবেতি অদ্ভুত সব কথা বলে, 'জান সৈনিকটি যুদ্ধে গিয়েছিল—এখন বাড়ি ফিরছে। পথে দেখা এক ডাইনি বুড়ির সঙ্গে।'

'বুড়ি বলল, শুভ সন্ধ্যা।'

'সৈনিকটি বলল, 'ধন্যবাদ, ডাইনি বুড়ি।'

'পথের পাশে কাছেই একটা গাছ দেখিয়ে বুড়ি বললে, ঐ বড় গাছটা দেখেছ? ওর ভেতরটা একেবারে ফাঁপা। গাছের মগডালে উঠে গেলে দেখতে পাবে ফাঁপা জায়গাটা দিয়ে তুমি নেমে যেতে পারছ। বড় একটা গর্ত দেখতে পাবে। আমি তোমায় কোমরে এক গাছি দড়ি বেঁধে দেব। দড়ি ধরে টান

দিলেই আমি তোমায় তুলে আনব।'

'সৈনিকটি বলল, গিয়ে কি হবে ওখানে ?'

বুড়ি বলল, অনেক ধনদৌলত পাবে। ওগুলি তুমি নেবে। দেখবে সিন্দুকের উপর একটা চকমকি বাক্স আছে ওটা পেলে শুধু তুমি 'আমায় দেবে।'

গোপালের প্রশ্ন, 'কেন বুড়ি নিজে নিচে নামতে পারে না। সৈনিকটির কি দরকার !'

বাবেতি ডেকচেয়ারে হেলান দিয়ে কি ভাবে। সত্যি তো বুড়িতো নিজেই নেমে আসতে পারে। ডাইনি বুড়ি, সে পারবে না কেন ? গোপালের এমন প্রশ্ন শুনে কিছুটা হতাশ হয়ে পড়ে বাবেতি। তারপর বলে, আরে বুঝছ না, 'শত হলেও বুড়ি, চোখে হয়তো ভাল দেখতে পায় না।'

গোপাল বলে, 'তা অবশ্য ঠিক। বুড়ি চোখে ভাল দেখতে নাই পারে।'

সৈনিকটি বলল, 'মন্দ ফন্দি নয়, কিন্তু বুড়ি তোমাকে সেই টাকার কতটা অংশ দিতে হবে ? মনে হচ্ছে লুটের পুরো অংশ না আবার শেষে চেয়ে বসো।'

ডাইনি বলল, এক আধলাও নয়। কেবল আমাকে এনে দিতে হবে পুরনো চকমকি বাক্স। সেটা আমার দিদিমা গতবার গাছটার ভিতর যখন নেমেছিলেন তখন ভুলে ফেলে এসেছেন।

এ ভাবেই বাবেতি সুন্দর সুন্দর গল্প বলত গোপালকে। চকমকির বাক্স সবার একটা চাই। চকমকির বাক্স না হয় রুপোর আংটি। মন্দ কাটছিল না। সৈনিকটি চকমকি বাক্সের রহস্য টের পেয়ে বুড়িকে বলল, ওটা নেই কেউ আগেই নিয়ে গেছে। বুড়িকে ঠকিয়ে বাক্স নিয়ে সে ওধাও। চকমকির বাক্সটায় কাঠি জ্বালাতে গেলেই একটা কুকুর হাজির। সৈনিকটি যা যা চায় তাই পেয়ে যায়। কিন্তু একজনকেই সে পাওয়ার জন্য বড় শহরে আস্তানা গেড়েছে। সে হলগে সে-দেশের রাজকুমারী। কথা আছে একজন সাধারণ সৈনিকের সঙ্গে সে পালিয়ে যাবে—আর তার জন্য তাকে রাজা তামার প্রাসাদে বন্দী করে রেখেছে।

গোপাল বলল, তামার প্রাসাদে বন্দী করে রাখলে তো সৈনিকটির পক্ষে তার খোঁজ পাওয়াই কঠিন।

বাবেতি বলল, তুমি না রুডি খুব বোকা আছ। সৈনিকটির কাছে চকমকির বাক্স আছে। রাজা কখনও পারে তাকে আটকাতে। সে যতই একজন সাধারণ

সৈনিক হোক না, চকমকির বাক্সে কাঠি জ্বালতে পারলেই তার সব হাতের কাছে।

গোপাল বলল, 'কাঠি জ্বালাবার সুযোগ কি তাকে দেওয়া হবে? তার আগেই কোতল হয়ে যাবে না তো?'

তারপর গোপাল একদিন বাবেতিকে খবরটা দিল। গোপাল বলল, জানো বাবেতি জাহাজে একটা দূরবীন আছে। প্রায় চকমকি বাক্সের মতো তার ক্ষমতা।

বাবেতি হেসে ফেলল। এতে গোপালের রাগ হতেই পারে। সে উঠে চলে যাচ্ছিল। বাবেতি যা বলে সে তো সহজেই বিশ্বাস করে। আর দূরবীনের কথা বলতেই বাবেতি হেসে দিল! গোপাল কি এতই ছেলেমানুষ—না কি সে একজন সাধারণ জাহাজি বলে তাকে বাবেতি অবহেলা করছে। বাবেতি যা বলবে বিশ্বাস করতে হবে, আর সে বললে হেসে উড়িয়ে দেবে।

কিন্তু গোপাল উঠতে পারল না। হাত টেনে বসিয়ে দিল বাবেতি। কাপ্তান বয় দু-কাপ কফি রেখে যান টিপয়ে। গোপাল আগে বুঝতে পারত না দু কাপ কেন! সে বিশ্বাসই করতে পারত না, তার জন্যও এক পেয়ালা কফির অর্ডার হতে পারে। কার পরামর্শে হচ্ছে এতটা, সে তাও বুঝতে পাবে না। বাবেতি না কাপ্তান! বাবেতি কফি খাবে, আর গোপাল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে হয় না। গোপাল সঙ্গে থাকলে তাকেও যেন দেওয়া হয়। কফি এবং কিছু বিস্কুট। সে না খেয়ে চলে যাচ্ছিল, বাবেতি হেসে ফেলল। তারপর হাত টেনে বসিয়ে দিতে গোপাল বুঝল—বাবেতি তাকে অপমান করার জন্য হেসে ফেলেনি। সে বরং দূরবীনটা সম্পর্কে আগ্রহ দেখাল। জিজ্ঞেস করল, কার কাছে আছে ওটা। ওটা চোখে দিলে কি দেখতে পাব? ওর অলৌকিক ক্ষমতা আছে, যদি থাকে, দেখাও না।

গোপাল বলল, ওটা নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পেলে চেষ্টা করব দেখাতে।

গোপাল উঠতে যাচ্ছিল। সে আজকাল বাবেতির কাছ থেকে বই নিয়ে আসে। বাংকে শুয়ে শুয়ে পড়ে। বাবেতি বলছে তাকে হ্যানস অ্যানডারসনের বই কার্ডিফ বন্দরে গেলে কিনে দেবে! গল্পগুলি গোপালের পড়া উচিত। হাতের কাছে নেই বলে দিতে পারছে না। এমনও আক্ষেপ করল। আর যখন সে রাতে ফোকসালে ফিরবে বলে নেমে যাচ্ছিল কেন যে বাবেতি তাকে বলল, জান গোপাল, চকমকির বাক্সটা আমার কাছেও আছে। এত কাছে থাক, অথচ

কেন যে টের পাও না।

বাবেতির এমন সব রহস্যময় কথাই গোপালকে আরও বেশি বিপাকে ফেলে দেয়। মাঝে মাঝে কেমন ভয় হয়—বাবেতির কি আচ্ছন্ন অবস্থা এখনও কাটেনি। চকমকির বাক্স গল্পে থাকে, বাবেতির কাছে থাকবে কেন! অথবা বাবেতি কেন লেখে—সার্চ ফর হিম, ফর হিজ টেন্ডারনেস অ্যান্ড কিপ অন সার্চিং।

এমন সব গোলমালের কথা মাথায় পাক খেতে থাকলেই গোপাল অন্যমনস্ক হয়ে যায়। চুপচাপ মাস্তুলের নিচে একা একা বসে থাকে। তার বাড়ির কথা মনে হয়—কত দীর্ঘকাল যেন সে বাড়িছাড়া হয়ে আছে। কত দূরে, হাজার হাজার মাইল দূরে, সে নোঙর ফেলে বসে আছে। কবে এখান থেকে জাহাজ নোঙর তুলবে সে জানে না। কোথায় যাবে তাও জানে না। শুধু এক অপার শূন্যতা যেন চারপাশে বিরাজ করছে। সারেঙসাবের সেবা শুশ্রূষা যতটা করার, গরম জল, ওষুধ যখনকার যা দিচ্ছে। তিনি খুবই কাহিল হয়ে পড়েছেন। কাপ্তান নিজেও একদিন ফোকসাল রাউন্ড দিতে এসে প্রশ্ন করেছিলেন, কি ভাবে ঠাণ্ডা তিনি লাগালেন। জ্বর জ্বালা নেই, তবে কাশিটা যেন লেগে আছে। গরমে তিনি আজকাল কেমন হাঁসফাস করছেন। ডেকে রোজ রোজ হিমেল বাতাসকে অগ্রাহ্য করে তার জন্য অপেক্ষা করলে তো ঠাণ্ডা লাগবেই। ঠাণ্ডার দোষ কি। কিন্তু সে দেখেছে, এখনও সারেঙসাব তার উপর প্রসন্ন নন। বাবেতির ডাকে সাড়া দিলেই তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে যান। সে যে কি করে।

আসলে বাবেতির কাছে বসে থাকলে সে টের পায় বাবেতি এক আশ্চর্য রূপকথার জগত তৈরি করে তার ভিতর বসবাস করছে। সে যেন নিজেই সেই রূপকথার নায়ক। তার সরল চোখ এবং আশ্চর্য নিবিষ্টতা রূপকথার পাত্র-পাত্রীদের বড় বেশি মনে করিয়ে দেয়। তার সঙ্গ পেলে সে কিছুটা সময় নিজের হতাশার কথা ভুলে থাকতে পারে।

বাবেতি তার কাছে কিছুই আজ পর্যন্ত চায়নি। দূরবীনটা শুধু দেখতে চেয়েছে। ওটা কি করে যে রশিদের কাছ থেকে বাগানো যায়। তার নিজেরও কম সখ না ওটা চোখে রেখে দু-পাড়ের গাছপালা দেখার। অথচ রশিদ বলেছে, দিলে গোপাল মুসকিলে পড়ে যেতে পারে। কি মুসকিল, তার সম্পর্কে কিছুই বলছে না। কিন্তু বোট-ডেকে উঠে গেলেই যে বাবেতি বলবে দূরবীনটার খোঁজ পেলে!

সে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়ে আজকাল। কারণ এ-ভাবে

জাহাজে আর দিন কাটাতে পারছে না। কবে মাল তোলা হবে—কবে বন্দর চালু হবে কেউ বলতে পারছে না। এ-ভাবে কাহাতক দিন কাটানো যায়। কিনারায় যেতে পারছে না। বাবেতির কাছেও যেতে পারছে না। গেলেই বাবেতি দূরবীনটার খোঁজ খবর নেবে। সে যে কেন বলতে গেল! দূরবীনটা বাবেতিরই বা কেন এত দরকার। অগত্যা রশিদকে ডেকে আড়ালে সে বলল, বাড়িয়ালার ছেলে তোমার দূরবীনটা দেখতে চেয়েছে। আর যায় কোথায়! বাড়িয়ালার ছেলের নামে সবারই পিলে চমকে যায়। সে তো জাহাজের একজন সামান্য ফায়ারম্যান। রশিদ শুধু বলল, খারাপ কিছু হলে আমি কিন্তু দায়ি থাকব না।

গোপাল বলল, 'খারাপ কিছু হবে কেন? দূরবীনটা কোনো যাদুকরের।'

'এই তো মুসকিলে ফেললে গোপাল। দূরবীনটা কার জানি না। তবে চোখে দিলে কি দেখতে কি দেখে ফেলবে—তারপর কিছু হলে—

'কি হবে বলছ?'

'আগে থেকে কি বলা যায়। যে যেমন দেখতে চায় দেখে ফেলে। আবার সোজাসুজি গাছপালাও দেখা যায়। যা আছে তাই দেখা যায়। সমুদ্রে থাকলে সমুদ্র, পাহাড় থাকলে পাহাড়—দূরবীনে যা দেখার কথা আর কি!'

গোপাল বলল, 'বাড়িয়ালার ছেলে ওটা না পেলে যে ক্ষেপে যাবে রশিদ।' আসলে রশিদকে কিছুটা প্রায় আতঙ্কের মধ্যে ফেলে দিল।

দুপুর বেলাতেই তার ফোকসালে রশিদ এসে হাজির। একটা কাঠের কালো রঙের বাক্স। বাক্স খুলে দূরবীনটা দেখাল। বলল, 'বাড়িয়ালার ছেলে যদি রেখে দিতে চায়, রেখে দিতে পারে। তবে দাম দিতে হবে। যাই হোক, যা খুশি দাম। দাম না দিলে কিন্তু দূরবীনটা কোনো কাজে আসবে না।'

গোপাল হাতে নিয়ে দেখল, চোখে সেট করে দেখল। পোর্টহোলে উঠে গিয়ে দেখল। যা দেখা যায় দূরবীনে তাই দেখতে পেল। এমন কিছুই দেখল না, যা দেখলে মনে হতে পারে দূরবীনটার কোনো রহস্য আছে।

গোপাল বিকেলেই উঠে গেল বোটডেকে। বাবেতি এখনও উঠে আসেনি। সে দু-পাড়ের গাছপালা, জাহাজ এবং পাহাড়ের মাথায় কিছু বাড়িঘর দেখতে পেল। সাধারণত যা দেখা যায় তাই দেখছে। আর কিছু না। তবু মনে হল দূরবীন চোখে রাখার মধ্যে কেমন নেশা থাকে। চোখ থেকে ওটা নামলেই মনে হয়, কি যেন দেখার কথা ছিল, তা সে দেখতে পায়নি। আবার চোখে রেখে যদি দেখা যায়। যেন খুবই কাছে কি দেখে ফেলল, মজার কিছু

হবে, আর জাহাজিরা দূরবীনে কি দেখতে চায়, গোপাল ভালই জানে। সে যে তাই খুঁজছে না কে বলবে। বাবেত্তি উঠে আসায় দূরবীনটা আর কাছে রাখা গেল না। বাবেত্তি দূরবীন হাতে নিয়ে বলল, এই সেই অলৌকিক দূরবীন। তারপর সে চোখে দিয়ে দু-পাড় দেখতে দেখতে বলল, খুব দামি জিনিস। সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দূরের পাহাড়টা দ্যাখো কত কাছে এসে গেছে!

গোপাল বলল, 'দাও তো দেখি। কোথায় পাহাড় তোমার চোখে এত কাছে চলে এল! আমি তো দেখছি নদীর মোহনা। গোপাল তারপর আর কথা বলতে পারছে না। কারণ বাবেত্তি বললেও বিশ্বাস করবে না। সে নিজেই তার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। নদী এখানে আসবে কোত্থেকে। নদীর জল ঘোলা দেখতে পেল। গভীর অরণ্য এবং এক গোপন জলাশয়ও দেখতে পেল। কিন্তু এ সব তো দেখার কথা না। জলাশয় এবং কোনো কুটীর পাহাড়ের মাথায় থাকতেই পারে। কিন্তু নদীর মোহনা আসে কি করে সে দেখল ঠিক, তবে বাবেত্তিকে বলতে পারল না নদীর মোহনা দেখে ফেলেছে। এটা তো সমুদ্রের খাঁড়ি। মোহনা আসবে কোত্থেকে। আসলে চোখের ভুল। সে ফের চোখে রাখল দূরবীনটা- -না, যা আছে তাই। পাহাড়ের মাথায় ঘর বাড়ি—অবশ্য, দূরের সেতুটিও সে দেখল। গাড়ি মানুষজন এবং নীলজলে সাদা রঙের বাইচ নৌকা সবই দেখা গেল বোট-ডেকে বসে।

বাবেত্তি দূরবীনটার তারিফ করল খুব, তবে অলৌকিক কিছু মানতে রাজি হল না। সে শুধু বলল, এটা তোমার কাছে রেখে দাও। তারপর কি ভাবল—শেষে বলল, জাহাজ কার্ডিফে গেলে আমরা নেমে যাব। বাবাতে তাই বললেন, কার্ডিফে নেমে গেলে তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না। বলে বাবেত্তি মুখ ঘুরিয়ে নিল!

গোপাল বুঝতে পারছে না, বাবেত্তি আর কথা বলছে না কেন! সে মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে কেন! কত বাহানা সৃষ্টি করেছে দূরবীনটা হাত করার জন্য, সে ভেবেছিল, দূরবীনটা পেয়ে বাবেত্তি খুব খুশি হবে। দূরবীনে সে নানা মজা আবিষ্কার করতে পারবে, কিন্তু দূরবীনটা নিছকই একটা দূরবীন—চকমকির বাক্স কিংবা রূপোর আংটি নয় যে ইচ্ছে করলেই নানা অলৌকিক রহস্য তৈরি করতে পারে—সাধারণ একটা দূরবীন পেয়ে বাবেত্তি খুশি নাই হতে পারে। তাই বলে মুখ ঘুরিয়ে রাখবে কেন। গোপাল শুয়ে বাবেত্তির মুখ দেখতে গিয়ে কেমন আকুল হয়ে গেল। বাবেত্তি কাঁদছে। বাবেত্তির চোখ থেকে টপ টপ করে জল

পড়ছে।

সত্যি গোলমেলে ব্যাপার। সে বলল, 'যাই।'

বাবেতি কোনো সাড়া দিল না।

গোপাল বলল, 'ওটা তোমার কাছে থাক।'

বাবেতি কথা না বলে, দূরবীনটা ওর দিকে এগিয়ে দিল। তারপর বলল, আজ রাতে আমরা নেমে যাব রুডি। হোটেল ভাড়া করা হয়েছে। সেখানে থাকব। শহরের কাছাকাছি অনেক দেখার জায়গা আছে সেখানে আমরা ঘুরে বেড়াব। বন্দর চালু হলে আমরা আবার ফিরে আসব। সময় না কাটলে দূরবীনটাতো তোমার হাতের কাছে থাকলই। পাহাড়ের মাথায় বেড়াতে এলে তুমি ইচ্ছে করলে আমাকে জঙ্গলের মধ্যে পেয়েও যেতে পার।

এ-ভাবে কোনো জাহাজ যদি দিনের পর দিন নোঙর ফেলে বসে থাকে তবে জাহাজিদের ক্ষেপে যাবারই কথা। কেউ কেউ নেমে যাবার জন্যও পাগল। কারণ পাহাড় ডিঙ্গিয়ে যেতে পারলেই ঠিক কোনো শুঁড়িখানা পেয়ে যাবে—কিংবা যা হয়, রাতে যদি জাহাজের নিচে কোনো বোট এসে লেগে যায়। এবং দড়ির সিঁড়ি ধরে উপরে নারীরা উঠে আসে। ডেক-টিন্ডাল এ ব্যাপারে ওস্তাদ লোক। সকালের দিকে যারা মাছ সবজি বিক্রি করতে আসে তাদের সঙ্গে মুখ শোঁকাশুঁকির ব্যাপার ঘটছে টের পেয়েই ইঞ্জিন সারেঙ, ডেক-সারেঙকে তড়পে গেছেন। এটা কি বেশ্যা পাড়া—যার যা খুশি করবে। জাহাজে কাজ করি বলে কি ইজ্জত নাই। ইমান নাই।

বিকাশ, ইন্দ্রনাথ, রশিদ বুঝতে পেরেছিল—তাদের শুনিয়ে ইঞ্জিন সারেঙ শাসাচ্ছে। এটা যে গোপাল জাহাজে আছে বলেই তিনি বিপাকে পড়ে গেছেন এটাও বুঝতে অসুবিধা হল না। কাপ্তান, বেশ ছুটি কাটাতে শহরে চলে গেলেন। শালা জাহাজে একটা মাদি কুকুর ছিল, সেও পর্যন্ত পর্যটনে বের হয়ে গেছে। কুকুরেরও যে সুখ সুবিধা আছে তাও তাদের নেই। প্রায় এই নিয়ে জাহাজিদের মধ্যে কুরুক্ষেত্র বেঁধে যাবার যোগাড়। গোপাল কিছুতেই সারেঙসাবকে সামলাতে পারছে না। কেবল বলছে, আপনার এত মাথা ব্যথা কেন। যার যা খুশি করুক। আর এতেই তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন—যার যা খুশি করুক। কারো বুঝি বাড়িঘর নেই, মা-বাবা নেই, বৌ-বিবি নেই—ছেলে পুলে নেই! যার যা খুশি করুক! এত সোজা!

সত্যি যে সোজা নয়, বুড়ো জাহাজিরা তা বুঝিয়ে দিল। বলল, সারেঙসাবের তবিয়ত ভাল নেই। দেখতেই পাচ্ছ মানুষটার শ্বাস নিতে

কষ্ট—কথা বলতে কষ্ট, কথা বললেই কাশি উঠছে—তোমরা কি চাও, মানুষটা মরে যাক !

এখন গোপালের একটাই কাজ। সারাদিন ইঞ্জিন রুমে খাটাখাটনির পর, সারেঙসাবের মাথায় কিছুক্ষণ বসে থাকা—সারেঙসাব কেন যে তাকে অপলক দেখেন। তারপর সারেঙসাবের নামাজের ব্যবস্থা করে দেয় সে। মাদুর পেতে দেয়। উজু করার জল নিয়ে আসে। তিনি কেন যে খুব খুশি হন এতে। বিধর্মী মানুষ—সারেঙসাব আপত্তি করতেই পারেন—কিন্তু করেন না—অন্য অনেক জাহাজি তার এই আচরণে খুশি না। সারেঙসাব কাউকেই পাত্তা দেন না বলে তারা আড়ালে কথা বললেও সামনে কিছু বলতে পারে না।

তারপর সারেঙসাব কখনও খুশি হয়ে বলবেন, দেখতে দেখতে সময় কেটে যাবে। হতাশ হস না। বাড়ির জন্য সবারই মন খারাপ করে। তারপর তিনি বলেন, বাড়িয়ালার ব্যাটা তোকে নাকি কি দিয়ে গেছে।

আসলে দূরবীনটা যে তার কাছে আছে চাউর হয়ে গেছে। দূরবীনটা রশিদু বাড়িয়ালার ব্যাটার কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। বাড়িয়ালার ব্যাটা কিনারায় নেমে যাবার আগে গোপালের জিম্মায় রেখে গেছে। তিনি এজন্য গোপালকে সাবধান করে দিয়েছেন, কেউ চাইলে দিবি না। কার মনে কি আছে! নিয়ে যদি ফেরত না দেয়। যদি বলে, পাচ্ছি না—তখন তোর মুখ রক্ষা হবে কি করে। ফেরত দিবি কি করে !

গোপালের মনে হয় মানুষটি বড়ই সরল এবং ধর্মভীরু। বাড়িয়ালার ব্যাটা তার কাছে দূরবীনটা রেখে গিয়ে যেন ঠিক কাজ করেনি। সে ছেলেমানুষ, তাকে ভজিয়ে কখন দূরবীনটা পাচার করে ফেলবে, আর তখন গোপাল পড়বে বিপদে—এই চিন্তাতেও তিনি কিছুটা যেন আকুল। জাহাজিদের কাছে দূরবীনের গুরুত্ব যে বেড়ে গেছে তিনি এটাও টের পান। কিছুই ভাল না লাগলে সারেঙসাব বলেছেন, চোখে দূরবীন লাগিয়ে খুঁজে দেখ না, আল্লার দুনিয়ায় কত কি থাকতে পারে। একটা ছোট্ট গাছ, একটা পাখি, কিংবা কোনো প্রজাপতিও কখন যে জাহাজিদের একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে ফেলতে পারে—সে বিকালে বোটডেকে বসলেই আজকাল তা টের পায়। তার সুবিধা সেখানে কেউ যেতে পারে না। তার সুবিধা কাপ্তান বয় তার জন্য ঠিক আগের মতোই কফি কিংবা আপেল, কখনও বিস্কুট রেখে যান।

এক বিকালে গোপাল দেখল পাখিরা অরণ্যের মাথায় কক কক করে ডাকছে। সে নির্দিষ্ট একটা পাখিকে ধরার চেষ্টা করছে দূরবীনে—এবং শুধু

একটাই পাখি ধরা পড়ে গেলে ক্রমে দূরবীনের লেনস্ ঘুরিয়ে সে পাখিটাকে একেবারে চোখের সামনে হাজির করল। ডানা ধূসর। বুক সাদা, এবং হলুদ রঙের পা। চোখ নীল। নীলসমুদ্রের অ্যালবাট্রস পাখি এগুলি। খাবার লোভে বন্দরে উড়ে এসেছে।

একদিন দেখল, একটি ছোট্ট শিশু এবং পাতার ঘর। একজন কোঁকড়ানো চুল, তামাটে রঙের, ঠোঁট ভারি মানুষ পিঠে কাঠের বোঝা নিয়ে কুটীরে ফিরছে। আদর করছে শিশুটিকে। শিশুটির মা পিঠ থেকে কাঠের বোঝা নামিয়ে এক গ্লাস জল দিচ্ছে খেতে। এমন একটা কুটীরের ছবি দেখতে দেখতে সে খুবই অন্যমনস্ক হয়ে গেল। মানুষের চাই পাতার কুটীর এবং কিছু কাঠ আর একজন নারী।

এইসব দেখতে দেখতে একদিন সে এটা কি দেখে ফেলল। পাহাড়ের মাথায় এক নারী দাঁড়িয়ে আছে। ঢিল ছুঁড়ছে নিচে। ঢিলটা গড়িয়ে পড়ছে, পাথরে ঠোক্কর খেতে খেতে ঢিলটা ঠিক জাহাজের নিচে জলের মধ্যে টুপ করে ডুবে গেল। সে ফের দূরবীন ঘুরিয়ে পাহাড় শীর্ষে চোখ রাখতে গিয়ে দেখল, নারী অন্তর্ধান করেছে। একটি গাছ শুধু দাঁড়িয়ে আছে। গাছের শাখা প্রশাখা বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে। সে সেই নারীর মুখ এবং দূববীনের কাচে তাকে আরও বড় করে ধরার প্রাণপাত করতে গিয়ে বুঝল, না কেউ আর দাঁড়িয়ে নেই। ঝড়ো হাওয়ায় গাছপালা শুধু দুলছে।

পরদিন বেশ বেলা থাকতেই সে বোট-ডেকে গিয়ে বসে পড়ল। কেউ দেখে ফেলুক তাকে সে চায় না। বোটের আড়ালে বসে থাকলে কেউ তাকে দেখতেও পাবে না। সে বার বার সেই গাছের নিচে কিছু খুঁজছে। কেউ নেই। সে হতাশ হয়ে গেল। তার চোখ মুখ কেমন উত্তেজনায় অস্থির। বোধ হয় উঠেই পড়ত—পরে মনে হল, সে আজ একটু বেশি আগেই চলে এসেছে। এতটা অধীর হওয়া ঠিক না। সে নিপুণ ভঙ্গীতে, আর সব দেখে ফের গাছের নিচে দূরবীনের কাচ ধরতেই দেখল, কোনো নারী না একজন নারী এসে দাঁড়িয়েছে পাহাড়ের মাথায়। মুখ স্পষ্ট হয়ে উঠছে না। নারী তার জ্যাকেট খুলে হাওয়ায় উড়িয়ে দিল। লাল জ্যাকেট নিচে গড়িয়ে পড়ল না। গাছের ডালে আটকে থাকল। হাওয়ায় উড়তে থাকল।

গোপাল কেমন ছটফট করছে। সে কাকে যেন খুঁজে পেয়েছে—অথচ স্কার্ট উড়িয়ে সে চলে গেল। সে কে? তার মাথা ঝিম ঝিম করছে। সে প্রায় টলতে টলতে আফটার-পিকে উঠে এসেছে। জাহাজের মাস্তুলে আলো জ্বলে

উঠল। ফোকসালে ফোকসালে আলো। ডেকে আলো। এলিওয়েতে আলো। ক্রোজনেস্টে আলো। সর্বত্র আলো জাহাজে—কিন্তু এক গভীর রহস্যময়তায় সে চোখে মুখে এখন অন্ধকার দেখছে।

গোপাল কখন সকাল হবে সেই আশায় রাতে ঘুমাতে পারল না। দূরবীনে মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে সেই পাহাড় শীর্ষে দাঁড়িয়ে কেউ নানা সংকেত পাঠাচ্ছে। তার মাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো।

গোপাল বোট-ডেকে বসে আছে আবার। ঠিক পাহাড় শীর্ষে গাছটার নিচে তার দূরবীনের চোখ। এখানে এসেই দাঁড়ায় সে। পাহাড়ে সে উঠে আসে কি করে জানে না! সে বা অন্য কেউ—না চোখের ভুল! গোপাল কি পাগল হয়ে যাচ্ছে! আর আজ যা দেখল, নারী তার নীল রঙের স্কার্ট খুলে হাওয়ায় উড়িয়ে দিল। জ্যাকেট খুলে ফেলল। খুলছে আর গাছের গুঁড়িতে ফেলে রাখছে। তারপর অন্তর্বাস খুলে ফেলতেই সে দেখল সত্যি সে নারী। চোখে আঙুল দিয়ে যেন না দেখিয়ে উপায় ছিল না তার। গোপালের গলা শুকিয়ে গেছে। হাত পা কাঁপছে। কোনোরকমে সে উঠে দাঁড়াল। টলছে। টলতে টলতে হেঁটে যাচ্ছে ডেকের উপর দিয়ে। সে কি করবে বুঝতে পারছে না। সে দর দর করে ঘামছে। জাহাজে যা সম্ভব ছিল না, বাবেতি কিনারায় নেমে তা বুঝিয়ে দিল, পুরুষের সেই চকমকির বাক্সটা সত্যি তার কাছে আছে। কারণ বাবেতি না পেরে তার শেষ বস্ত্রখণ্ডটিও ঝোপে জঙ্গলে ছুঁড়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছে। চকমকি বাক্সটার সে সত্যি অধিকারী। না হলে গোপালের মতো একজন বুদ্ধুকে যেন বোঝানো যেত না।

গোপাল মাথা ঘুরে বোধ হয় পড়েই যেত। কোনোরকমে সে ফল্কার কাঠ ধরে বসে পড়ল।

গোপাল সারারাত ঘুমাতে পারল না। বাবেতি তার বাবার সঙ্গে ছুটি কাটাতে শহরে গেছে। শহরের কাছাকাছি জায়গাগুলি ঘুরে দেখবে। বাবেতি কি কোথাও যায় না। তার বাবা বের হয়ে গেলে সে বের হয়ে পড়ে হয়তো। কিছুই সে বুঝতে পারছে না। সে অকারণ বাবেতিকে এড়িয়ে গেছে। জাহাজি-রোগ ভেবে সে তাকে পাত্তা দেয়নি। রুডির গল্প বলল। চকমকি বাকসেরও গল্প করল। সে এখন কেমন নিরুপায় বালকের মতো চকমকি বাক্সটার জন্য ছটফট করছে। তার বাড়িঘরের কথা মনে পড়ছে না। বাবা মা-র কথা ভুলে গেছে। সে তার নদীর নামও ভুলে গেছে। সে বার বার উপরে উঠে যাচ্ছে। নিচে নামছে। কি করবে বুঝতে পারছে না। কিংবা তার

মনে হয় কোনো ভুতুরে দৃশ্য নয় তো। সে বাবেতিকে যে-ভাবে দেখতে চেয়েছিল, দূরবীনের কাচে সে-ভাবে বাবেতি যদি ফুটে ওঠে। নানা সংশয় এবং বিভ্রান্তি। জাহির বলল, কি রে তোর কি হয়েছে। কেবল উপর নিচ করছিস। জল খাচ্ছিস। চোখ জবা ফুলের মতো লাল কেনরে। তোর কি হয়েছে!

সারেঙসাব তার ফোকসালে কাশছিলেন। গোপাল মনে মনে নিজের সংকল্পের কথা ভেবে একবার দেখা করতে গেল! এত রাতে সারেঙসাব তাকে দেখে অবাক। তিনি বেশ কাহিল। কোনোরকমে ওঠে বসলেন। বললেন, 'তুই এত রাতে! কিছু বলবি।'

গোপাল দাঁড়িয়েই আছে। সারেঙসাবকে দেখছে। ফোকসালের আলো অন্ধকারে মানুষটাকে খুবই আজ তার দূরের মনে হচ্ছে। এই জাহাজ এবং সমুদ্র মানুষটিকে যেন ফকির দরবেশ করে দিয়েছে। তার সাদা দাড়ি এবং সাদা পাজামা পাঞ্জাবির মহিমা গোপালকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। সে বলতে পারল না, সারেঙসাব আপনি আর আমার জন্য ডেকে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। জেগে থাকবেন না। শরীর খারাপ করবেন না।

সারেঙসাব বললেন, 'আমি ভাল আছি। তুই ভাবিস না। সেরে যাবে। অসুখ বিসুখ মানুষেরইতো হয়। এত ঘাবড়ে যাচ্ছিস কেন! ওষুধ খাচ্ছি। কার্ডিফে গেলে বড় ডাক্তার দেখাবে কোম্পানি। ভাবিস না। বুড়ো হয়ে গেছি—এখন আর অত্যাচার সহ্য হয় না। তিনি চোখ তুলে দেখলেন, গোপাল কখন তার ঘর থেকে চলে গেছে! তিনি শুয়ে পড়লেন।

সকাল হয়ে গেছে। গোপাল সোজা ডেকে উঠে গেল। নিচে দেখল দু একটা বোট লেগে আছে—কিনার থেকে শাক শবজি মাছ নিয়ে এসেছে বিক্রি করার জন্য। সবাই ল্যাটিন আমেরিকান। নাক থ্যাবড়া, চুল কোঁকড়ানো তামাটে রঙ মানুষগুলির। আর সেই নারী যে পাহাড় শীর্ষে অপেক্ষায় থাকে—যে আশায় আছে রুডি তার ডাকে সাড়া দেবেই—যতই দুর্গম হোক, যতই রুক্ষ উষড় প্রান্তর সামনে দুর্ভেদ্য প্রাচীর সৃষ্টি করুক—সে সাড়া দেবেই। সে অনায়াসে পার হয়ে যাবে—এতদিন বাবেতি যেন তাকে তাই বুঝিয়েছে। বিদেশী তরুণটি ছিল প্রাণশক্তিতে ভরা, চোখ দুটি জ্বল জ্বল করছে, দৃষ্টি ও বাহু স্থির আর সেজন্যই সে অমন ভালোভাবে লক্ষ্যভেদ করেছে। সমৃদ্ধি সাহস দেয়—কিন্তু রুডির যথেষ্ট সাহস ছিল। গোপাল দড়ির সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে নিচে নেমে বোটে লাফিয়ে পড়ার সময় এটা আরও বেশি টের পেল।

বাবেতির কথা মাথায় না থাকলে গোপাল এত সহজে নামতে পারত না। বোট ছেড়ে দিয়েছে। বড় টিন্ডাল চিৎকার করছে, এই তুই কোথায় যাচ্ছিস ! আরে তুই যাবি কোথায় ! ফিরবি কি করে ! একা কোথায় চললি ! খাড়া পাহাড়ে উঠবি কি করে। গড়িয়ে পড়লে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবি ! ও পাহাড়ে যে যায় সে আর ফেরে না। খুবই দুর্গম।

গোপাল কি করে বলবে—তার সেই সমস্ত পথ চলার স্মৃতি। আর বললেই বা তারা বুঝবে কেন—উঁচু পাহাড় চূড়ায় রাতের মতো আস্তানা গাড়া, সন্ধ্যার পরও হাঁটা—গভীর পাষাণ গহ্বর—যেখানে শতাব্দীর পর শতাব্দীর শ্রমে জলধারা কঠিন পাথরকে ভেদ করে গেছে—তার এই সব অভিযানের কথা বড়টিন্ডাল জানবে কি করে। বাবেতিই তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে সব। রুডি যে অনায়াসে পাহাড় চূড়ায় উঠতে পারত বড়টিন্ডালের জানার কথা নয়। তার মতো বড় টিন্ডাল তো কখনও বিস্তীর্ণ তুষার তরঙ্গ বুকে নিয়ে জেগে থাকে নি—যা থেকে বাতাস ঢেউ-এর ফেনা ইচ্ছেমতো উড়িয়ে নিয়ে যায়। আবার সমুদ্রের ঢেউ ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে গেলে বরফ হয়ে যায়—বাতাসকে ফিরে যেতে হয় শূন্য হাতে। ঠিক মতো বলতে গেলে তুষার স্রোতগুলি যে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে, তারা তো জানে না। বাবেতি তাকে বার বার সেই নিষ্ঠুর তুষারকুমারীর গল্প করে উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছে। প্রত্যেকটা তরঙ্গই যেন তুষারকুমারীর কাচের প্রাসাদ—যার একমাত্র কাজ ভালবাসা দেখলেই কবর দেওয়া।

খবর পেয়ে অসুস্থ শরীরে সারেঙসাবও উঠে এসেছেন—গোপাল কি সত্যি উন্মাদ হয়ে গেল ! সে তো লাফিয়ে নৌকাগুলি পার হয়ে যাচ্ছে ! সে যাবে কোথায় ! এত খাড়া পাহাড়ে কেউ উঠতে পারে না। যারা উঠতে গেছে, তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আর তো কোনো রাস্তাও নেই। পাহাড়ের ও-পাশে শহর। সে কি জানে—অনেক দূরে সেতুর নিচে শহরে ঢোকার রাস্তা। কিন্তু এ-কি সে তো ঝোপ জঙ্গলে ঢুকে পাথর বেয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। সারেঙসাব এবং জাহাজের সবাই যে যেখানে ছিল, জড় হয়েছে ডেকে। ডাকছে গোপাল ফিরে আয়। পাহাড়ে প্রতিধ্বনি উঠছে, গোপাল ফিরে আয়। গোপালকে আর দেখা যাচ্ছে না। বনজঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

যারা তাকে খুঁজতে গেল, ফিরে এল নিরাশ হয়ে। বাবেতি আর তার বাবাও ফিরে এল। কোনো খোঁজ খবরই পাওয়া গেল না গোপালের। বাবেতিও কোনো খোঁজ নিল না গোপালের। এমন কি সে তার কুকুরটাকেও ছাড়তে

রাজি হল না। সে আবার ডেকে চুপচাপ বসে থাকে—বই পড়ে। আর পাহাড়ের দিকে তাকাতে গিয়ে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। রুডি তার পাথরের গহ্বরে ঘুমিয়ে আছে। তারচোখ জলে ভেসে যায়। পাহাড়ের অন্ধকারে রুডিকে আবিষ্কার করার মতো কোনো উপায়ই জানা নেই কারো। তুষার প্রাসাদে যেন রুডিকে বন্দী করে তুষারকুমারী চলে যাচ্ছে নিজের দেশে।